সমসাময়িক উন্নয়ন চিন্তা ২

২০১৫-২০১৭ সালে মিডিয়াতে
প্রকাশিত সিপিডি'র নির্বাচিত বক্তব্যসমূহ

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ

সমসাময়িক উন্নয়ন চিন্তা ২

২০১৫-২০১৭ সালে মিডিয়াতে
প্রকাশিত সিপিডি'র নির্বাচিত বক্তব্যসমূহ

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ

প্রকাশক

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ি - ৬/২ (৭ ও ৮ তলা), ব্লক - এফ
কাজী নজরুল ইসলাম রোড, লালমাটিয়া হাউজিং এস্টেট
ঢাকা - ১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৮১৫২৭৭, ৯১৪১৭০৩, ৯১৪১৭৩৪, ৯১৪৩৩২৬, ৯১২৬৪০২
ফ্যাক্স: (+৮৮ ০২) ৪৮১১০৪১৪
ই-মেইল: info@cpd.org.bd

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৮

স্বত্ব
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

এই বইটিতে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ ও সাক্ষাৎকারগুলোতে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবে লেখকদের নিজস্ব। এর সাথে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকতে পারে।

প্রচ্ছদ
অভ্র ভট্টাচার্য

অক্ষর ও পৃষ্ঠা বিন্যাস
মোঃ সাইফুল হাসান

ISBN 978-984-34-3885-0

মূল্য
৩৫০ টাকা

মুদ্রক

লিথোগ্রাফ
৪১/৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

C12018_1SOM_SPE

সিপিডি পরিচিতি

১৯৯৩ সালে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) যাত্রা শুরু করে। নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সহযোগীদের সাথে সংযোগ ও সংলাপ প্রসারের লক্ষ্যে একটি নাগরিক উদ্যোগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় সিপিডি।

দীর্ঘ ২৫ বছরের পথ চলায় সিপিডি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি স্বাধীন থিংক ট্যাঙ্ক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। সিপিডি'র অন্যতম কার্যক্রম হল দেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক ও নীতি-নির্ধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে গবেষণা করা এবং গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত নিয়ে সংলাপের আয়োজন করা।

গবেষণার প্রধান বিষয়গুলো হল সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, দারিদ্র্য ও অসমতা, কৃষি, বাণিজ্য, আঞ্চলিক সহযোগিতা ও বৈশ্বিক সামঞ্জস্য, অবকাঠামো ও ব্যবসায়ী উদ্যোগ, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন, নীতি ও প্রতিষ্ঠান এবং ২০৩০ এজেন্ডা বা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)। বর্তমানে, সিপিডি দু'টি বৈশ্বিক প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে। একটি হল LDC IV Monitor, যা জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশসমূহের চতুর্থ সম্মেলনে গৃহীত কর্মসূচিগুলোর বাস্তবায়ন গতিচিত্র পর্যবেক্ষণে গঠিত একটি স্বাধীন অংশীদারিত্ব; অপরটি হল ৪৯টি থিঙ্ক ট্যাঙ্কের সম্মিলিত একটি নেটওয়ার্ক, Southern Voice on Post-MDG International Development Goals (সাউদার্ন ভয়েস), যা মূলত ২০৩০ এসডিজি বাস্তবায়ন ও প্রয়োগে উন্নয়নশীল দক্ষিণের ভূমিকা নিয়ে কাজ করে।

জাতীয় পর্যায়ে সিপিডি *এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ*-এর সচিবালয় হিসেবে কাজ করছে। দেশে এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা রাখাই এই প্ল্যাটফর্মের উদ্দেশ্য।

গবেষণা সংলাপ ও নীতি পরামর্শে সিপিডি'র বিশেষ অর্জন রয়েছে। নীতি গবেষণা ও সংলাপের ক্ষেত্রে পরিচালিত কার্যক্রম ও সার্বিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ Think Tank Initiative-এর আওতায় বিশ্বব্যাপী এক প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার জন্য সিপিডি পরপর দুইবার নির্বাচিত হয়েছে।

সিপিডি প্রকাশিত বই, মনোগ্রাফ, ওয়ার্কিং পেপার, সংলাপ প্রতিবেদন ও সংক্ষিপ্ত নীতি পরামর্শের সংখ্যা ইতিমধ্যে ৪০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। সিপিডি'র প্রকাশনা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি নিয়মিতভাবে সিপিডি'র ওয়েবসাইটে (www.cpd.org.bd) প্রকাশ করা হয়।

লেখক পরিচিতি

অধ্যাপক রেহমান সোবহান
চেয়ারম্যান

ড. ফাহমিদা খাতুন
নির্বাহী পরিচালক

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
সম্মাননীয় ফেলো

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান
সম্মাননীয় ফেলো

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম
গবেষণা পরিচালক

মুখবন্ধ

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) বাংলাদেশের একটি স্বাধীন থিংক ট্যাঙ্ক হিসেবে কাজ করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য বিষয় যেমন অর্থনীতি, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, সেবা, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য, অসমতা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, সুশাসন ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বৈদেশিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সিপিডি তথ্যভিত্তিক ও বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা করছে। এর পাশাপাশি সিপিডি'র গবেষকরা তাঁদের গবেষণার ফলাফল বৃহত্তর পরিসরে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় ও কলাম লিখেন এবং সাক্ষাৎকার প্রদান করে থাকেন।

২০১৪ সালের নির্বাচিত মতামতগুলো আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ বই আকারে ২০১৫ সালের অমর একুশে গ্রন্থমেলায় প্রকাশ করেছিলাম। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালের অমর একুশে গ্রন্থমেলার জন্য বর্তমান সংকলনটি আমরা প্রকাশ করছি, যেখানে ২০১৫-১৭ সালে দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সিপিডি'র গবেষকদের নির্বাচিত বিশেষ মতামত, কলাম ও সাক্ষাৎকার সংকলন করা হয়েছে। এ লেখাগুলোতে বিনিয়োগের হাল-হকিকত, বাজেট ভাবনা, পোশাক শিল্পের পরিস্থিতি, ব্যাংকিং খাতের বর্তমান অবস্থা, অসম উন্নয়ন, নীতি সংস্কার, বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্ক ও নীতি গঠনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া সিপিডি'র বিশেষজ্ঞরা টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান, করণীয়, সীমাবদ্ধতা ও পরিকল্পনা নিয়ে গঠনমূলক বক্তব্য দিয়েছেন। অর্থনীতিতে নারীর ভূমিকা, ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতাভিত্তিক বাজেট নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

এই সংকলনটিতে আমরা বিষয়বস্তু অনুযায়ী বিন্যাস করে পৃথকভাবে সাতটি অধ্যায়ে সিপিডি'র গবেষকদের মতামতগুলো উপস্থাপন করেছি। 'জাতীয় রাজনীতি' শিরোনামের প্রথম অধ্যায়ে ২০১৫ সালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও তা অর্থনীতিতে কী প্রভাব ফেলছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 'জাতীয় বাজেট ও অর্থনীতি' শিরোনামের দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে বাজেট সংশ্লিষ্ট গঠনমূলক আলোচনা, দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্র ও অবকাঠামোগত বিষয়, ভ্যাট আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ এবং অর্থনীতির সামগ্রিক অবস্থার উপর দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। বাংলাদেশে পোশাক ও ট্যানারি শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও চ্যালেঞ্জসমূহের উপর আলোকপাত করা হয়েছে 'পোশাক ও ট্যানারি' শিরোনামের তৃতীয় অধ্যায়ে।

এ ছাড়া, বৈদেশিক বাণিজ্য, চুক্তি ও সম্পর্ক এবং বাংলাদেশে তার অবস্থান, আন্তর্জাতিক বাজারে টাকার মূল্যায়ন, দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের ট্রানজিট সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে 'আঞ্চলিক সহযোগিতা ও বৈদেশিক সম্পর্ক' শিরোনামের চতুর্থ অধ্যায়ে। পঞ্চম অধ্যায় 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট'-তে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন

লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশকে কী কী ধাপ পার করতে হবে এবং বর্তমানে বাংলাদেশ কী অবস্থানে আছে তা নিয়ে মতামত রয়েছে। 'নারী অধিকার' বিষয়ক আলোচনা রয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে যেখানে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান তরুণদের প্রশংসনীয় উদ্যোগ এবং সিপিডি'র সভাপতি রেহমান সোবহান ও সিপিডি'র সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের জীবন বিষয়ক তিনটি উল্লেখযোগ্য লেখা সংকলিত হয়েছে 'অন্যান্য' শিরোনামের সপ্তম অধ্যায়ে।

আশা করা যায়, সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে সিপিডি'র গবেষকদের বিশ্লেষণ ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ সমাজ ও বৃহত্তর জনমানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই বইটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সিপিডি'র গবেষণাকর্ম বাংলা ভাষায় বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যেসব পত্রিকা সুযোগ করে দিয়েছেন, এ গ্রন্থের সকল লেখকের পক্ষে আমি সেসব পত্রিকার কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যম কর্মীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এখানে উল্লেখ্য যে, পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলোকে গ্রন্থাকারে সন্নিবেশিত করে প্রকাশের উপযোগী করার পর্যায়ে ক্ষেত্র-বিশেষে কিছু পরিমার্জন ও পরিবর্তন করতে হয়েছে।

সিপিডি'র ডায়লগ ও কমিউনিকেশন বিভাগের সহকর্মীরা এ সংকলন প্রকাশের জন্য অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছেন। লেখা ও মন্তব্যসমূহের নির্বাচন ও বাছাই, সেগুলো বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যাস ও পরিমার্জন করে প্রকাশের উপযোগী করে তুলতে তারা প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। এ বিভাগের প্রধান আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফ ও অতিরিক্ত পরিচালক ড. আনিস পারভেজ এক্ষেত্রে সার্বিক নেতৃত্ব দিয়েছেন। উপ-পরিচালক অভ্র ভট্টাচার্য, ডায়লগ সহযোগী (যোগাযোগ) মোঃ সাজ্জাদ মাহমুদ শুভ, প্রকাশনা সহযোগী আসমাউল হুসনা এবং প্রোগ্রাম সহযোগী (ডিটিপি) মোঃ সাইফুল হাসান সংকলনটির প্রকাশে মূল ভূমিকা রেখেছেন। তাদের প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ঢাকা
ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

ফাহমিদা খাতুন
নির্বাহী পরিচালক
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

সূচিপত্র

মুখবন্ধ *সাত*

অধ্যায় ১: জাতীয় রাজনীতি

ফলাফলশূন্য খেলায় নেমেছেন রাজনীতিকরা ৩
রেহমান সোবহান

রাজনীতির কারণে ক্ষতি অর্থনীতির ১৩
খোন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

অর্থনীতির স্বার্থে সহিংসতা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন ১৭
মোস্তাফিজুর রহমান

অধ্যায় ২: জাতীয় বাজেট ও অর্থনীতি

বিনিয়োগ অনিশ্চয়তা এখনও কাটেনি ২১
মোস্তাফিজুর রহমান

বাজেটের আর্থিক কাঠামো কি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে? ২৬
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অর্থনীতি: নাজুক অবস্থান থেকে ভাল ভিতে ৩০
মোস্তাফিজুর রহমান

শিল্প-বাণিজ্যের কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টিতে যা জরুরি ৩৫
খোন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

অর্থনীতিতে স্বস্তির বছর ৪০
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

নিরাপত্তা ঝুঁকি দূর করতেই হবে ৪৩
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

‘দামি টাকা’ এখন নানামুখী চাপে ৪৭
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

এত টাকা রাখি কোথায়? ৫০
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

ভ্যাট আইন চালু হলে আয়কর আদায়ও বাড়ত ৫৪
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

অর্থনীতিতে ক্যান্সার ৫৮
ফাহমিদা খাতুন

দুর্নীতি দূর করাই সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ ৬২
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

ব্যবসায়ীদের মতামত মূল্যায়ন করতে হবে ৬৮
মোস্তাফিজুর রহমান

চীনের প্রকল্প অর্থায়ন: বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতে ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভাবনা ৭৪
মোস্তাফিজুর রহমান

এবারের বাজেট বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টিতে সরকারের জন্য একটি টেস্ট কেস ৭৭
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

সম্পদ সঞ্চালনে দক্ষতা বাড়াতে হবে ৮৩
ফাহমিদা খাতুন

২০১৬: সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিয়েছে মূল্যস্ফীতি ৮৯
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

ভ্যাট আইন পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে আরও প্রস্তুতি দরকার ৯২
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সরকার নীতি-সংস্কার ও উদ্ভাবনী কৌশলে পিছিয়ে ৯৭
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অধ্যায় ৩: পোশাক ও ট্যানারি শিল্প

পোশাক শিল্পের চ্যালেঞ্জ ও বাধ্যবাধকতা ১০৫
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

চামড়া থেকে সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজন নিশ্চিত করা চাই ১০৯
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

বিজিএমইএকে আরও পরিণত হতে হবে ১১৩
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

ট্যানারি পল্লী বাস্তবায়ন কাজ সমন্বিতভাবে হচ্ছে না ১১৬
মোস্তাফিজুর রহমান

অধ্যায় ৪: আঞ্চলিক সহযোগিতা ও বৈদেশিক সম্পর্ক

বিশেষজ্ঞ মন্তব্য ১২১
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বহুমাত্রিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ় হবে ১২৪
মোস্তাফিজুর রহমান

দু'দেশের সম্পর্ক নতুন সোপানে নিয়ে যাবে ১২৯
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বাণিজ্য বৃদ্ধিতে উন্নত দেশগুলো থেকে বেশি প্রতিশ্রুতি নিতে হবে ১৩৪
মোস্তাফিজুর রহমান

সিপিডির আরও কিছু কথা ১৩৭
মোস্তাফিজুর রহমান

বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান দৃঢ় হচ্ছে ১৪১
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

কানেকটিভিটি ও বাংলাদেশের সম্ভাবনা ১৪৪
মোস্তাফিজুর রহমান

ভারত-চীন উভয়ের সঙ্গেই সুসম্পর্ক রাখতে হবে ১৪৯
মোস্তাফিজুর রহমান

শ্রমবাজার ৩% খুললে এলডিসি ১৫ হাজার কোটি ডলারের বাজার পাবে ১৫৩
মোস্তাফিজুর রহমান

জিএসপি ফেরতের প্ল্যাটফর্ম হতে পারে 'টিকফা' ১৫৮
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

বাংলাদেশের লাভের জায়গা চারটি ১৬২
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

টিকফায় বাংলাদেশের ওপর যাতে কিছু চাপিয়ে দিতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে ১৬৬
মোস্তাফিজুর রহমান

বাণিজ্য সম্পর্ক সম্প্রসারণে সুযোগের জানালা সৃষ্টি হয়েছে ১৭১
মোস্তাফিজুর রহমান

অধ্যায় ৫: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ১৭৭
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

এসডিজি বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়গুলোকে আরও সচেতন ও সক্রিয় হতে হবে ১৮১
ফাহমিদা খাতুন

উন্নয়ন চিন্তা করতে হবে এসডিজিকে ঘিরেই ১৮৭
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অধ্যায় ৬: নারী অধিকার

নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ১৯৩
ফাহমিদা খাতুন

কর্মজীবী নারীদের নিজেদের ওপর আস্থা বাড়াতে হবে ১৯৬
ফাহমিদা খাতুন

অন্যান্য

তারুণ্য বদলে দিচ্ছে দেশ ২০১
রেহমান সোবহান

উন্নতি সত্ত্বেও আমাদের সমাজ অসম ২০৫
রেহমান সোবহান

কাজে না লাগলে জ্ঞান কি ভেজে খাব? ২১০
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অধ্যায় ১

জাতীয় রাজনীতি

ফলাফলশূন্য খেলায় নেমেছেন রাজনীতিকরা

রেহমান সোবহান

বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের ডাকা সাম্প্রতিক অবরোধ আর হরতাল চলাকালে অগ্নিসংযোগ, হামলার শিকার ব্যক্তিরা যেভাবে ভয়াবহ জখম হয়েছেন আর মৃত্যুর সংখ্যা যেভাবে বেড়ে চলেছে তা ন্যায়সঙ্গতভাবেই উদ্বেগ ও ক্ষোভের উদ্রেক করেছে। ক্ষোভ আর উদ্বেগ শুধু ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে থেকে নয় বরং তা এসেছে পুরো দেশ থেকে।

হতাহতের শিকার বেশির ভাগই নিরপরাধ সাধারণ মানুষ। বাস্তবতার কারণে তাদের বাধ্য হয়েই পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করতে হয়েছে। বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নারী ও শিশুরা, কেননা জ্বলন্ত গাড়ি থেকে দ্রুত বের হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের পেছনে পড়ার সম্ভাবনাই বেশি। বিরাজমান রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে কোন সম্পৃক্ততা নেই এমন সাধারণ মানুষকে ব্যাপক হারে টার্গেট করার যে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের কৌশল অমানবিক, অনৈতিক, এবং রাজনৈতিকভাবে অফলপ্রসূ।

এসব কৌশল একটি দলের প্রতি জন-অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে, যারা কিনা জনগণের কিছুটা সহানুভূতি পেতে পারত। কেননা এখন পর্যন্ত রাষ্ট্রের কর্তৃত্ববাদী ক্ষমতা প্রয়োগের শিকার হয়েছে তারাই। রাজনৈতিক একটি দল যখন এমন সব কর্মকাণ্ডের ওপর নির্ভরশীল, যা থেকে মূল টার্গেট এজেন্টরা আক্রান্ত হওয়ার বাইরে থেকে যায় আর অসহায় সাধারণ মানুষদের বিভিন্নভাবে ক্ষতির শিকার হতে হয়, তাতে রাজনৈতিক নির্বুদ্ধিতাই প্রকাশ পায়। একইভাবে প্রকাশিত হয় সাংগঠনিক দুর্বলতা।

বিরাজমান সহিংস পরিস্থিতি আর স্থিতিহীনতার মধ্যে দোষারোপ করার খেলার যথার্থতা সামান্যই। আমাদের গভীরভাবে বিভক্ত রাজনৈতিক সমাজে উভয় পক্ষে এমন মানুষের

অভাব নেই, যারা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর কর্মকাণ্ড আর উদ্দেশ্যকে সম্ভাব্য সব থেকে মন্দ রূপ দেয়।

তাদের নানা মন্তব্য আর কর্মকাণ্ডে প্রতীয়মান হয় যে, ক্ষমতাসীন দল বিরোধী দলকে বিরোধী হিসেবে সক্রিয় থাকতে কোন প্রকার রাজনৈতিক সুযোগ দেওয়ার পরিবর্তে তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে এবং এমনকি বল প্রয়োগ করে গুঁড়িয়ে দিতে চায়। একই দৃষ্টিভঙ্গি শুধু তাদের রাজনৈতিক মিত্ররা পোষণ করেন তা নয় বরং তাদের বুদ্ধিজীবী সহযাত্রীরাও অধিকতর বল প্রয়োগের অনড় দাবিতে রাজনীতিবিদদের তুলনায় আগ্রাসী প্রতিভাত হন।

পক্ষান্তরে, প্রতিপক্ষকে উৎখাত করা তো দূরে থাক মোকাবেলা করতে সমর্থ এমনটি সামান্যই প্রদর্শন করতে পেরেছে বিরোধী দল। অসমর্থতার এ গ্লানি বিরোধীদেরকে বিক্ষিপ্ত করেছে এবং বিভিন্ন সহিংস কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করতে প্ররোচিত করেছে; যা সরকারকে ভয়ভীতি দেখিয়ে বাধ্য করা বা বিরোধীদলদের রাজনৈতিক লক্ষ্যের কাছাকাছি আনার বদলে নিরপরাধদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

অগণতান্ত্রিক শক্তির হস্তক্ষেপে বাধ্য হওয়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি ছাড়া এমন চর্চা থেকে বিএনপি কী অর্জনের আশা করছে তা স্পষ্ট নয়। যেমনটি হয়েছিল ১/১১ এ। যেহেতু এমন একটি উদ্যোগ অফলপ্রসূ বলে প্রতীয়মান হয়েছে ২০১৪-এর জানুয়ারি নির্বাচনের সময় পর্যন্ত; এটি পরিষ্কার নয়, কেন আজ এতে অপেক্ষাকৃত ইতিবাচক ফল আসতে পারে। এমন সম্ভাবনাবিহীন পরিবেশের মধ্যে কেউ কি গঠনমূলক সুপারিশের প্রস্তাব করার প্রত্যাশা করতে পারেন, যাতে কোন পক্ষের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেবে? এমন সম্ভাবনা অতীতে একবার এসেছিল ১৯৯৫-৯৬ সালে। সেবার অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ইস্যুতে একই রকম মুখোমুখি অবস্থান জাতীয় উদ্বেগ সৃষ্টি করেছিল। ১৯৯৫ সালে এখন বিস্মৃত ৫ জনের একটি দলের একজন সদস্য হিসেবে দুই নেত্রীর মধ্যে রাজনৈতিক মধ্যস্থতা করার উদ্যোগে অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়েছিল। এফবিসিসিআই ও এমসিসিআইসহ নাগরিক সমাজের বড় একটি জোটের উদ্যোগে ওই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। প্রকৃত জি-৫ এর চার জন – ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমেদ, প্রধান বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেইন, রাষ্ট্রদূত ফখরুদ্দিন আহমেদ ও সিনিয়র সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদ এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন। হতাশার ওই উদ্যোগের একমাত্র জীবিত ব্যক্তি আমি।

জি-৫ এর উদ্যোগে যতটুকু অগ্রগতি হয়েছিল, তার পেছনে যে বিষয়টি কাজ করেছিল তা হল উভয় নেত্রী তখন কোন প্রকার সমঝোতার বিষয়ে বিরূপ ছিলেন না। সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের সম্পূর্ণ বিপরীত, তখন জি-৫কে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা। তারা দু'জনই আমাদেরকে কয়েক দফা ধৈর্য্যের সাথে লম্বা শুনানি দিয়েছিলেন। আমাদের উদ্যোগ সফলতার কাছাকাছি এসেছিল কিন্তু একটি মাত্র ইস্যুতে তা থমকে যায়। বেগম খালেদা জিয়ার জোর দাবি ছিল যে, উভয় দলের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হতে হবে তিনি ব্যতীত বিএনপি'র কোন এমপিকে। সে সময় যেটা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। শেখ হাসিনা তার দাবিতে অনড় ছিলেন যে, সরকারপ্রধানকে হতে হবে নির্দলীয় কোন ব্যক্তি যাকে এ উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে সংসদে নির্বাচিত করা যেতে পারে। খালেদা জিয়ার দাবির ভিত্তি ছিল সংবিধান রক্ষার প্রয়োজনীয়তা। পক্ষান্তরে, শেখ হাসিনা যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দ্বারা নির্বাচন পরিচালিত হওয়ার স্বার্থে সংবিধান সংশোধন করা যেতে পারে এবং করা উচিত। আজ, দুই নেত্রী তাদের আসন এবং যুক্তি উভয়ই অদল-বদল করেছেন। জি-৫ এর মত বা উন্নততর উদ্যোগ গ্রহণে নাগরিক সমাজের প্রচেষ্টাগুলো সাংঘাতিকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

ঘটনার মুখ্য চরিত্রদের মধ্যকার ব্যবধান ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে এ কথা অস্বীকার করা যাবে না। দুই নেত্রীর মধ্যে সংলাপে উৎসাহিত করতে কতিপয় বিশিষ্ট নাগরিকদের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ ক্ষমতাসীন দলের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। বরং, নাগরিকদের উদ্যোগ বিদ্যমান বিষাক্ত পরিবেশের মধ্য থেকে সাহসিকতাপূর্ণ এক প্রশংসনীয় পদক্ষেপের প্রতীক। এটি এখন পর্যন্ত চরম লজ্জাজনক ও অরুচিকর কটুক্তিমূলক মন্তব্য উসকে দিয়েছে। শুধুমাত্র ক্ষমতাসীন জোটের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে সেগুলো এসেছে তা নয়। এমনকি সরকারের কতিপয় অধিকতর পরিপক্ক সদস্যদের কাছ থেকেও এমন মন্তব্য এসেছে, যারা ঘোষণা দিয়েছেন, 'ভাল' আর 'মন্দের' মধ্যে সংলাপের কোন সুযোগ নেই।

সম্ভবত তারা ১৯৭১-এর মার্চে বঙ্গবন্ধু আর ইয়াহিয়ার মধ্যকার সংলাপের কথা ভুলে গিয়েছে। অথবা, ইয়াসির আরাফাত আর ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রীর মধ্যকার সংলাপ বা ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় কিসিঞ্জার এবং লি যাক থো-এর সংলাপ। অথবা, সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত যুক্তরাষ্ট্র ও আফগান তালেবানদের মধ্যকার সংলাপ যা সংযুক্ত আরব আমিরাতে গোপনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

বিএনপি'র সামনে যেসব পথ

সাধারণ মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে চলা আর অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান ক্ষতির আলোকে গভীরতর সঙ্কটের ঘূর্ণাবর্তে নিম্নমুখী অধঃপতন প্রতিহত করতে কী করা যেতে পারে? দুই মুখ্য চরিত্রের কাছে কী পথ খোলা আছে সেগুলো পর্যালোচনা করা যাক।

গত নয় বছর ধরে, সরকারের কর্তৃত্ববাদী ক্ষমতা প্রয়োগের মুখে ছিল বিএনপি। এমন পরিস্থিতিতে বিএনপি'র জন্য রাজনৈতিক সুযোগ এতটাই সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে, যেখানে তারা বাংলাদেশের রাজধানীতে জনসমাবেশও করতে পারছে না। দলটির নেতাদের চলাচলের স্বাধীনতা নিয়মিত বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে। আর তাদের সিনিয়র নেতাদের নিয়মিত কারারুদ্ধ করা হয়েছে।

এমন একটি পরিস্থিতি বিরোধীদলদের রাজনৈতিক সুযোগকে মারাত্মকভাবে সীমাবদ্ধ করে দেয় এবং এটি গণতন্ত্রের সার্বিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর ম্যাজিক্যাল ক্ষমতার আপাত প্রয়োগ তাদেরকে অসুবিধাজনক বিরোধী নেতাদের অদৃশ্য করে ফেলার সুযোগ করে দেয়; জীবন থেকে না হলেও অন্তত জনগণের দৃষ্টি থেকে। আমরা যে আইনের শাসনের মধ্যে বাস করি এটি তার সামান্যই প্রমাণ বহন করে।

এমন বৈরী রাজনৈতিক পরিবেশে বিরোধীদল কোনভাবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। যখন তাদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, তারা দেশের গুরুত্বপূর্ণ পৌরসভাগুলোতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জিততে সক্ষম হয়েছিল।

তাদের রাজনৈতিক সক্ষমতার এই বোধ প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে প্রদর্শিত হয়। এটি অধিকতর মানবকল্যাণ ভিত্তিক রাজনৈতিক কৌশল পরিকল্পনা প্রণয়নে বিএনপিকে উৎসাহিত করা উচিত ছিল। যৌক্তিকভাবে, তাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল ক্ষমতাসীন জোটের সঙ্গে সম্ভাব্য সকল পর্যায়ে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ নেওয়া।

এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেশজুড়ে মানুষের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ তাদেরকে করে দিত। একই সঙ্গে তারা আন্তর্জাতিক গোষ্ঠির মনোযোগও আকর্ষণ করতে পারত। যার দ্বারা নিজেদের রাজনৈতিক সামর্থ্য প্রকাশ পেত।

জানুয়ারি নির্বাচনের আগ দিয়ে বিরোধীদের কাছে প্রস্তাবিত সকল সুযোগ গ্রহণ করা উচিত ছিল। এর মধ্যে ছিল, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে নির্বাচনকালীন সরকারে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় দেওয়ার প্রস্তাব। এমন পরিস্থিতির মধ্যে আয়োজিত জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে বিএনপি'র জয়ী হবার এমন কোন নিশ্চয়তা ছিলনা। তবুও, জানুয়ারি নির্বাচনে বিএনপি'র নিজেদের সাংগঠনিক সীমবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও, এটি নেওয়ার মত একটি ঝুঁকি ছিল।

এমন একটি সুযোগ কাজে লাগানোর ব্যর্থতা থেকে বিএনপি'র রাজনৈতিক ভুল প্রতিফলিত হয়। আর বিশেষ করে, ঢাকা ও লন্ডনে ছড়িয়ে পড়া দলটির দ্বৈত নেতৃত্ব তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে।

বিএনপি'র এ ভুল হিসাব যে বিষয়টির ওপর ভিত্তি করে এসেছে তা হল – তাদের সাংগঠনিক ও রাজপথে লড়াইয়ের ক্ষমতার অতিমূল্যায়ন এবং রাজপথের যে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকারের সদিচ্ছা ও সামর্থ্যকে খাটো করে দেখা।

খালেদা জিয়ার সন্তান আরাফাতের করুণ ও অকাল মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী সমবেদনা জানানোর চেষ্টা করেছিলেন। ওই ঘটনা বিএনপি'র রাজনৈতিক শূন্যতার চরম প্রকাশ হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে বন্ধ দরজার সামনে অপেক্ষমান রাখাটা শুধু সাংস্কৃতিক চৈতন্যহীনতার নয়, একই সঙ্গে দুর্ব্যবহারেরও প্রতিফলন। এ ছাড়া, বিএনপি'র সিনিয়র নেতা, যারা বন্ধ দরজার পেছনে দ্বিধান্বিত ছিলেন। তাদের বিশৃঙ্খলা নেতৃত্বের ফলে, জনগণের উপহাসের শিকার হয়েছে দল।

বর্তমান রাজপথের সহিংসতা ৬ সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চলছে। এতে হতাহতের সংখ্যা বেড়েছে। এ ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড যে আওয়ামী লীগের স্থিতিশীলতা ঝুঁকিতে ফেলবে তেমন কোন ইঙ্গিত নেই বললেই চলে। সহিংসতা ও অগ্নিকাণ্ডের কারণে দেশজুড়ে নিরপরাধ মানুষ হুমকিতে রয়েছেন। এ ক্ষেত্রে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো সহিংসতা ও অগ্নিসংযোগকারীদের পুরোপুরি ছত্রভঙ্গ বা দমন করতে পারছে কি না সে বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য কোন তথ্য-প্রমাণ নেই। এর ফলে, দিনের পর দিন সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আতঙ্কে আছে সাধারণ মানুষ। নিরুপায় হয়ে এসব মানুষ শান্তি প্রত্যাশা করছে। রাজনৈতিক এই চলমান লড়াইকে ব্যবহার করে রাষ্ট্রের জন্য আরও ভয়ানক শত্রুদের উৎসাহিত করতে পারে বিদ্যমান রাজনৈতিক সঙ্কট। এর মাধ্যমে তারা তাদের অশুভ লক্ষ্য অর্জনের দিকে আরও এগিয়ে যাবে। রাজনীতিতে এমন কোন ঘটনা ঘটলে তা শুধু সঙ্কটকে স্থায়ী রূপই দেবে না, একই সঙ্গে তা আরও চরম আকার ধারণ করলে অগণতান্ত্রিক শক্তিগুলো পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়ার চিন্তা করতে পারে।

আমাদের শাসকগোষ্ঠী বা বিরোধী দল — কেউই নিশ্চিত নন যে, এমন হস্তক্ষেপ কোথায় গিয়ে শেষ হবে। রাজপথের সহিংসতা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কমই সফল করছে। এ অবস্থায় বিএনপিকে অস্থায়ী ভিত্তিতে তাদের আন্দোলন স্থগিত রাখার জন্য পরামর্শ দেওয়াই ভাল হবে। যাতে সঙ্কট সমাধানের জন্য একটি সংলাপের পথ তৈরি হয়। তারপরও শাসকরা যদি কোন সাড়া না দেয়, তখন বিএনপি তাদের আন্দোলন আবার শুরু করতে পারে। সে ক্ষেত্রে, তাদের সেই আন্দোলন হওয়া উচিত আরও শান্তিপূর্ণ উপায়ে, যা থেকে তারা জনগণের সমর্থন না পেলেও সহানুভূতি পেতে পারে।

আওয়ামী লীগের সামনে যেসব পথ

বিরোধীদের পক্ষ থেকে শান্তি খোঁজার জন্য যে আহ্বান তাতে সরকার কতটুকু পুনর্জাগরণে সাড়া দেবে অথবা এতে তাদের রাজপথের চ্যালেঞ্জকে ম্লান হয়ে যাওয়া হিসেবে দেখা হবে কি না তা পরিষ্কার নয়। এরই মধ্যে ক্ষমতাসীন জোট তাদের কথা বলে দিয়েছে যে, তারা আইনশৃঙ্খলা সমস্যা চমৎকারভাবে মোকাবেলা করছে, যেখানে সহিংসতা শিগগিরই নিয়ন্ত্রণে আসবে এবং বিরোধীদের নিশ্চল করে দেওয়া যাবে। বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কটের সূচনা ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারিতে। সেই রাজনৈতিক সমস্যার উৎস থেকে শাসকগোষ্ঠী দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছে বলেই মনে হয়। গত এক বছর ধরে, শাসকরা নির্বাচনের আগে ভোটারদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি থেকে নিজেদের দূরত্ব বজায় রেখেছে। ওই নির্বাচনের আগে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, জানুয়ারির ওই নির্বাচন ছিল সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা। সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে উঠার জন্য তারা অধিক অংশগ্রহণমূলক মধ্যবর্তী একটি নির্বাচন দেবে। ১০ম জাতীয় সংসদের ওই নির্বাচন ছিল ত্রুটিপূর্ণ, এ সম্পর্কে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সবাই পূর্ণাঙ্গভাবে ওয়াকিবহাল। এতে ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫৩ আসনের প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। ফলে, বর্তমান ১০ম সংসদের শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি সদস্য ও মন্ত্রীপরিষদের বেশির ভাগের পক্ষে একটি ভোটও পড়েনি। বাস্তবে, যদি আমরা ধরে নিই, নির্বাচন কমিশন বাকি ১৪৭টি আসনে ভোটের যে হিসাব দিয়েছে তাতে বলা হয়েছে ভোট পড়েছে শতকরা ৪০ ভাগ। কার্যত, বর্তমান সংসদ মোট ভোটের শতকরা ১৮ ভাগ ভোটারের সমর্থন আদায় করেছে। কিন্তু, ২০০৮ সালের নবম সংসদ নির্বাচন ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। তাতে ভোট পড়েছিল শতকরা ৮৪ ভাগ। আওয়ামী লীগ ৬৫ বছর বয়সী একটি ঐতিহাসিক দল। প্রথমে পাকিস্তান, পরে ১৯৭১ সাল থেকে বাংলাদেশের সব গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছে। তারাই বিশ্বাসযোগ্য রাজনৈতিক ম্যান্ডেট ছাড়া এক বছরের বেশি রাষ্ট্রীয় সব ক্ষমতা ব্যবহার করছে।

আওয়ামী লীগের জন্য এটি একটি অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উৎসাহমূলক নেতৃত্বের মাধ্যমে গণতন্ত্রের জন্য যে লড়াই চলছিল তা দৃশ্যত দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। তা থেকে রক্তপাতের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে তুঙ্গে তুলে দেয়। এসব আন্দোলনের সময়, বিভিন্ন রকমের কর্মকর্তা – নাশকতাকারী, দুর্বৃত্ত চক্র, সন্ত্রাসী ও বিশ্বাসঘাতকরা বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের নিন্দা জানিয়েছিল। ৬ দফা আন্দোলনকে দমিয়ে রাখতে মুখের ভাষাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের হুমকি দিয়েছিলেন আইয়ুব খান। বাংলাদেশে গণহত্যা চালানোর জন্য অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন ইয়াহিয়া খান। জিয়া ও এরশাদ, এমনকি খালেদা জিয়া যখন ক্ষমতায় ছিলেন তারাও ওই একই রকম আগ্রাসী ভাষা ব্যবহার করেছেন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের আন্দোলনের বিরুদ্ধে এসব ভাষা ও রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল। যে সঙ্কটের মূলে রয়েছে রাজনীতি তা সমাধানের জন্য আওয়ামী লীগ যদি সেই ব্যর্থ অস্ত্র ব্যবহার করে তাহলে তাদের উচিত তাদের নিজস্ব ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়া। ক্ষমতাসীন জোট এখন নির্বাচনে তাদের ম্যান্ডেটের বৈধতার কাছে আশ্রয় নিতে পারে।

২০১৪ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অংশ না নেওয়ায় বিএনপি'র নির্বুদ্ধিতার বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করা যেতে পারে। বিএনপি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা যে ব্যর্থ হয়েছে তা এরই মধ্যে আমরা বুঝতে পেরেছি। পছন্দ-অপছন্দের বাইরে এসে এতে এখনও দেখা যায় কার্যত ২০১৪ সালের নির্বাচনে শতকরা ৮২ ভাগ মানুষ তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রে নেতৃত্ব দানকারী একটি দল। তাদের ঐতিহাসিক রীতির সঙ্গে এ ঘটনা মিলানো যায় না। পরিষ্কার নির্বাচনী ম্যান্ডেট ছাড়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আঁকড়ে ধরার তাদের যে প্রবণতা তা তাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে নেই। এর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য তাদের যে অসংখ্য নেতাকর্মী ও তাদের মহান নেতা জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাদের প্রতি অবমাননা করা হয়। দিন শেষে বলা যায়, সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারের অবাধ ম্যান্ডেট ছাড়া কোন শাসকগোষ্ঠীর সামনে যেসব চ্যালেঞ্জ আসে তা তারা রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যবহার করে, বিভিন্ন সময়ে বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীদের কারারুদ্ধ করে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত দমিয়ে রাখতে পারে না। কোন শাসকগোষ্ঠী তার ক্ষমতার মেয়াদে এমন নিপীড়নমূলক শাসন চালালে তা শুধু ওই শাসকগোষ্ঠীর চরিত্রের পরিবর্তনই করে না, পাশাপাশি তারা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন দেওয়া থেকে নিজেদের বিরত রাখতে বাধ্য হয়।

আওয়ামী লীগ যদি নিজেকে পিছলে পড়ে যেতে পারে এমন একটি পাহাড়ের ঢালে নিয়ে যায়, যা তাদের উত্তরাধিকারের রাজনীতি থেকে দূরে, তখন গণতন্ত্র নিজে বিপন্ন হবে। তাতে শাসকগোষ্ঠীর টিকে থাকা ক্রমবর্ধমান হারে নির্ভর করে আইন প্রয়োগকারী

সংস্থাগুলোর দমনমূলক শক্তির ওপর। এমন নির্ভরতা প্রচলিত ধারায় ওইসব শক্তিকে আরও শক্তিশালী করেছে। যে রাজনৈতিক শক্তিগুলো তাদের ইতিহাসজুড়ে গণতন্ত্রের বাইরে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ববাদী ক্ষমতা প্রয়োগকে চ্যালেঞ্জ করেছে, তারাই ওইসব শক্তির কাছে শেষ পর্যন্ত জিম্মি হয়ে পড়ে। এ প্রক্রিয়ার ফল হিসেবে ফিরতে পারে অগণতান্ত্রিক শাসন। এর ফলে, অগণতান্ত্রিক শাসনে প্রত্যাবর্তন করতে পারে দেশ। এ ধরনের শাসনের মূল চ্যালেঞ্জ হল – অন্য অগণতান্ত্রিক শক্তির রয়েছে সহিংসতা প্রতিরোধ ও ছড়িয়ে দেওয়া, দু'ধরনের ক্ষমতাই।

জাতির জনকের কন্যা, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান শাসকগোষ্ঠীকে শুধু বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই গণতান্ত্রিক ম্যান্ডেট প্রতিষ্ঠা করতে হবে তা-ই নয়, একই সঙ্গে যেখানে তিনি বাংলাদেশকে ভবিষ্যতে দেখতে চান সেখানে নিয়ে যাওয়ার এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। দিনবদল নিয়ে তার যে এজেন্ডা তা বিদ্যমান নিয়ন্ত্রক শর্তগুলোর সাপেক্ষে বাস্তবায়নযোগ্য। এই শর্তগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রতিকূলতা-সহিষ্ণু কৃষক সম্প্রদায়, কর্মঠ শ্রমিক শ্রেণী, গতিশীল উদ্যোক্তা শ্রেণী, দুঃসাহসী অভিবাসীগণ এবং অর্থনীতিতে নারীর ক্রমবর্ধমান ভূমিকা। এর ফলে, দেশে দারিদ্র্য হ্রাস ও মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলোতে উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মানে এরই মধ্যে অগ্রগতি হয়েছে। গত ছয় বছর ধরে, বিশ্ব অর্থনীতি যখন মন্দা মোকাবেলা করছে তখন আমাদের জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার ও বৈদেশিক আয়ের পরিমাণ উৎসাহব্যঞ্জক। প্রধানমন্ত্রী ১৯৭১ সালের গণহত্যায় সহায়তাকারীদের বিচারের মুখোমুখি করার বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ উদ্যোগে তিনি পেয়েছেন জনগণের সমর্থন। এ অবস্থায়, তার পরিবর্তনের এজেন্ডা বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে অর্জিত রাজনৈতিক পুঁজি ব্যবহার ও অধিক ফলপ্রসূ মানসম্মত নেতৃত্ব প্রদর্শন করা উচিত। এর জন্য প্রয়োজন অধিক শান্তিপূর্ণ, স্থিতিশীল ও প্রত্যাশিত রাজনৈতিক পরিবেশ, যা জাতিকে সহিংসতার অন্ধকার সুড়ঙ্গ, যেখানে তারা আটকে পড়েছিল, সেখান থেকে বের করে নিয়ে আসবে এবং একটি উত্তেজনা (টেনশন) ছাড়া ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দেবে। রাজপথের সহিংসতা অথবা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ববাদী ক্ষমতা প্রয়োগের ওপর নির্ভর করার চেয়ে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জনগণের প্রত্যাশিত জীবনমানের ধারা পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এতে শেষ পর্যন্ত যে ফল হবে, তা অবশ্যই হবে একটি রাজনৈতিক সমাধান। এতে অবশ্যই সবার অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। বর্তমান শাসকগোষ্ঠীকে সুষ্ঠুভাবে গণতান্ত্রিক ম্যান্ডেট অর্জনের মাধ্যমে তা করতে হবে।

এমন একটি যথাযথ রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছানোর জন্য সমঝোতামূলক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। কারণ গণতান্ত্রিক রাজনীতি সমঝোতার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, শক্তিমত্তা প্রয়োগ পূর্বক পক্ষ বিশেষের লক্ষ্য পূরণের উপর নয়।

সুশীল সমাজের ভূমিকা?

উপরের আলোচনা এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে করা যে, দুই দলই মনে করবে, জাতীয় স্বার্থের পাশাপাশি তাদের নিজেদের স্বার্থও সংরক্ষিত হতে পারে। দুঃখজনক হল, রাজনীতিকরা যে খেলার ফল শূন্য (জিরো সাম) এমন এক খেলায় মেতেছেন। তারা সমঝোতার মাধ্যমে এই সংঘাতের সমাধান চান বলে মোটেও মনে হচ্ছে না। যেহেতু, রাজপথে চলমান সহিংসতা জনগণের মনে সবচেয়ে বেশি ভীতি সৃষ্টি করেছে তাই বিএনপিকে অস্থিরতা স্থগিত করে ও অগ্নিসংযোগ থেকে বিরত থেকে প্রথম পদক্ষেপ নিয়ে এগোতে হবে। ক্ষমতাসীন জোটের শীর্ষ নেতারা যেহেতু অধিক আগ্রাসী ভঙ্গিতে বিএনপি নেতাদের দিকে বাক্য ছুড়ে মারছেন তাতে বিএনপি নেতারা এই প্রথম পদক্ষেপ নেবে বলে ইঙ্গিত মিলছে না। ক্ষমতাসীনরা বিএনপিকে নকআউট করে দিতে চায় বলেই দৃশ্যত মনে হচ্ছে। চলমান এই রাজনৈতিক সংঘাতের মাঝেও চূড়ান্ত বিজয় সম্ভব বলে যে বিশ্বাস, তার উল্টোটার পক্ষেও যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। শেষ প্রান্তেও আলোর দেখা নেই এমন এক সুড়ঙ্গে আটকা পড়েছে জাতি।

এই যখন অচলাবস্থা তখন সুশীল সমাজের কী কোন ভূমিকা আছে, তারা তো দলীয় পক্ষপাতিত্বে বিভক্ত? যারা তাদেরকে পক্ষপাতহীন বলে বিশ্বাস করেন তারা তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে প্রতারণা করছেন। ৯/১১ এর সময় যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ অভিযোগ করেছিলেন 'যারা আমার সঙ্গে নেই তারা অবশ্যই আমার বিরোধী'। সুশীল সমাজের ওই অংশের বিরুদ্ধে মেরুকরণের এই অভিযোগ করা হয়। ১৯৯৫ সালে জি-৫ বৈঠকে দুই নেতাকে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তার কোন সাড়া পাওয়া যায় নি। তাই সুশীল সমাজ সম্প্রতি যে উদ্যোগ নিয়েছে তার ভবিষ্যৎ নেই বললেই চলে। তাই বলে জনগণ যখন তাদের ক্রমবর্ধমান দুর্ভোগের জন্য একজন অবতার খুঁজবে তখন কিছুই করার থাকবে না – এমনটি ইঙ্গিত দেয় না। ঢাকাভিত্তিক সুশীল সমাজের উদ্যোগ যদি কোন কাজে আসে তাতে দেশের অন্যান্য নাগরিক গ্রুপ, যারা রাজনৈতিক উদ্বেগ ও সমাধানের জন্য প্রকাশ্যে কণ্ঠ সোচ্চার করবেন, তাদের পক্ষ থেকে একই রকম সাড়া পাওয়া প্রয়োজন হবে। যদি এ উদ্যোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে

তাহলে তা রাজনৈতিক জোটগুলোকে অধিক শান্তিপূর্ণ একটি সমঝোতায় আসার জন্য অনুঘটকের কাজ করবে। এই রকম সম্ভাবনা এখনও অনুমানমূলক।

রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অধিক স্থিতিশীলতায় প্রভাব ফেলতে সুশীল সমাজের গ্রুপগুলোর থাকতে হবে সমালোচনা সহ্য করার জন্য মোটা চামড়ার চেয়েও বেশি কিছু। এতে দীর্ঘ সময় ও শক্তি প্রয়োজন হবে। একই সঙ্গে ঝুঁকি মোকাবেলা করতে হবে। আজকের বাংলাদেশের সুশীল সমাজ, যা খণ্ডকালীন এবং অপেক্ষাকৃত কম সক্রিয় কর্মীদের নিয়ে গঠিত, তাদের জন্য এটি অধিকতর চ্যালেঞ্জিং কাজ হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে।

মানবজমিন
২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

রাজনীতির কারণে ক্ষতি অর্থনীতির

খোন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

জানুয়ারি থেকে মার্চ – এ বছরের প্রথম তিনটি মাস বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল চরমে। একটানা অবরোধ কর্মসূচি ছিল এ সময়ে, যা এখনও চলছে। ফেব্রুয়ারি থেকে অবরোধের পাশাপাশি শুক্র ও শনিবার বাদ দিয়ে ডাকা হয়েছে টানা হরতাল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে প্রতিটি কর্মদিবস গিয়েছে 'কর্মনাশা'। রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে এ ধরনের কর্মসূচি আহ্বান করা হলেও অর্থনীতিতে এর পড়েছে বিরূপ প্রভাব। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের বিভিন্ন চেম্বার ও অ্যাসোসিয়েশন হরতাল-অবরোধের কারণে নিজ নিজ খাতের ক্ষতির বিবরণ প্রকাশ করেছে। সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির ক্ষতির চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। কিছু ক্ষতি হয়েছে, যাকে আমরা মৌসুমি বা সাময়িক বলতে পারি। আবার কিছু হয়েছে, যার প্রতিক্রিয়া এখন তেমনভাবে অনুভূত না হলেও দীর্ঘমেয়াদে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে তার বিরূপ প্রভাব পড়বেই। অনেকের শঙ্কা – রাজনৈতিক শক্তিগুলো যদি সমঝোতায় আসতে না পারে, তাহলে এখন যে আপাত শান্ত অবস্থা দেখছি, সেটি বজায় রাখা কঠিন হবে। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এ দুর্ভাবনার বিষয়টি বিবেচনায় রাখছেন নিশ্চয়ই।

এটি জানা কথা যে, বিপর্যয় প্রাকৃতিক কিংবা মানবসৃষ্ট যে কারণেই ঘটুক না কেন রাষ্ট্রীয় খাতের যেমন ক্ষতি হয়, তেমনি ব্যক্তির ক্ষতি হয়। ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা অবশ্যই থাকে। গত তিন মাসে ব্যবসায়ীদের অন্তত ১৬টি সংগঠন ক্ষয়ক্ষতির চিত্র তুলে ধরেছে। কেউ কেউ বলছেন, দিনে ক্ষতির পরিমাণ গড়ে দুই হাজার কোটি টাকার বেশি। একটি সংগঠন হিসাব আরও সুনির্দিষ্ট করেছে – গড়ে দিনে ক্ষতি দুই হাজার ২৭৮ কোটি টাকা। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা ২৫ ফেব্রুয়ারি বলেছেন, হরতাল-অবরোধে ক্ষতির পরিমাণ এক লাখ ২০ হাজার কোটি টাকা। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের ক্ষতি হয়েছে এবং অনেক খাতের ক্ষতি অপরিমেয়। ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য সংশ্লিষ্ট খাতগুলোতে কী ধরনের নীতিগত এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদান প্রয়োজন, সেটি নির্ধারণ করতে হলে এটি জানা অপরিহার্য। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনায় কোন খাতের সুরক্ষায় কতটা অগ্রাধিকার দিতে হবে, সেজন্যও এর প্রয়োজন রয়েছে। নিকট অতীতেও রাজনৈতিক কারণে অর্থনীতির ব্যাপক ক্ষতি ঘটেছে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির সাধারণ নির্বাচনের আগের কয়েকটি মাস রাজনৈতিক অঙ্গন ছিল উত্তপ্ত। তখনও নিয়মিত বিরতিতে হরতাল ডাকা হচ্ছিল এবং তার প্রভাব পড়েছে অর্থনীতিতে। বর্তমানে, হরতাল-অবরোধের কারণে অর্থনীতির ক্ষতির হিসাব চূড়ান্ত করতে ওই সময়ের ক্ষতির পরিমাণ এবং সেটি কাটিয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যেতে পারে।

ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সংগঠন যে হিসাব দিয়েছে, সেটি কি অতিরঞ্জিত, এমন প্রশ্ন কেউ কেউ করছেন। বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, চলতি অর্থবছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ঘটবে সাড়ে ছয় শতাংশ হারে। এটি মেনে নিলে এ বছর জিডিপিতে বাড়তি যুক্ত হবে ৫০ হাজার ৩৪৫ কোটি টাকা। ব্যবসায়ীরা ক্ষয়ক্ষতির যে হিসাব দেখিয়েছেন সেটি সঠিক হলে চলতি বছর প্রবৃদ্ধির হার হবে নেতিবাচক। কিন্তু, এমন মন্দ অবস্থায় দেশ পড়ে যাবে, সেটি কেউ বলছেন না। বরং একটি বিষয় সন্তোষের সঙ্গেই উল্লেখ করতে হয় যে, রাজনৈতিক অঙ্গনে চরম অস্থিরতা বিরাজ করলেও সামষ্টিক অর্থনীতির অনেক সূচক যথেষ্ট স্থিতিশীল ছিল বা রয়েছে। যেমন, বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে বলা হয়েছে, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি উভয় মাসেই মূল্যস্ফীতি ছিল ৭ শতাংশের নিচে। মার্চে এর হার আরও কম। সরকারের রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম হয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি হতাশাব্যঞ্জক, সেটি কেউ বলছেন না। বরং অর্থমন্ত্রী অতিসম্প্রতি বলেছেন, আগামী অর্থবছরের বাজেটের আকার প্রায় তিন লাখ কোটি টাকা দাঁড়াবে। দেশের বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর কাজও থেমে নেই। বলা যায়, আমরা মানিয়ে চলতে শিখছি। এ থেকে ভবিষ্যতের জন্যও শিক্ষা নিতে হবে।

হরতাল-অবরোধে কৃষি খাতের ক্ষতি হয়েছে। কৃষকের ক্ষতি হয়েছে আরও বেশি। যেসব কৃষক শীতকালের সবজি সময়মত বাজারে পাঠাতে পারেননি, তাদের ক্ষতির মাত্রা বেশি। যিনি ধান বিক্রি করতে চেয়েছেন, কিন্তু হরতালের কারণে হাট-বাজারে সেটি নিয়ে যেতে পারেননি, তার সামনে বিকল্প ছিল। যেমন, কিছুদিন অপেক্ষা করা। এতে ধান মজুদে ধান নষ্ট হবে না। কিন্তু, সবজি ঘরে মজুদ করে রাখা যায় না।

এ ক্ষেত্রে করণীয় হচ্ছে দু'টি – এক. মজুদ ক্ষমতা সৃষ্টির জন্য পর্যাপ্ত হিমাগার বা এ ধরনের সুবিধা সৃষ্টি। দুই. সাপ্লাই চেইন ঠিক রাখায় সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ। এ চেইন কেবল কৃষিপণ্যের জন্য নয়, অর্থনীতির অন্যান্য শাখার জন্যও প্রযোজ্য। গ্রাম থেকে শহর এবং শহর থেকে গ্রাম – দুইভাবেই এটি সচল রাখা চাই। কৃষকের পণ্য যেমন শহরে পৌঁছাতে হয়, তেমনি শিল্প এলাকায় উৎপাদিত পণ্যও পাঠাতে হয় গ্রামে। আমদানি ও রফতানি বাণিজ্যের জন্যও এ চেইন গুরুত্বপূর্ণ। এবারের আন্দোলনে ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রামের সড়কপথ মোটামুটি সচল রাখা সম্ভব হয়েছে। সম্ভবত, ২০১৩ সালের বিভিন্ন সময়ে এ পথে যেসব বিঘ্ন ঘটেছে তার শিক্ষা এবার কাজে লেগেছে।

এবারের আন্দোলনের সময়টি ছিল শীতকাল এবং এ কারণে পর্যটন খাতের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এ খাতের জন্য সড়ক, রেল ও নৌপথ নির্বিঘ্ন রাখার পাশাপাশি সার্বিক পরিবেশ নিরাপদ রাখা গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রেও সম্ভবত ২০১৩ সালের অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছে। সে সময়ে কক্সবাজার ও রাঙামাটিতে দিনের পর দিন শত শত পর্যটক আটকা পড়েছিল। এবারে তেমনটি শোনা যায়নি। পরিবহন খাতেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাস ও ট্রাক পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কিংবা ভাংচুর হয়েছে। মালিকদের ক্ষতি হয়েছে দুই ধরনের – স্বল্প ও দূরপাল্লার যাত্রী ও পণ্য ভাড়ার আয় থেকে অনেকে বঞ্চিত হয়েছেন। অনেক যানবাহনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সরকার থেকে যানবাহন মালিকদের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, এটি ভাল দিক। এ সময় ট্রেন ও লঞ্চ চলাচল মোটামুটি স্বাভাবিক ছিল। বলা যায়, অর্থনীতির চাকা সচল রাখায় নৌ ও রেলপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ভবিষ্যতে যে কোন বিপর্যয়ে এ অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে। আন্দোলনের প্রথম দিকে রেলগাড়ির সময়সূচি রক্ষা দুরূহ হয়ে পড়ে। কিন্তু, ক্রমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে। ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের যোগাযোগ রক্ষায় পানগাঁওয়ের টার্মিনাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু গত তিন মাসে সেটি তেমনভাবে দেখা যায়নি। ব্যবসায়ীরা বলছেন, ওই টার্মিনালে ঢাকা শহর এবং শিল্প-বাণিজ্যের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকা থেকে যাতায়াতের পথ মোটেও সহজ নয়। এ পথ প্রশস্ত করার পাশাপাশি যানজট নিরসনে অনেক কিছু করার রয়েছে।

সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা দিতে চেয়েছে এবং ইতিমধ্যেই কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য প্রথমেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে পরিমাণ নির্ধারণ। প্রাথমিক হিসাবে দেখা যায়, কৃষি, পোলট্রি, চিংড়ি ও হিমায়িত খাদ্য, তৈরি পোশাকশিল্প, প্লাস্টিক, পরিবহন, পর্যটন, ব্যাংক ও বীমা, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা, রিয়েল এস্টেট, শ্রম, প্রভৃতি খাতের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে এ সময়। এসব খাত থেকেই জিডিপির প্রায় ৬০ শতাংশ আসে। এ পর্যন্ত যে হিসাব পাওয়া যায় তা থেকে বলতে পারি যে, জানুয়ারি থেকে পরবর্তী

আড়াই মাসে (মার্চের মাঝামাঝি পর্যন্ত) রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এসব খাতে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় চার হাজার ৯০০ কোটি টাকা, যা জিডিপির ০.৫৫ শতাংশ। আমরা বলতে পারি যে, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে কৃষি, তৈরি পোশাক, ব্যাংক ও বীমা প্রভৃতি খাতে ক্ষতির মাত্রা ছিল মধ্যম মাত্রার বা মডারেট। কিন্তু পোলট্রি, চিংড়ি, পরিবহন, পর্যটন, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা প্রভৃতি খাতে ক্ষতির মাত্রা উল্লেখযোগ্য। রিয়েল এস্টেট খাতে ক্ষতি তুলনামূলক কম। তবে এ ব্যবসায় সাম্প্রতিক সময়ে মন্দা চলছে। ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে গিয়ে বাস্তবতা বিবেচনায় রাখা হবে, সেটিই প্রত্যাশিত। আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত বিভিন্ন খাতের সবার কথা সঠিকভাবে তুলে ধরার মত উপযুক্ত কাঠামো বর্তমানে অনুপস্থিত। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের রয়েছে বিভিন্ন চেম্বার। কোন কোন খাতের কণ্ঠস্বর আমরা সংবাদপত্র ও টেলিভিশনের সূত্রে নিয়মিত জানতে পারি। আবার কৃষকের কথা বলার মত সংগঠন তেমন নেই। এবারে কৃষি খাতের ক্ষতি তুলনামূলক কম। কিন্তু অনেক কৃষক বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। তারা উৎপাদিত ফসল আদৌ বিক্রি করতে পারেননি কিংবা আংশিক বিক্রি করেছেন এবং ন্যায্য মূল্য পাননি। এ কারণে অনেক কৃষক তাদের ব্যাংক ঋণের কিস্তি সময়মত পরিশোধ করতে পারেননি। বাংলাদেশ ব্যাংক এ সমস্যা বিশেষভাবে বিবেচনা করতে পারে। পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্তরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পেরও ক্ষতি হয়েছে। নতুন বছরের বাজেটে তাদের জন্য নীতিগত ও আর্থিক প্রণোদনা রাখা উচিত।

রাজনীতির কারণে অর্থনীতির প্রভূত ক্ষতি হয়েছে, এতে সন্দেহ নেই। এখন পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করায় সরকার প্রশাসনিক ও আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত পদক্ষেপ নিয়েছে। এজন্য কেউ কেউ কৃতিত্বও দাবি করতে পারেন। কিন্তু এটিও মনে রাখা চাই যে, অর্থনীতিতে স্বাভাবিক গতি ফিরিয়ে আনার জন্য রাজনৈতিক পদক্ষেপেরও প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের অর্থনীতিতে বেসরকারি খাত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে এবং উদ্যোক্তারা এমন রাজনৈতিক পরিবেশ প্রত্যাশা করে, যেখানে সবার অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। এর সঙ্গে বিদেশি বিনিয়োগও সরাসরি সম্পর্কিত।

সমকাল
৯ এপ্রিল ২০১৫

অর্থনীতির স্বার্থে সহিংসতা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন

মোস্তাফিজুর রহমান

চলমান রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে দেশের অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাতে, যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহন, শিল্প ও কৃষিসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে, যা দেশের জন্য স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে অত্যন্ত নেতিবাচক অভিঘাত রাখবে। এ সহিংসতা দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করতে পারে এবং দেশকে বড় ধরণের সংকটে ফেলতে পারে। মূলত দেশের সাধারণ জনগণকেই এই ভোগান্তি সহ্য করতে হচ্ছে এবং আগামীতেও তাদেরকেই এর ভার বহন করতে হবে। এ সংঘাতময় পরিস্থিতি সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিচ্ছে, এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও সমস্যার সৃষ্টি করছে।

গতকাল বাংলাদেশ প্রতিদিনের সঙ্গে আলাপকালে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান এ কথা বলেন। তিনি বলেন, দেশের অর্থনীতির স্বার্থে হলেও রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। আর সহিংসতা বন্ধের জন্য সংলাপের কোন বিকল্প নেই। তবে আপাত দৃষ্টিতে সংলাপের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এটি খুবই হতাশা ও নৈরাশ্যজনক। এ অবস্থা চলতে থাকলে দেশে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি সংকট সৃষ্টি হতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

এই সহিংসতা ও অচলাবস্থার সমাধান কী হতে পারে জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, সংলাপের কোন বিকল্প নেই; দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনায় নিয়ে আলোচনার টেবিলে আসতে হবে। উভয় প্রধান রাজনৈতিক দলকেই সে উদ্যোগ নিতে হবে । সহিংসতার কারণে

অর্থনৈতিক ক্ষতি নিরন্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে, প্রাণহানি ঘটছে। এটি মানবাধিকারের দিক থেকেও অগ্রহণযোগ্য। জ্বালাও-পোড়াও সহিংসতা এগুলো কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছে কৃষক ও ক্ষুদ্র উৎপাদকরা। কর্মজীবী মানুষেরও ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। কাজ না করতে পারলে যাদের খাবার জোটে না তারা কর্মহীন জীবন কীভাবে চালাচ্ছেন তা জানা উচিত। সহিংস রাজনীতির কারণে মূল্যবান সম্পদ নষ্ট হচ্ছে। আর্থিক খাত ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, কৃষি, পরিবহন ও অন্যান্য খাতে স্বল্প মেয়াদে প্রভাব পড়ছে। কিন্তু ছোট ছোট ছেলেমেয়ে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা কর্মসূচির ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। যার নেতিবাচক ফলাফল এক ধরনের মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি সংকট সৃষ্টি করবে। এ অবস্থা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। আওয়ামী লীগ-বিএনপি'র মধ্যে কোন সংলাপ হতে পারে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আপাতত আমি হতাশ ও নিরাশ। কেননা কোন দলের মধ্যেই নমনীয়তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। ফলে শীঘ্রই সংলাপ হতে পারে এমন কোন আশাও করা যায় না।

সমালোচনা করার অধিকার সবার আছে, কিন্তু যারা সহিংসতার পথ বেছে নিয়েছেন তারা ও তাদের পদ্ধতি দেশকে ভয়ংকর পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিতে পারে। এটি কারোরই কাম্য নয়। দেশের অর্থনীতির স্বার্থে এখনই সংলাপ ও আলাপ-আলোচনা শুরু করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে দু'দলকেই দেশের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে আলোচনায় উদ্যোগী হতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, কৃষি ও শিল্প উৎপাদন সব কিছুতেই রাজনৈতিক অচলাবস্থার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এতে সামগ্রিকভাবে দেশের ক্ষতি হচ্ছে। তাই অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে ধরে রাখতে হলে সংলাপের মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু সমাধানে আসার বিকল্প নেই বলে মনে করেন তিনি।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
৩১ জানুয়ারি ২০১৫

অধ্যায় ২

জাতীয় বাজেট ও অর্থনীতি

বিনিয়োগ অনিশ্চয়তা এখনও কাটেনি

মোস্তাফিজুর রহমান

বিনিয়োগ পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করছে প্রবৃদ্ধির হারকে আরও বেগবান করা সম্ভব হবে কি না। এখানে পরিমাণগত ও গুণগত দু'টি দিকই গুরুত্বপূর্ণ। বিগত কয়েক বছরের দেশে বিনিয়োগ পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জিডিপি-বিনিয়োগ হারের যে উন্নতি হয়েছে তা মূলত ছিল সরকারি বিনিয়োগ নির্ভর। ব্যাংকে অলস টাকার পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। বাৎসরিক জিডিপির চলমান প্রবৃদ্ধির হার ৬ থেকে ৮ শতাংশ এবং ৮ থেকে ১০ শতাংশে উন্নীত করতে হলে সবার আগে নজর দেওয়া দরকার বিনিয়োগের হারে ত্বরণ সৃষ্টির দিকে, যে বিনিয়োগ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং নতুন বিনিয়োগ আকৃষ্ট করবে ।

দেখা গিয়েছে, গত কয়েক বছরে জিডিপির অংশ হিসাবে সরকারি বিনিয়োগ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে; কিন্তু ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ বৃদ্ধি এখনো সম্ভাবনার সীমারেখার বেশ নীচে রয়ে যাচ্ছে। কিছু কিছু খাতে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে; কিন্তু বড় ধরনের বিনিয়োগ প্রস্তাব নিয়ে বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারা উৎসাহ দেখাচ্ছেন না।

২০১৩ সালের মাঝামাঝি থেকে শেষ সময় পর্যন্ত দেশ রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। প্রত্যাশা ছিল, হয়ত ২০১৪ সালে এসে সে অনিশ্চয়তা কেটে যাবে এবং উদ্যোক্তারাও নতুন বিনিয়োগ প্রস্তাবে উৎসাহ দেখাবেন। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। কারণ অনিশ্চয়তা কাটেনি। যেসব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তাতে দেখা যায়, দেশ থেকে অনেক অর্থ দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। আন্ডার ইনভয়েসিং এবং ওভার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমেই এর বড় অংশ চলে যাচ্ছে বলে বিভিন্ন বৈশ্বিক প্রতিবেদন থেকে অনুমিত হয়। অলস তারল্য ক্রমেই বাড়ছে। জুলাই-ডিসেম্বরের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক খাত

প্রতিবেদনে ঋণের ১৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির হারের যে টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছিল সেটি অর্জন করা সম্ভব হয়নি। এ হার সাড়ে ১১ শতাংশের কাছাকাছি আন্তর্জাতিক অর্থবাজার থেকে ঋণ গ্রহণ করে দেশে বিনিয়োগের একটি সুযোগ সৃষ্টি করেছে, যার ফলশ্রুতিতে দেশীয় সূত্র থেকে ঋণ গ্রহণের চাপ হয়ত কিছুটা কমেছে। তবে এসব ঋণ যাতে পুরনো ঋণ পরিশোধে ব্যবহৃত না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

ইতিবাচক দিক হল মূল্যস্ফীতি কিছুটা হ্রাসের দিকে আছে; কিন্তু তা ঋণের সুদের ওপর এখনও ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে শুরু করেনি। ব্যাংকিং খাতকে কু-ঋণের বোঝা এখন টানতে হচ্ছে। অনিয়মের প্রশ্রয় না দেওয়া, এবং ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দূর্বলতা কাটিয়ে উঠতে না পারলে এ সংকট আরও গুরুতর হতে পারে। অনেক ঋণ রি-শিডিউলিং করা হয়েছে এবং ব্যাংকের অনেক টাকা আটকে পড়ে আছে বিভিন্ন ধরনের আইন ও মামলা-মোকদ্দমার কারণে। দ্রুত আইনী নিস্পত্তি, এডিআর এর আরও ব্যাপক ব্যবহারসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ব্যাংকিং খাতে বড় ধরনের সংস্কারের প্রয়োজন। সিপিডির পক্ষ থেকে ব্যাংকিং রিফর্মস কমিশন গঠন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, সে ধরনের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, বিশেষ করে সম্প্রতি প্রকাশিত গ্লোবাল ইন্টেগ্রিটি রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, আন্ডার ইনভয়েসিং ও ওভার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে বড় অঙ্কের অর্থ বিদেশে পাচার হয়ে গিয়েছে। এর পেছনে একাধিক কারণ আছে। যারা টাকা পাচার করছেন তারা হয়ত দেশে বিনিয়োগ করতে চাইছেন না। এ ছাড়া, এর মধ্যে অনেক অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থও রয়েছে। যারা দুর্নীতি করে তারা অবৈধ পথে টাকা পাচার করছে। বিদ্যমান আইন এবং তার প্রয়োগ এই দুই ক্ষেত্রের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই তারা এ দুর্নীতি করছে। মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত আইন আছে; কিন্তু তার প্রয়োগকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

দেশের বিনিয়োগ পরিস্থিতির উন্নতি করতে পারলে সম্ভাব্য পাচারকে নিরুৎসাহিত করা সম্ভব হবে। কারণ, বাইরে টাকা পাঠানোতেও ঝুঁকি আছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সে অর্থ থেকে তেমন কোন আয়ও হয় না, তা অনেকটাই অলস সম্পদ। দেশে বিনিয়োগ করলে আয় করা যায়। সুতরাং, টাকা পাচার রোধে একদিকে যেমন আইনের যথাযথ প্রয়োগের দরকার, অন্যদিকে বিনিয়োগ পরিস্থিতি আরও কীভাবে উন্নতি করা যায় সেদিকে নজর দিতে হবে। বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার মত কার্যক্রম নিতে হবে। সরবরাহ সক্ষমতা, প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ও লিড-টাইম হ্রাস – এগুলোতে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিশেষ করে অবকাঠামোর উন্নয়ন, বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নতি, যোগাযোগের

উন্নয়ন, বাণিজ্য সুবিধা বাড়ানো – এসব ক্ষেত্রে আরও বিনিয়োগ করা প্রয়োজন এবং সাশ্রয়ী বিনিয়োগ প্রয়োজন।

বিনিয়োগ অনিশ্চয়তা পছন্দ করে না। ২০১৫ সালে আবার রাজনৈতিক অস্থিরতার শঙ্কা দেখা দিয়েছে। অনিশ্চয়তা আরও বাড়তে পারে। বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর অনেকটাই নির্ভর করে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি যাতে বিনিয়োগ বান্ধব হয় তার দায়িত্ব রাজনৈতিক দলগুলোর ওপরই শেষ বিচারে বর্তাবে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে সুশাসন নিশ্চিত করা এবং সেগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ করা। এডিপি বাস্তবায়নের হার বৃদ্ধি করতে হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে, নজরদারির দায়িত্বপালন করছেন এমন প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। সরকার নিজে বিভিন্ন সময়ে যেসব ক্ষেত্রে সংস্কারের কথা বলেছেন তার বাস্তবায়নে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

যদিও আগের বছরের তুলনায় ২০১৪ সালে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল ছিল না, তা সত্ত্বেও বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরে আসেনি। অনেক সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছেন, তাদের অনিশ্চয়তা কাটেনি। উদ্যোক্তারা মধ্যমেয়াদি-দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয়ে থাকেন। তাঁরা বিনিয়োগ নীতিমালা ও বিনিয়োগ পরিবেশের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা চান। দক্ষিণ কোরিয়ার স্যামসাংসহ বিদেশি বেশকিছু বড় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে বিশাল বিনিয়োগ প্রস্তাব নিয়ে এলেও নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে বিনিয়োগ না করে ফিরে গিয়েছে। বড় বাজার রয়েছে বলে দেশের ভিতর এবং বাজার প্রবেশ সুবিধার কারণে বিদেশে বাংলাদেশের প্রচুর সম্ভাবনা আছে। বাংলাদেশে বিনিয়োগ করলে স্বল্পোন্নত দেশ হওয়ার সুবাদে বিশ্ববাজারে শূন্য শুল্কে পণ্য রফতানি করা যায়। এসব কারণেই বিদেশি বিনিয়োগকারীদের এদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটি আগ্রহ আছে। কিন্তু বড় বড় বিনিয়োগকারীরা নিশ্চিত হতে চান, বিনিয়োগ করতে গিয়ে নিষ্কণ্টক জমি পাওয়া যাবে কি না, নীতিমালার ধারাবাহিকতা আছে কি না, কোন সমস্যা হলে দ্রুত আইনী সহায়তা পাওয়া যাবে কি না, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা আছে কি না, যেসব প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা প্রয়োজন সেসব প্রতিষ্ঠান স্বল্প সময়ে তাদের সমস্যা দূর করতে পারবে কি না; কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এসব ক্ষেত্রে আমাদের অনেক দুর্বলতা রয়ে গিয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য স্পেশাল ইকোনমিক জোন যদি করা যায় এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে যদি শক্তিশালী করা যায়, তাহলে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের যে আগ্রহ আমরা দেখি তা বিনিয়োগে রূপান্তরিত করা সম্ভব হবে।

গত কয়েক বছর ধরে, জিডিপির প্রবৃদ্ধি ছয় শতাংশের কাছাকাছি রয়েছে। অর্থমন্ত্রী নিজেও বলেছেন, আমরা ছয় শতাংশের ট্র্যাপের মধ্যে রয়েছি। অবকাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, সুশাসন – এ তিনটি খুবই জরুরি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য। এগুলো যদি করা যায়, তাহলে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক অগ্রগতির যে পরবর্তী উদীয়মান ১১ দেশ হিসেবে দেখা হচ্ছে, সে সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ নেবে। আমরা মধ্য আয়ের দেশ হওয়ার যে আশা রাখি তাও দ্রুত বাস্তবায়িত হবে। যে ধরনের উদ্যম, উদ্যোগ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, সুশাসন, পাবলিক পার্টনারশিপকে কাজে লাগিয়ে বড় অবকাঠামোগুলোর নির্মাণ, ব্যবসা করার ব্যয় (কস্ট অব ডুয়িং বিজনেস) হ্রাস, প্রয়োজনীয় সংস্কার – এসব করা গেলেই যে সম্ভাবনার জানালা বাংলাদেশের সামনে আছে সে জানালা আমরা কাজে লাগাতে পারব। মনে রাখতে হবে, এ ধরনের সুযোগ সবসময় আসে না, থাকে না। আমরা দেখি, বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনাম এ সুযোগের জানালাকে কীভাবে কাজে লাগাচ্ছে, প্রয়োজনীয় হোম-ওয়ার্ক করছে, দরকারি বিনিয়োগগুলোতে হাত লাগাচ্ছে। আমরা যদি আমাদের হোম-ওয়ার্ক করতে পারি, তাহলে বিনিয়োগকারীরাও যেমন বিনিয়োগে আগ্রহী হবেন, দেশ থেকে টাকা পাচারও কমবে, বাইরের যেসব বিনিয়োগকারী বাংলাদেশের ব্যাপারে আগ্রহী তারাও আকৃষ্ট হবে।

সরকার যে বড় বড় প্রকল্প হাতে নেয় সেগুলো অর্থনীতির জন্য প্রয়োজন, কিন্তু বাস্তবায়নের গতি শ্লথ। দীর্ঘসূত্রিতার কারণে ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হলে প্রকল্প পরিচালকের দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং দক্ষতা দু'টিই প্রয়োজন। এ ছাড়া নানা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করতে হবে। জমি অধিগ্রহণ থেকে শুরু করে টেন্ডার কার্যক্রম পরিচালনা করা সব জায়গাতেই দুর্বলতা রয়ে গিয়েছে, যার কারণে প্রকল্প দীর্ঘায়িত হয়। এগুলোর সমাধানে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ প্রয়োজন।

সম্প্রতি, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। ফলে সরকারের ভর্তুকি বাবদ ব্যয় সাশ্রয় হবে। জ্বালানির মূল্য পর্যালোচনা প্রয়োজন তবে এ ক্ষেত্রে গ্যাস, বিদ্যুৎ, জ্বালানি সব মিলেই সমন্বিত সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। মূল্য হ্রাসের সুবিধা এ তিনটির মধ্যে একটি সমন্বিত কৌশলের মাধ্যমে বিতরণ করা উচিত। ভর্তুকির যে টাকা সাশ্রয় হচ্ছে তা অবকাঠামো নির্মাণ, বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন স্থাপন ইত্যাদি কাজে লাগাতে হবে। এ লক্ষ্যে একটি ডেডিকেটেড ফান্ড গঠন করার কথা ভাবতে হবে।

সম্প্রতি, সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন বাড়ানো হয়েছে। সরকারি কাজে প্রণোদনা সৃষ্টি এবং মেধাবীদের সরকারি চাকরিতে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে এই বেতন বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল। বেতন বৃদ্ধির ফলে ১৮-২০ হাজার কোটি টাকা বাড়তি যোগান দিতে হবে। তবে এটি বড় কোন সমস্যা হবে না। যদি সরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, সেবার মান বাড়ে, দক্ষতার উপর তার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। লাগামহীন বাড়িভাড়া বৃদ্ধির মত কার্যকলাপের কারণে ক্রয়ক্ষমতার ওপর থেকে বেতন বৃদ্ধির সুফল যাতে হারিয়ে না যায় তা নিশ্চিত করতে হবে, এসব ক্ষেত্রে যেসব আইন রয়েছে সেগুলো যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে।

এ ছাড়া, সরকারকে অবশ্যই রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি করতে হবে। বেতন বৃদ্ধির ফলে ব্যয় বৃদ্ধির যে চ্যালেঞ্জ দেখা দিতে পারে তা ভালভাবে মোকাবেলা করতে হবে। রাজস্ব বাড়ানোর লক্ষ্যে নতুন নতুন খাতকে যুক্ত করা, কর ফাঁকি হ্রাস, প্রত্যক্ষ কর বৃদ্ধি ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে।

২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের পর এক বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে আগামী ৫ জানুয়ারি। এই এক বছরে আগের বছরের তুলনায় সামষ্টিক অর্থনীতিতে কিছুটা স্থিতিশীলতা এসেছে। মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমের দিকে আছে। আমদানি কিছুটা বেড়েছে; কিন্তু বিনিয়োগ পরিস্থিতিকে চাঙ্গা করে প্রবৃদ্ধির ত্বরণ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে অনেক দুর্বলতা রয়ে গিয়েছে। সুতরাং, এখন কীভাবে আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি আরও বাড়িয়ে আরও বেশি কর্মসংস্থান করা যায় সেদিকে নজর দেওয়া দরকার। প্রতিবছর ২০ লাখ শিক্ষিত বেকার আসছে শ্রমবাজারে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, রাজনৈতিক অস্থিরতা আবার ফিরে আসছে। এটি অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। আবার যদি সাংঘর্ষিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাহলে তা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, বিনিয়োগ, বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকর্ষণ করার সক্ষমতা, যেসব মেগা প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে সেগুলো বাস্তবায়ন – সবকিছুকেই দূরহ করে তুলবে, এসব আরও দীর্ঘসূত্রতার মধ্যে পড়বে। সুতরাং, রাজনৈতিক দলগুলোকে অবশ্যই সমঝোতার রাজনীতি, অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতিতে যেতে হবে। তা না হলে অনিশ্চয়তা বাড়বে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যে সম্ভাবনা বাংলাদেশের সামনে রয়েছে সেগুলো কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে বড় বাধার সৃষ্টি হবে। ভুক্তভোগী হবে দেশ ও জনগণ, আর আমাদের হবে স্বপ্নভঙ্গ।

সকালের খবর
১ জানুয়ারি ২০১৫

বাজেটের আর্থিক কাঠামো কি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বাংলাদেশে নতুন বাজেট নিয়ে যত আলোচনা হয়, বিদায়ী বাজেটের প্রাক্কলনগুলো কতখানি বাস্তবায়ন হল, তা খুব সামান্যই পর্যালোচনা করা হয়। এমনকি যাঁরা 'বাজেট বাস্তবায়নযোগ্য নয়' বলে প্রায়ই মন্তব্য করে থাকেন, তাঁরা তথ্য-উপাত্ত দিয়ে পরবর্তী সময়ে তাঁদের মতের যথার্থতা প্রতিষ্ঠা করেন না।

অবশ্য এটি করার ক্ষেত্রে, অন্যতম সমস্যা হচ্ছে অর্থমন্ত্রী নতুন বাজেট উপস্থাপনকালে বিদায়ী বছরের অর্জন হিসেবে সংশোধিত বাজেটকে উল্লেখ করে থাকেন, কোন ক্ষেত্রে জুলাই-মার্চ সময়কালের প্রকৃত পরিসংখ্যান দিয়ে থাকেন। আমরা তাই মূল সূচকের জুলাই-জুন সময়কালের প্রকৃত বা অর্জিত পরিসংখ্যান পাই না। অথচ এ তথ্য না পেলে পরবর্তী অর্থবছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যকর বৃদ্ধির হার সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। সদ্য প্রস্তাবিত ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ঘটেনি।

প্রাক্কলিত বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জনকে তুলনা করলে দেখা যায়, এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গত তিন অর্থবছরে (২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫) মোট রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য ছিল যথাক্রমে ৮.৩%, ১৬.২% ও ১৬.৪%। ব্যয়ের ক্ষেত্রে তুলনীয় পার্থক্যগুলো হচ্ছে ৯.২%, ১৫.৪% ও ১৭.৪%। বাজেটের লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে বাস্তব অর্জনের পার্থক্য বৃদ্ধি এক অর্থে বাজেটের আর্থিক কাঠামোর গুণগত মানের ক্ষয়ই নির্দেশ করে।

বাজেটের আয় ও ব্যয় প্রাক্কলন যে বাস্তবে প্রতিফলিত হচ্ছে না শুধু তাই নয়, বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের ক্ষেত্রেও পরিকল্পনামাফিক অর্থ পাওয়া যাচ্ছে না। যেমন, গত বছর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বৈদেশিক সাহায্যের প্রায় ৫০% পাওয়া যায়নি। অবশ্য আয়-ব্যয় দু'টিই কম হওয়ায় বাজেট ঘাটতির ওপর কোন বিরূপ প্রভাব পড়েনি।

যেটি বলতে চেয়েছিলাম সেটি হল, সদ্য ঘোষিত ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটকে আমাদের সাম্প্রতিক এই অভিজ্ঞতার আলোকে দেখতে হবে। যেমন ধরুন, আগামী অর্থবছরে মোট রাজস্ব বৃদ্ধি ধরা হয়েছে ২৭%-এর ওপরে (বিদায়ী বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ওপর আগামী বছরের প্রাক্কলন), অথচ যাকে আমরা বিদায়ী বছরের শেষে সম্ভাব্য অর্জনের পরিমাণ বিবেচনায় নিই, তবে এই বৃদ্ধির হার হবে ৩৫%-এর ওপরে। অথচ গত দুই বছর (২০১৩-২০১৪) এই বৃদ্ধি ছিল ৪০%-এর কম। তাহলে, আগামী রাজস্ব আয়ের প্রাক্কলনে যথার্থতা নিয়ে যদি কেউ প্রশ্ন তোলে, তাহলে কি সেটি খুব অন্যায় হবে?

রাজস্ব আয় ১০% বৃদ্ধির হারকে ৩৬%-এ নেওয়া যায় না সেটি বলছি না। পৃথিবীর বহু স্বল্পোন্নত দেশ আছে, যারা বাংলাদেশের মোট রাজস্ব হারের (দেশজ আয়ের শতকরা হিসাবে) অনেক বেশি রাজস্ব আদায় করে থাকে। তবে তা করার জন্য যদি কোন পদক্ষেপ থেকে কত বাড়তি আয় আসবে বলা হত (যা বিভিন্ন দেশের বাজেটে বলা হয়ে থাকে) তবে আশ্বস্ত হওয়া যেত। সেটি জানলে আরও বোঝা যেত আগামী বছর দেশের কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠী বর্ধিত রাজস্বের কত ভাগ ভার বহন করবে। বর্ধিত করের উৎস আলোচনা থেকে এটি সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয় না।

মোট ব্যয়ের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। এবার (২০১৫-১৬) মোট সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির হার ধরা হয়েছে ২৩%-এর মত। অথচ, অর্থবছরের প্রকৃত ব্যয় (সংশোধিত বাজেট নয়) ধরলে এই বৃদ্ধির হার হবে ৪২%-এর ওপরে। লক্ষণীয়, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ১০%-এর মত। তাই বাজেটে ঘোষিত ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রাগুলো নিতান্তই স্ফীত করে দেখানো আছে, যা প্রকৃত আয়ের নিরিখে নিঃসন্দেহে সংকুচিত হয়ে যাবে ২০১৫-১৬-এর শেষে।

এর অর্থ কি এই যে, বাংলাদেশের কোন 'উচ্চাভিলাষী' বাজেট প্রস্তুত করা উচিত নয়? অবশ্যই করা উচিত। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যয় মোট দেশজ আয়ের মাত্র ১৬-১৭%-এর মত। অনেক তুলনীয় স্বল্পোন্নত দেশে এই হার ২০-২২%। আমাদের মত স্বল্প আয়ের দেশের উন্নয়ন চাহিদা মেটানোর জন্য নিঃসন্দেহে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ,

ইত্যাদি খাতে গুণমানসম্পন্ন রাষ্ট্রীয় ব্যয় অবশ্যই বাড়াতে হবে। তবে সে জন্য উচ্চ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে একটি নীতি ও প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও সংহতকরণের পরিকল্পনা লাগে। সেটি তো খুঁজে পাচ্ছি না।

ব্যয়ের ক্ষেত্রে অবশ্য বড় বিষয় হচ্ছে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার। আসলে যত না এডিপির আদায় নিয়ে কথা, তার চেয়ে বেশি চিন্তা তার প্রকার নিয়ে। আমরা জানি, এডিপি এক ধরনের প্রকল্প নৈরাজ্য। যেমন, অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা বৃদ্ধির বিপরীতে যেসব প্রকল্প ২০১৬ সালে শেষ হওয়ার কথা, তাতে কী দেওয়া হয়েছে? গত বছর তো তা পায়নি। এমনকি দ্রুতায়িত (ফাস্ট ট্র্যাক) আট-নয়টি প্রকল্প কি সেটি পেল?

বর্তমান সরকারের দুই দফায় ছয়টি বাজেট পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সরকার রাষ্ট্রীয় ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির হারকে বাড়ানোর চেষ্টা করছে। ব্যক্তি বিনিয়োগে মন্দা অবস্থার কারণে বর্ধিত রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ তথা মোট রাষ্ট্রীয় ব্যয় আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তিন-চার বছর ধরে।

কিন্তু বর্ধিত ব্যয় মেটানোর প্রথম দিকে সহজ থাকলেও বিগত তিন বছর রাজস্ব আদায়ে আগের তেজিভাব না থাকায় সরকারকে বেশি ঋণ করে ঘাটতি মেটাতে হয়। এ ক্ষেত্রে, বৈদেশিক অনুদান বা রেয়াতি ঋণ ব্যবহার করতে পারাটাই সর্বোত্তম। কিন্তু সেটিতে ব্যর্থ হলে, আভ্যন্তরীণ উৎস থেকে – ব্যাংক বা জনগণের কাছ থেকে ঋণ নিতে হয়। বিগত বাজেটগুলোতে আমরা তাই লক্ষ্য করি, দ্বিতীয় সর্বোত্তম পদক্ষেপ হিসেবে সরকার আভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণ নিয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে এগিয়ে নিতে চেয়েছে। আগামী অর্থবছরে আর্থিক কাঠামো পর্যালোচনা করলে সেই প্রবণতার ধারাবাহিকতাই লক্ষ্য করি। সেহেতু, সরকারের মোট ঋণের দায় আপাতত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে (মোট দেশজ আয়ের ৩৫%-এর মত), তাই হয়ত তাৎক্ষণিক কোন বড় দুশ্চিন্তা নেই। কিন্তু ঋণ পরিশোধজনিত ব্যয় বৃদ্ধির কারণে লাভের গুড় কিছুটা পিঁপড়ায় খাচ্ছে।

বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের সম্প্রসারণশীল অর্থনৈতিক ভঙ্গি সঠিক ছিল, যাকে অর্থনীতির ভাষায় বলে চক্র-বিপরীত পদক্ষেপ (কাউন্টার-সাইক্লিক্যাল পলিসি)। কিন্তু, এই রূপ অর্থনৈতিক ভঙ্গি দীর্ঘ সময়ের জন্য টেকসইভাবে অব্যাহত রাখা যায় না আর্থিক সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে, যাকে 'ফিসকাল স্পেস' না থাকা বলে। তখন প্রয়োজন হয় ব্যাপক নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অর্থনীতির দক্ষতা বাড়ানোর জন্য। সেটি করতে ব্যর্থ হলে রাষ্ট্রীয় ব্যয় সংকোচন অবধারিত হয়ে পড়ে সামষ্টিক স্থিতিশীলতার স্বার্থে। এটিই বলে বিশ্ব অভিজ্ঞতা।

আগামী বাজেটে বেশ কিছু রাজস্ব প্রস্তাব আছে, যা প্রণিধানযোগ্য। সঠিকভাবে করযোগ্য আয়ের ন্যূনতম পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে, নিবন্ধিত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিগুলোর প্রান্তিক কর হার কমানো হয়েছে, পুঁজিবাজারে লব্ধ করযোগ্য মুনাফার ন্যূনতম পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে, দেশজ শিল্পকে সুরক্ষা দিতে বা পরিবেশ দূষণকে নিয়ন্ত্রণ করতে নেওয়া হচ্ছে বেশ কিছু বিচক্ষণ পদক্ষেপ। তবে প্রশ্ন উঠবে, আগে পৌর এলাকার সঙ্গে জেলা-উপজেলার ন্যূনতম প্রদেয় কর হারের যে পার্থক্য ছিল, তা কেন উঠিয়ে দেওয়া হল। অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসরে প্রাপ্য আনুতোষিকের ওপর কেন কর আরোপ করা হবে?

শিশু বাজেট প্রচলনকে অভিনন্দন জানাতে হয়। জেন্ডার বাজেট অব্যাহত আছে। হয়ত, কোন দিন আমরা পৃথকভাবে প্রবীণদের জন্য বাজেট প্রণয়ন করব। তবে ধাক্কা খেতে হয় জেলা বাজেটের অন্তর্ধানে। অর্থমন্ত্রী বক্তৃতায় স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করা নিয়ে যা বলেছেন, সেটি একটি স্থানীয় সরকার অর্থায়ন কমিশন গঠনের লক্ষ্যে বড় যুক্তি।

মোটা দাগে, অন্য যে কোন বছরের মতই এবারের বাজেট এল। অর্থনীতিতে বিরাজমান স্বস্তিকে কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় কাঠামো এবং বিনিয়োগ পরিবেশের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থবহ মৌল সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণই থেকে গেল।

প্রথম আলো
৫ জুন ২০১৫

অর্থনীতি: নাজুক অবস্থান থেকে ভাল ভিতে

মোস্তাফিজুর রহমান

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে সশস্ত্র রূপ নেয়। আমরা একটি পৃথক রাষ্ট্র, মানচিত্র, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত পেয়েছি। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে নিহিত ছিল অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে বলেছিলেন, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। তিনি প্রথমেই বলেছিলেন 'মুক্তির সংগ্রামের' কথা। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যে ইশতেহার ঘোষণা করে, তাতে প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক কর্মসূচির বিশদ বিবরণ আছে। তারও আগে ১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচিতে অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া ছিল মুখ্য। আমাদের জাতীয় নেতারা স্পষ্ট করেই বুঝতে পেরেছিলেন, অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক স্বাধীনতার যেমন বিকল্প নেই, রাজনৈতিক স্বাধীনতা কখনই অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া অর্থবহ হবে না।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সঙ্গত কারণেই, বঙ্গবন্ধু সরকারের অন্যতম প্রধান কাজ হয়ে পড়ে যুদ্ধে বিধ্বস্ত অবকাঠামো পুনঃনির্মাণ এবং কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য কার্যক্রম পূর্ণোদ্যমে শুরু করা। একই সাথে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসহ সরকারের সব অর্থনৈতিক দলিলে এবং শীর্ষ নেতাদের উচ্চারণে উন্নয়নের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক মুক্তির বিষয়টি গুরুত্ব পেতে থাকে। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে সমস্যা ছিল তীব্র। পাকিস্তানের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্কও ছিন্ন হয়েছিল রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার মাধ্যমে। আমাদের নিজস্ব অর্থনীতি নতুন করে গড়ে তোলার কাজ হাতে নিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হয়েছে; বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামের সময় অর্থনীতির বিভিন্ন

শাখা-প্রশাখায় ব্যাপক ক্ষতি হয়। আমাদের তেমন কোন খনিজ সম্পদ ছিল না। জ্বালানি তেলের চাহিদার সবটিই আমদানি করে মেটাতে হয়েছে। খাদ্য উৎপাদনে ঘাটতি ছিল। শিল্প খাতের ভিত ছিল দুর্বল। একটি স্বাধীন দেশ যাত্রা শুরু করেছে; কিন্তু তার বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার ছিল একেবারে শূন্য, এমন নজির মেলা ভার। পাশ্চাত্যের কোন কোন পণ্ডিত এবং বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে যুক্ত অনেক বিশেষজ্ঞ সে সময়ে বাংলাদেশের সম্ভাবনা বিষয়ে চরম হতাশা ব্যক্ত করেছিলেন। হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে বলেছিলেন 'বাস্কেট কেস', যা কেবল পরনির্ভরতায়ই বেঁচে থাকতে পারে। ফা'ল্যান্ড এবং পার্কিনসন লিখেছিলেন, 'যদি বাংলাদেশে উন্নয়ন সফল হতে পারে, তাহলে এ বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহও থাকা উচিত নয় যে, বিশ্বের যে কোন স্থানেই উন্নয়ন সফল হবে। এ অর্থে বলা যায়, বাংলাদেশ হচ্ছে উন্নয়নের টেস্ট কেস।' তাদের এ অভিমতকে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায় যে, তাঁরা বলতে চেয়েছেন, যদি বাংলাদেশ উন্নত ও সমৃদ্ধ হতে পারে, তাহলে বিশ্বের যে কোন দেশ এ লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য কী করতে হবে, সেটি বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় নেতৃত্বের অজানা ছিল না। লক্ষ্য অর্জনে আমাদের বৈদেশিক সহায়তা অত্যাবশ্যক ছিল। খাদ্যে ঘাটতি ছিল। আরও অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ঘাটতি ছিল। জ্বালানি তেলের সবটাই আমদানি করতে হত। অবকাঠামো ছিল বিপর্যস্ত। শিল্প খাত ছিল দুর্বল। বিদ্যুৎ পৌঁছাত স্বল্পসংখ্যক মানুষের কাছে, পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো সরকার নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয় কিন্তু সেগুলোর পরিচালনার জন্য দক্ষ জনবলের অভাব ছিল।

এ প্রেক্ষাপটে, বঙ্গবন্ধুর সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপন্থা গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে দু'টি দিক বিবেচনায় রাখা হয়। এক. দ্রুত উন্নয়ন এবং দুই. সম্পদের বণ্টনে দরিদ্র জনগোষ্ঠী যেন ন্যায্যপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত না হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭০ সালে তাঁর নির্বাচনী ভাষণগুলোতে বারবার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর কথা বলেছেন। স্বাধীনতার পর এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে তিনি মনোযোগী হলেন। আয় বৈষম্য কমিয়ে আনার ওপর তিনি জোর দেন। বিশেষভাবে বলেন, ইনসাফ কায়েমের কথা। তিনি দক্ষ ও যোগ্য লোকদের নিয়ে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেন, যাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ষাটের দশকে ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি প্রণয়নের সময়ে। কৃষি জমির সর্বোচ্চ সিলিং নির্ধারিত হল। এর পরিমাণ এবং পরিবারের সংজ্ঞা নিয়ে মতের পার্থক্য ছিল; কিন্তু উদ্যোগটি তখনকার সময়ের একটি দাবির প্রতিফলন হিসেবে দেখতে হবে। শিল্প-বাণিজ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত খাত সৃষ্টির মূলে ছিল সমাজে সম্পদের ন্যায্য বণ্টনের আকাঙ্ক্ষা। এসব স্বপ্ন কেবল বঙ্গবন্ধু কিংবা তার দলের ছিল না, জাতি হিসেবেই

আমরা তা ধারণ করেছি। ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে আরও কয়েকটি দলের কর্মসূচিতে শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রায় অভিন্ন ভাষায় স্থান পেয়েছিল। আমাদের কাছে এটি স্পষ্ট ছিল যে, কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন নয়, অর্থনীতিতেও চাই ন্যায়বিচার। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দর্শন ছিল বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিনির্মাণ।

১৯৭১ সালের পরবর্তী প্রায় সাড়ে চার দশকে আমাদের উন্নয়নের বিভিন্ন সূচক থেকে উন্নতি সম্পর্কে ধারণা মেলে। কারও কারও কাছে এ অগ্রগতি উৎসাহব্যঞ্জক, কেউবা মনে করেন আরও অর্জন সম্ভব ছিল। কৃতিত্ব কিংবা ব্যর্থতার দায়ভার নিয়ে আলোচনা চলতেই পারে। কিন্তু বাংলাদেশ যে 'উন্নয়নের টেস্ট কেস' তত্ত্বকে ভুল প্রমান করেছে সেটি নিয়ে এমনকি যারা এ তত্ত্ব দিয়েছিলেন তারাও পরবর্তীতে দ্বিমত পোষণ করেন নি। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের জিডিপি ছিল ৬২০ কোটি ডলার (চলতি হিসেবে), ২০১৪ সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১৯ হাজার ৫০০ কোটি ডলার। আশির দশক থেকে প্রতি এক দশকে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ১ শতাংশ হারে বাড়ছে। মাথাপিছু আয় ১৯৭৩ সালে ছিল ১২০ ডলার, ২০১৫ সালে ১৩১৪ ডলার। দারিদ্র্যসীমার নিচে স্বাধীনতার পর দেশের প্রায় ৮০ শতাংশকে জীবন কাটাতে হত; এখন তা ২৫ শতাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। এ দেশ ছিল কৃষিভিত্তিক, জিডিপির বেশিরভাগ আসত কৃষি খাত থেকে, এখন ৮০ ভাগের বেশি আসে অকৃষি থেকে। খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে। আমদানি ও রফতানি খাত এখন অনেক বড়।

প্রবাসে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী কাজ করছে। তারা যে অর্থ দেশে পাঠান, তা দেশের মানুষের আয় বাড়াচ্ছে, স্থানীয় চাহিদার সৃষ্টি করছে, বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারকে ভাল অবস্থানে রাখছে। মোটা দাগের এসব তথ্য বলে দেয়, যে নাজুক অর্থনীতি নিয়ে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল তা এখন ক্রমান্বয়ে শক্তি সঞ্চয় করছে। যারা এক সময়ে টেস্ট কেস ফর ডেভেলপমেন্ট বলেছিল, তারাই ২০০৯ সালে মতের পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং লিখেছে – 'দি টেস্ট কেস রি-ভিসিটেড'। তারা বুঝতে পেরেছে যে, বাংলাদেশ নিয়ে তাদের ধারণা ঐতিহাসিকভাবে ভ্রান্ত ছিল। এ সময়কালে বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তাবিহীন দেশ থেকে খাদ্য নিরাপত্তা অনেকটা নিশ্চিত করার অবস্থানে পৌঁছাতে পেরেছে। আমরা প্রবলভাবে ছিলাম বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর দেশ, যেখান থেকে বাণিজ্য-নির্ভরতায় উন্নীত হয়েছি। নিজস্ব সক্ষমতায় উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারছি। সত্তরের দশকে আমাদের রফতানি আয় ও বৈদেশিক সহায়তার পরিমাণ ছিল প্রায় সমান। এখন সে অনুপাত ১২:১। মুক্তবাজার অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছে বাংলাদেশ। বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততা বেড়েছে। স্থানীয় শিল্পোদ্যোক্তারা রফতানি বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জন করছে। রাষ্ট্রীয় খাতনির্ভর

অর্থনীতি থেকে এখন বেসরকারি-ব্যক্তি খাতনির্ভর অর্থনীতি গড়ে উঠেছে এবং তাতে সরকারের নীতি-সহায়তা ও উদ্যোক্তা শ্রেণী উভয়েরই ভূমিকা রয়েছে। অর্থনীতিতে এ রূপান্তরের প্রভাব আমরা লক্ষ্য করছি জীবনযাত্রার ধরনে। মানুষের আয় বাড়ছে, ভোগে বৈচিত্র্য আসছে। হতদরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমছে। শিক্ষা-স্বাস্থ্যচিত্র বদলে যেতে শুরু করেছে। বস্তির সন্তানরাও মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পাচ্ছে। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে বাংলাদেশের সাফল্য বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছে।

আমাদের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভিশন ছিল আমদানি প্রতিস্থাপন শিল্পের ওপর গুরুত্ব প্রদান। তখন রাষ্ট্রীয় খাতের প্রাধান্য ছিল। সংরক্ষণমূলক নীতি অনুসরণ করা হত। চার দশক পর বলা যায়, আমরা ঠিক সেই লক্ষ্য ধরে অগ্রসর হইনি। মাঝে নীতি-কর্মপন্থায় রদবদল হয়েছে; কিন্তু উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে সামনে এগিয়ে চলেছে।

কিন্তু আমাদের সামনে এখন নতুন চ্যালেঞ্জ। এগিয়েছি, কিন্তু এখন অগ্রসরতার গতি বাড়াতে হবে। সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, চীন, ভারত, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে আমাদের অনেক ক্ষেত্রে যেমন বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। আমরা হাঁটলে আর তারা দৌড়ালে আমরা ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে পড়ব। এখন জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের কিছু বেশি। এক সময় ২০১৫ সালে ৮ শতাংশ অর্জনের লক্ষ্য ছিল আমাদের সামনে। তা অর্জন করা যায়নি। সামনে রয়েছে ২০২০ সালের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ – ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন। মাথাপিছু আয় আরও বাড়াতে হলে, নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশ থেকে উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশে পৌঁছাতে হলে ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন প্রয়োজন। সামনে রয়েছে ২০৪১ সালের আরেকটি চ্যালেঞ্জ – উন্নত দেশের সারিতে যাওয়া। আমরা যদি ২০২১ সাল থেকে প্রতিবছর ১০ শতাংশ করে মাথাপিছু আয় বাড়াতে পারি, তাহলে পরের ২১ বছরে মাথাপিছু আয় আটগুণ করা সম্ভব হবে। অর্থাৎ, এখন ১৩০০ ডলার থেকে ২১ বছরে মাথাপিছু আয় বেড়ে হবে ১০ হাজার ডলার। বলা যায়, এক প্রজন্মেই দেশে রূপান্তর সম্ভব।

এজন্য প্রয়োজন দক্ষ জনবল, প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ, বিনিয়োগে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ও সুশাসন। সরকারি ও বেসরকারি সম্মিলিত বিনিয়োগ বাড়িয়ে জিডিপির ৩৫ শতাংশের মত করা চাই। উদ্ভাবনে-সৃজনে আমাদের তরুণরা নিজেদের সক্ষমতার প্রমাণ রাখছে বারবার। তাদের স্বপ্নকে দেশের উন্নয়নের স্বপ্নের বাস্তবায়নে কাজে লাগাতে হবে।

বাজার-বৈচিত্র ও পণ্য-বৈচিত্র বাড়াতে হবে। ভারতসহ প্রতিবেশী দেশগুলোতে বিরাট বাজার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। কানেকটিভিটি নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। আঞ্চলিক

সহযোগিতার ফোরামগুলোর সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ, বে অব বেঙ্গল গ্রোথ বেল্ট, এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, যোগাযোগ নৈকট্য – এসব সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। বাংলাদেশের ব্যাপারে চীন, ভারত ও জাপানের মত অর্থনৈতিক শক্তির যে আগ্রহ, তার সুযোগ নিতে হবে।

বিশ্বায়ন যেমন সুযোগ দেয়, তেমনি চ্যালেঞ্জও আনে। রফতানী বাজারে প্রতিযোগিতা তীব্রতর হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে আমাদের পণ্যের প্রতিযোগী অনেক। ভিয়েতনাম সেখানে আমাদের চেয়ে তুলনামূলক ভাল অবস্থানে রয়েছে। তাদের সঙ্গে টিকতে হলে নিজেদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে হবে। কৃষি-শিল্প সব খাতেই নতুন প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন চাই। দক্ষ জনশক্তি চাই। তাহলেই বিশ্বের সঙ্গে দাম ও মানের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব হবে।

আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ – বৈষম্য কমানো। এর গতি বাংলাদেশে অগ্রগতির বিপরীতমুখী। উন্নয়নের সমান্তরালে বৈষম্য বাড়ছে। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা আছে। তবে সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে হলে শিক্ষায় জিডিপির অন্তত ৬ শতাংশ কিংবা জাতীয় বাজেটের ২০ শতাংশ বরাদ্দ করা চাই। সামাজিক-অর্থনৈতিক আপওয়ার্ড মোবিলিটি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মানসম্মত শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকৃত। এ ধরনের বিনিয়োগ এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের জন্য উন্নত জীবনের সোপান তৈরি করে দেবে। আমাদের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের জন্যও এর প্রয়োজন। আমরা ২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ চাইলে অবশ্য করণীয়গুলোকে বাস্তবায়ন করতে হবে। আমাদেরকে পরিবেশ সুরক্ষা করতে হবে; উন্নয়ন হতে হবে অর্ন্তভুক্তিমূলক ও পরিবেশ-বান্ধব। এ ক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য হবে – কেউ যেন পিছিয়ে না থাকে, কেউ যেন সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়।

অর্থনীতির পাশাপাশি আমাদের সুশাসনের প্রতি নজর দিতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক, দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন – এসব প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা চাই। অর্থনীতির ভিত মজবুত করার জন্য ভাল রাজনীতি অপরিহার্য। সুস্থ রাজনীতি, কার্যকর সংসদ, শক্তিশালী সুশীল সমাজ – এগুলো হচ্ছে অর্থনৈতিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত। বাংলাদেশের সুযোগের জানালা ও স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন কাজে লাগানোর এখনই সময়।

সমকাল
১২ আগস্ট ২০১৫

শিল্প-বাণিজ্যের কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টিতে যা জরুরি

খোন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

বাংলায় প্রবাদ রয়েছে – আদার বেপারীর জাহাজের খবর রাখা নিয়ে। প্রধানত, ব্যঙ্গার্থেই এর ব্যবহার হতে দেখা যায়। কিন্তু এখন বাংলাদেশের আদার বেপারীরও জাহাজের খবর রাখতে হয়। আরও অনেক ধরনের ব্যবসায়ীকেও জানতে হয় বিশ্ববাজারের সর্বশেষ হাল-হকিকত। কোন পণ্যের দাম বাড়ছে বা কমছে, কোন কোম্পানির জাহাজে পণ্য রফতানি বা আমদানি করলে সুবিধা, চট্টগ্রাম নাকি মংলা – কোন বন্দরের পণ্য খালাস বা বোঝাই করলে সময় কম লাগে এবং অর্থের সাশ্রয় হয় – এমনি নানা খবর তাদের জন্য জরুরি। বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা কোন পর্যায়ে সেটিও ব্যবসায়ীদের জানতে হয়। কোথায় সুবিধার মাত্রা বেশি এবং সেটির সর্বোত্তম ব্যবহার কীভাবে করা সম্ভব সেটি যেমন জানা থাকা চাই, তেমনি যেসব ক্ষেত্রে দুর্বলতা ও ঘাটতি রয়েছে তা দূর করার বিষয়টিও উপেক্ষার উপায় থাকে না। এসব ক্ষেত্রে, দেশ-বিদেশের অনেক গবেষণাধর্মী ও আর্থিক বিষয়ের প্রতিষ্ঠান থেকে মেলে সহায়তা। তারা বিশ্ব অর্থনীতির পরিবেশ নিয়ে কাজ করছে এবং তার ফল সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেস রিপোর্ট এমনই একটি উৎস, যা একই সঙ্গে বিশ্বাসযোগ্য এবং সহজলভ্য। প্রতি বছর এর প্রতিবেদন প্রকাশ হয় এবং তা বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশও উপকৃত হতে পারে।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর ঢাকায় একটি অনুষ্ঠানে ২০১৫-১৬ সময়ের প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয় সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ বা সিপিডির পক্ষ থেকে। একই সঙ্গে তুলে ধরা হয় বাংলাদেশে ব্যবসায়ের পরিবেশ সংক্রান্ত স্টাডির প্রতিবেদন।

গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেস রিপোর্টে দেখা যায়, উন্নত দেশগুলোই রয়েছে শীর্ষ দশটি স্থানে। সুইজারল্যান্ড এবং সিঙ্গাপুর পরপর কয়েক বছর রয়েছে প্রথম দু'টি স্থানে। যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান তৃতীয়। বাংলাদেশের অবস্থান দুই ধাপ উন্নত হয়েছে – ২০১৪ সালে ছিল ১৪০টি দেশের মধ্যে ১০৯তম, এবারে ১০৭। বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার (ম্যাক্রো ইকোনমি) উল্লেখযোগ্য উন্নতি এ সময়ে ঘটেছে – র‍্যাংকিং ৭২ থেকে ৪৯। অবকাঠোমো ক্ষেত্রে উন্নতি অবশ্য তেমন বেশি নয়, ১২৭ থেকে ১২৩। বাজারের আকারের স্থান ৪৪ থেকে ৪০-এ উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশের এ পরিবর্তন ঘটেছে বিশ্ব অর্থনীতিতে সামগ্রিক কিছু নেতিবাচক প্রবণতার মধ্যে। অনেক উন্নত দেশে এখন প্রবৃদ্ধির হারে শ্লথগতি। বেকারত্বের হার রয়েছে উচ্চ পর্যায়ে। তার প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের অর্থনীতির ওপরে পড়ছে। কিন্তু এর মধ্যেও দুই ধাপ উন্নতি উল্লেখযোগ্য। তবে এটিও মনে রাখতে হবে যে, গত বছরের তালিকায় বাংলাদেশের ওপরে থাকা দু'টি দেশকে এবারে টেকনিক্যাল কারণে বিবেচনায় নেওয়া হয়নি।

বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার বিষয়টি যেমন নিজ দেশের কর্মকাণ্ডের ওপর নির্ভর করে, একই সঙ্গে তাতে প্রভাব ফেলে অন্য অনেক দেশের কর্মকাণ্ড। যেমন, বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম যখন ক্রমশ বাড়ছিল, তখন তেল রফতানিকারক দেশগুলো তা থেকে বিপুলভাবে লাভবান হয়। বাড়তি আয়ের সুবাদে তারা বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে থাকে। সে সময়ে তেল আমদানিকারক দেশগুলোতে পড়তে থাকে এর নেতিবাচক প্রভাব। এখন আমরা দেখছি ভিন্ন চিত্র। তেলের দাম অনেক কমে গিয়েছে এবং এর ফলে আমদানিকারক দেশগুলোর ব্যয় কমছে। তেলের দাম কমে যাওয়ার কারণে বিশ্ববাজারে আরও কয়েক ধরনের পণ্যের দাম কিছুটা কমেছে। পরিবহন ব্যয়ও কমেছে। এ থেকে লাভবান হচ্ছে বাংলাদেশসহ আরও কয়েকটি দেশ, যারা শিল্পের কাঁচামালসহ বিভিন্ন ধরনের পণ্যের চাহিদা মেটাতে বিশ্ববাজারের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতির জন্য নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাপ্ত সুযোগকে কাজে লাগাতে পারার বিষয়টিকেও মনে রাখতে হবে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে ভারসাম্য বজায় রয়েছে। মৌলভিত্তিক সূচকে কোথাও কোথাও এগিয়েছে। আমাদের রফতানি বাড়ছে এবং কিছু প্রতিকূলতা ও জটিলতার পরও হিস্যা ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। মুদ্রার বিনিময় মূল্য স্থিতিশীল ও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ বেড়েছে। আকাশ পথের উন্নতি ঘটছে। তবে ব্যবসায়ীরা সড়ক ও নৌপথের প্রতি আরও মনোযোগ প্রত্যাশা করেন। এ থেকে করণীয় স্পষ্ট – অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো এবং তা থেকে ভাল ফল আদায়।

ব্যবসা-বাণিজ্যের যথাযথ পরিবেশের জন্য আরও দু'টি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে, যেখানে জরুরি পদক্ষেপ চাই – সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা। এ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে বাংলাদেশ এখনও কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ের ধারে কাছেও নেই। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশের অবস্থান এ সূচকে সর্বনিম্ন দশটি দেশের সারিতে। আমাদের অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বাড়াতে হবে এবং সুশাসনের প্রতি নজর দিতে হবে।

আমাদের শিক্ষার প্রসার ঘটছে, তাতে সন্দেহ নেই। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৫ কোটি ছাত্র-ছাত্রী পড়ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র ও ছাত্রীদের অনুপাত সমান। কিন্তু এখন নজর চাই মানের প্রতি। টেকসই উন্নয়নের যে ১৭টি লক্ষ্য জাতিসংঘ নির্ধারণ করেছে তাতেও শিক্ষার মানের ওপর জোর দিতে বলা হয়েছে। দক্ষতা বৃদ্ধির সূচক উন্নত করতে হলে বাংলাদেশকে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষার জন্য বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। আরও যেসব বিষয়ে মনোযোগ চাই সেগুলো হচ্ছে – আর্থিক খাতের উৎকর্ষতা বাড়ানো, প্রযুক্তিগত প্রস্তুতি এবং বাজারের দক্ষতা বৃদ্ধি। আমাদের আভ্যন্তরীণ বাজারের আকার বড় হচ্ছে। ব্যবসায়ীরা এ বাজারকে উল্লেখযোগ্য শক্তি হিসেবে গণ্য করছেন। দেশে রয়েছে বড় একটি ক্রেতা গোষ্ঠী। এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখছে কৃষি খাতের ধারাবাহিক সাফল্য, তৈরি পোশাকশিল্পের লাখ লাখ কর্মীর উপার্জন এবং প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশীদের নিয়মিত পরিবারের সদস্যদের কাছে অর্থ প্রেরণ।

ব্যবসায়ীরা অগ্রযাত্রার পথের সমস্যা হিসেবে আর্থিক খাতে দক্ষতা বাড়ানোর বিষয়টিকে সামনে এনেছেন। বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য ব্যাংক থেকে নেওয়া সুদের হার দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি। এর ফলে শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার পেছনে ব্যয় বেশি পড়ছে। এখানের অডিট মান দুর্বল, সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছে না।

তথ্য-প্রযুক্তির বিষয়েও মনোযোগ চাই। এ খাতের গুরুত্ব বাড়ছে। মোবাইল ফোনের গ্রাহক ১৩ কোটি, এটি ভাল খবর। ইন্টারনেট ব্যবহার বাড়ছে। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছায় ঘাটতি নেই। ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের স্লোগান সুফল দিতে শুরু করেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এ সুবিধা ব্যাপকভাবে কাজে লাগানোর আয়োজন তেমন লক্ষ্য করা যায় না। ই-বেজড লেনদেন, ওয়েব-বেজড বিজনেস মডেল – এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে। শিক্ষার সঙ্গে ব্যবসায়ের সংযোগ সাধনও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ এখন পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নেই। এ সূত্রে প্রযুক্তি হস্তান্তরও খুব একটি ঘটছে না।

ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য দক্ষ মানবসম্পদের অব্যাহত যোগান থাকা চাই। কিন্তু অর্থনীতিতে যে মানের দক্ষ কর্মীর চাহিদা রয়েছে, সেটি মিলছে না বাংলাদেশে। দেশে পাঁচ কোটি শিক্ষার্থী – এটি বড় অর্জন। কিন্তু উচ্চমানের কর্মীর যোগান কোথায়? স্বাস্থ্য খাতেও নজর চাই। সরকারি হাসপাতালের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু অনেক মানুষ রয়ে গিয়েছে, যারা এ সেবা থেকে বঞ্চিত থাকছে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন রয়েছে সেবার মান নিয়ে।

আমরা প্রবৃদ্ধির হার এ বছরেই ৭ শতাংশের ওপরে নিতে চাই। গত কয়েক বছর ধরেই এটি লক্ষ্য। কিন্তু প্রত্যাশা পূরণ হচ্ছে না। নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের সারিতে যেতে হলে এ বাধা জয় করতে হবে। আর সেজন্য চাই শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত খাত থেকে আরও বেশি অবদান।

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধাগুলো কী কী – এ প্রশ্নে পরপর দু'বছরেই (২০১৪ ও ২০১৫) ব্যবসায়ীরা বলছেন অপর্যাপ্ত অবকাঠামোর কথা (গত বছর ছিল ২০.৩ এবং এ বছর ১৮.৬ শতাংশ); এর পরেই রয়েছে দুর্নীতি (গত বছর ১৯.৭ এবং এ বছর ১৮.২ শতাংশ); অদক্ষ সরকারি আমলাতন্ত্রের স্থান তৃতীয় (যথাক্রমে ১৪.৫ এবং ১২ শতাংশ)। তবে একটি বিষয় লক্ষণীয় – এই তিনটি বিষয়ের কথা এ বছর উল্লেখ করেছেন মোট উত্তরদাতাদের ৪৮.৮ শতাংশ, গত বছর যা ছিল ৫৪.৫ শতাংশ। এ অগ্রগতি ধরে রাখা এবং উন্নতি হার আরও দ্রুততর করতে পারা চাই। ব্যবসায়ীরা প্রবৃদ্ধির পক্ষে আরও যেসব সমস্যার কথা বলেছেন তার মধ্যে রয়েছে, সরকারের স্থিতিশীলতা বিষয়ে সংশয়। গত বছর এ সংশয় ছিল ৯.৪ এবং এবারে ১১.৬ শতাংশ। এ বিষয়টি রাজনৈতিক, কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশিরাও এ সংক্রান্ত তথ্য খুঁটিয়ে দেখেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে। তারা জাতীয় সংসদকে সর্বদা কার্যকর দেখতে চান। এটিও কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, বাংলাদেশে ব্যবসায়ীদের একটি অংশ সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখার সূত্রে লাভবান হচ্ছে। এ কারণে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের যা সমস্যা, তাদের জন্য এটি প্রযোজ্য না-ও হতে পারে। সংসদে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য রয়েছেন, যাদের মূল পরিচয় রাজনীতিক নয়, বরং ব্যবসায়ী। তারা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়েন না। তবে সব ব্যবসায়ী এ সুবিধা ভোগ করেন না। তাদের দেশের বাজারে দেশীয় উৎপাদক ও আমদানি করা পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়। বিশ্ববাজারেও প্রতিযোগিতা করতে হয়। বাজারভিত্তিক কাঠামোতে আমরা সফলভাবে প্রবেশ করতে চাই। এখানে সবার জন্য সমান সুযোগ থাকতে হবে। যারা সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারে এবং যারা পারে না – এই দুইয়ের মধ্যে কোন বৈষম্য চলবে না। আমাদের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী

কিংবা কৃষক সবার সঙ্গেই কিন্তু দেশি-বিদেশি বাজারের সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে। তারাও নতুন বিশ্বব্যবস্থা থেকে লাভবান হতে পারে। আর এটি নিশ্চিত করতে পারলেই দেশ নিকট ভবিষ্যতে মধ্যম আয়ের দেশের সারিতে পৌঁছানোর লক্ষ্য অর্জন করতে পারে।

সমকাল
৫ অক্টোবর ২০১৫

অর্থনীতিতে স্বস্তির বছর

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

এ বছর সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকগুলোর ক্ষেত্রে এক ধরনের স্বস্তিদায়ক পরিস্থিতি গিয়েছে এবং মোটামুটি বছরজুড়েই তা বিরাজ করেছে। কিন্তু এর সুবিধা উৎপাদন বা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যতটা হওয়ার মত প্রত্যাশা ছিল, তা পুরো মাত্রায় পাওয়া যায়নি। এ বছর দেশি ও আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদার ওঠানামার কারণে শিল্প খাতের উৎপাদনে ওঠানামা ঘটেছে। রফতানিমুখী শিল্প খাতগুলোতে এর একটি প্রতিক্রিয়া আমরা সারা বছর ধরেই লক্ষ্য করেছি। একই সঙ্গে রফতানিমুখী শিল্প খাতগুলোতে মুদ্রাবিনিময় হারের প্রতিক্রিয়া ঘটেছে। টাকা ডলারের বিপরীতে মোটামুটি শক্তিশালী ছিল। ফলে, রফতানিতে কিছুটা হলেও একটি সামগ্রিক প্রভাব দেখা গিয়েছে। আবার বিনিয়োগ ও উৎপাদন সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কিছুটা শ্লথ থাকার প্রতিক্রিয়ায় আভ্যন্তরীণ বাজারে এর প্রভাব পড়ে থাকতে পারে। এটি রেমিট্যান্সের শ্লথ প্রবৃদ্ধির কারণেও হতে পারে। ফলে আভ্যন্তরীণ বাজারনির্ভর শিল্পগুলোর উৎপাদনের যে প্রবৃদ্ধি তা কিছুটা হলেও শ্লথ ছিল বলে বছর শেষে তথ্য-উপাত্তে দেখা যাচ্ছে।

তবে স্বস্তির জায়গাটি হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী পেট্রোলিয়ামের কম দর বা ধারাবাহিক মূল্যপতনের ফলে সরকারের আমদানিজনিত ব্যয় কিছুটা সাশ্রয় হয়েছে; যদিও এর সুবিধাটি ভোক্তা পর্যায়ে পৌঁছানো যায়নি। অন্যদিকে, মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রেও আমরা মোটামুটি স্বস্তিদায়কভাবে বছরটি শেষ করেছি। ভোক্তা পর্যায়েও হয়ত মানুষ সে সুবিধা পেয়েছে। তবে এই সুবিধাটি আরও বেশি পাওয়া যেত যদি মূল্যস্ফীতি আরও কিছুটা নিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে রাখা যেত। আমরা এও দেখেছি, সুদের হারের ক্ষেত্রে এক ধরনের শ্লথ পতন হয়েছে। তবে এখনো তা উচ্চ মাত্রায়ই রয়েছে। বিনিয়োগে সহায়ক যে সুদহার সাধারণত বিনিয়োগকারীরা প্রত্যাশা করেন, তা এখনো পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে না।

গত বছরের অর্ধাংশ এবং এ বছরজুড়ে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বড় বড় প্রকল্প গ্রহণ ও সেগুলো বাস্তবায়নকাল চলছে; যদিও সবগুলোর অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক বা সন্তোষজনক তা বলা যাবে না। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, পদ্মা সেতুর কাজের অগ্রগতি ও মূল পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ উদ্বোধন বা শুরু হওয়া। তবে সমস্যা হচ্ছে, যে হারে সরকারি বিনিয়োগ বাড়ছে সে হারে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লিংকেজ ইফেক্ট অর্থাৎ ধনাত্মক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। এই লিংকেজ ইফেক্টকে ক্রাউডিং ইফেক্টও বলে। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে, সরকারকে আগামী দিনগুলোতে প্রকল্পের গুণমান দেখা এবং প্রকল্প সীমিত রাখার দিকে নজর দিতে হবে।

এ বছর আঞ্চলিক পর্যায়ের কিছু উদ্যোগেরও গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। চার দেশের মধ্যকার মোটর ভেহিকল অ্যাগ্রিমেন্টের টাইমফ্রেম হয়েছে। আমি মনে করি, এর একটি দীর্ঘমেয়াদি সুফল বাংলাদেশ আগামীতে পেতে পারে। তবে এটি বাস্তবায়ন করতে বিপুল বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে এবং এই বিনিয়োগের সঙ্গে সমন্বয় রেখে বাকি দেশগুলোকেও তাদের সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোয় বিনিয়োগ করতে হবে।

আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ে সরকার নজর দিচ্ছে। জমিস্বল্পতার বিষয়টি মাথায় রেখে স্পেশাল ইকোনমিক জোন করার ক্ষেত্রে কিছু উদ্যোগ আমরা দেখতে পাচ্ছি। তবে উদ্যোগগুলো এখনো বেশ প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। উদ্যোগগুলোর বাস্তবায়ন যাতে আগামী এক বা দুই বছরের মধ্যে শেষ করা যায় সেদিকে আরও নজর দেওয়া দরকার। কারণ, জমিস্বল্পতার কারণেও অনেক দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ এখান থেকে চলে যাচ্ছে। তবে দেশে উত্তরোত্তর নতুন বিনিয়োগ পরিবেশে জটিলতা বাড়ছে। নতুন বিনিয়োগকারীদের কথা মাথায় রেখে বিনিয়োগ পরিবেশ আরও উন্নত করার প্রয়োজন রয়েছে।

আরেকটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। দেরিতে হলেও ম্যান্ডেটরি প্যাকেজিং অ্যাক্ট বাস্তবায়নের ওপর বছর শেষে গুরুত্ব দেওয়া হল। এ আইন বাস্তবায়ন করা গেলে আমাদের পাটশিল্পের একটি বড় বাজার সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে। বাজার বড় হলে সরকারি ও বেসরকারি পাটকলগুলো চালানো ভায়াবল অবস্থায় যেতে পারে।

সব শেষে বলি, বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ হয়েছে। এটি আনন্দের বিষয়, আবার উদ্বেগেরও। কারণ এর মাধ্যমে নতুন ধরনের দায়িত্বের মধ্যে বাংলাদেশ উপনীত হচ্ছে। আগামীতে হয়ত সুদের হার বা ঋণের সুদ আদায়ের চাপটি বেড়ে যাবে। এ ছাড়া, এই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ যদি এলডিসি থেকে বেরিয়ে যায়, তখন আমরা

স্বল্পোন্নত দেশের বর্তমান সুবিধাগুলো হারাব। তবে এ ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কিছু সুযোগও আমাদের তৈরি হয়েছে। যেমন, পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স, শ্রমবিষয়ক কমপ্লায়েন্স – এই জায়গাগুলোতে উন্নতি করার বিষয়টি সামনে চলে এসেছে। তবে আমরা শুধু গার্মেন্ট খাতে এ জায়গাগুলোয় জোর দিচ্ছি। ভবিষ্যতে বাজার সুবিধা পেতে হলে গার্মেন্টের বাইরে অন্যান্য রফতানিমুখী খাতের কমপ্লায়েন্সের দিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে। আবার নতুন নতুন জোট গঠনের উদ্যোগ আমরা দেখছি বিশ্বব্যাপী। এর ঋণাত্মক প্রভাবও বাংলাদেশে পড়তে পারে। নতুন চুক্তিগুলোর অভিঘাত বিবেচনা করে বাংলাদেশ কীভাবে আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংযোগের ক্ষেত্রে নতুন জোটের অংশ হতে পারে, এ নিয়ে সরকারকে কাজ করতে হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সক্ষমতা বাড়াতে হবে, যাতে এ ধরনের বাণিজ্য আলোচনায় আরও ভালভাবে অংশগ্রহণ সম্ভব হয়।

কালের কণ্ঠ
২৯ *ডিসেম্বর* ২০১৫

নিরাপত্তা ঝুঁকি দূর করতেই হবে

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

ধর্মান্ধ চরমপন্থি একটি মহলের সশস্ত্র তৎপরতা বাংলাদেশে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে আলোচিত। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এ ধরনের একটি গোষ্ঠী আলবদর-রাজাকার বাহিনী সংগঠিত করেছিল। তবে তারা কাজ করেছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগী হিসেবে। ২০০৫ সালে আমরা বাংলাদেশে জেএমবি নামে পরিচিতি পাওয়া একটি গোষ্ঠীর দৃশ্যপটে আবির্ভাব দেখেছি, যারা একদিনে ৬৩ জেলায় বোমা হামলা চালাতে পেরেছিল। তারা দেশের আরও কয়েকটি স্থানে আত্মঘাতী বোমা-গ্রেনেড হামলা পরিচালনা করে, যাতে অনেক হতাহত হয়। এর আগেও রমনা বটমূলে বাংলা নববর্ষের অনুষ্ঠানসহ কয়েকটি জনাকীর্ণ স্থানে এ ধরনের হামলা আমরা দেখেছি। সরকার এ ধরনের অপতৎপরতা দমনে কঠোর অবস্থান নেয় এবং কয়েকজনের শাস্তি হয়। এ ধরনের সন্ত্রাসী তৎপরতা বাংলাদেশের মানুষ আদৌ পছন্দ করে না।

১ জুলাই রাজধানীর গুলশানে হলি আর্টিসান বেকারিতে সন্ত্রাসী হামলার প্রকৃতি আগের বিভিন্ন হামলার তুলনায় নিঃসন্দেহে ভিন্নতর। এ হামলার টার্গেট ছিল বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশিরা। সন্ত্রাসীরা ২০ জনকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। তাদের মধ্যে নারীও রয়েছেন। হামলাকারীদের রুখতে গিয়ে দু'জন পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। আহতের সংখ্যা অন্তত অর্ধশত। এ ঘটনার পর দেশব্যাপী নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। কিন্তু ৭ জুলাই পবিত্র ঈদের দিনে কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় ঈদের জামাতের কাছেই সন্ত্রাসী হামলা হয়। এতে একজন হামলাকারী নিহত হয়। তাদের প্রতিহত করতে গিয়ে পুলিশ বাহিনীর দু'জনের মৃত্যু হয়েছে।

এ দু'টি ঘটনা দেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। তবে ১ জুলাই গুলশানের ঘটনাটির সঙ্গে বাড়তি উপাদান রয়েছে – স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ার শঙ্কা। এর কয়েকটি দিক রয়েছে। প্রথমত, ইমেজ সংকট। সাধারণভাবে ধারণা রয়েছে – বাংলাদেশ মধ্যপন্থি মুসলিম দেশ এবং এখানে ধর্মীয় চরমপন্থি শক্তির তেমন অবস্থান নেই। গুলশানে যেসব বিদেশিকে হত্যা করা হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে ১৬ জন জাপানী ও ইতালীয় নাগরিক। তাদের বেশিরভাগ বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এ দু'টি দেশের একজন করে নাগরিক বছরখানেক আগে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হয়েছেন। এর পেছনে কারা জড়িত, সেটি নিয়ে এখন পর্যন্ত সংশয় রয়ে গিয়েছে। সঙ্গত কারণেই ওই দু'টি দেশের সরকার ও জনগণের মধ্যে এ নিয়ে ক্ষোভ ও হতাশা রয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় ১ জুলাইয়ের হামলা ঘটেছে। এখন জরুরি কাজ হচ্ছে, ইমেজ সংকট দূর করায় উদ্যোগ গ্রহণ। প্রধানমন্ত্রীসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ নিহতদের জন্য শোক প্রকাশ করেছেন। আর্মি স্টেডিয়ামে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাদের স্মরণ করা হয়েছে। আমাদের বিশেষভাবে এখন সচেষ্ট হতে হবে, যাতে এসব ঘটনার বিরূপ প্রভাব অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ওপর না পড়ে। আমরা জাপান টাইমসের খবর থেকে জেনেছি, যেসব জাপানী ১ জুলাই হলি আর্টিসানে নিহত হয়েছেন তাদের পরিবারের সদস্যরা আন্তরিকভাবে চাইছেন যাতে তাদের স্মৃতিবিজড়িত বাংলাদেশের প্রকল্পগুলোতে জাপান সরকারের সহায়তা অব্যাহত থাকে। এ ধরনের ঔদার্য আমাদের মুগ্ধ করে। আমরা পরিসংখ্যানের প্রতি তাকাতে পারি। জাপানে বাংলাদেশ প্রতি বছর ১০০ কোটি ডলারের মত পণ্য রফতানি করে। বাংলাদেশে তাদের মোট বিনিয়োগ রয়েছে ৩৩ কোটি ২০ লাখ ডলারের মত। গত বছর বাংলাদেশ জাপানের কাছ থেকে ঋণ সহায়তা পেয়েছে ২২ কোটি ৭০ লাখ ডলারের, যার জন্য সুদ দিতে হবে নামমাত্র হারে।

ইতালিও বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত এ দেশটিতে বাংলাদেশ শুল্কমুক্ত রফতানি সুবিধা পাচ্ছে। বছরে সেখানেও ১০০ কোটি ডলারের মত পণ্য রফতানি হয়। বাংলাদেশে তাদের বিনিয়োগ রয়েছে ৪ কোটি ডলারের বেশি।

উভয় দেশই অর্থনৈতিক বিবেচনায় বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। হলি আর্টিসানের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় তা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। এর পেছনে মানবিকতার তাগিদই প্রধান হতে হবে। তারা আমাদের দেশে কাজ করছিল আমাদেরই কল্যাণের জন্য। কিন্তু, নিষ্ঠুর ঘাতকরা তাদের প্রাণ কেড়ে নিল। তাদের প্রতিটি পরিবারের জন্য আমাদের শোক ও সমবেদনা। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের

প্রতিনিধি দল নিহতদের প্রতিটি পরিবারের কাছে সরাসরি উপস্থিত হয়ে শোক প্রকাশ করলে সেটিই হবে যথার্থ পদক্ষেপ। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূতও যেতে পারেন।

বড় ধরনের সন্ত্রাসী অভিঘাত নানাভাবে আসে। এখন কোন কোন দেশ কিংবা একসঙ্গে অনেক দেশ বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াতে কিংবা নতুন করে বিনিয়োগকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করতে পারে। আন্তর্জাতিক ক্রেডিট রেটিং এজেন্সিও বাংলাদেশের পরিস্থিতি গভীর মনোযোগসহ পর্যবেক্ষণ করবে। যেহেতু, বাংলাদেশে নিরাপত্তা ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে তাই ঋণের পরিমাণ, সুদের হার ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে এর প্রভাব পড়তে পারে। এখন আমাদের জরুরি কাজ হবে নিরাপত্তা পরিস্থিতি বিষয়ে বিশ্ব সম্প্রদায়ের উদ্বেগ যত দ্রুত সম্ভব কাটিয়ে ওঠা যায়, সেজন্য সচেষ্ট হওয়া। এ জন্য সরকারি পর্যায়ে তৎপরতা চাই। একই সঙ্গে বেসরকারি পর্যায়েও উদ্যোগ থাকতে হবে। গণমাধ্যমের সহযোগিতাও গুরুত্বপূর্ণ। দেশীয় বিনিয়োগকারীরাও কিন্তু থমকে থাকতে পারে। এমনিতেই বাংলাদেশে বেসরকারি বিনিয়োগ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নেই। মূলধন পাচার উদ্বেগজনক পর্যায়ে রয়েছে। এর অন্যতম কারণ হিসেবে বলা হয় — দেশে বিনিয়োগে যথেষ্ট আস্থা নেই।

বাংলাদেশ এখন ঋণ-অনুদানের ওপর আগের মত নির্ভরশীল নয়। অর্থনীতির ভিত একটু একটু করে শক্ত হচ্ছে। কিন্তু তারপরও উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থার সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে এ ধরনের সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে, সেটি স্বীকৃত। সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী হামলার পর আমাদের বৈদেশিক সাহায্য কাঠামোতে কিছু পরিবর্তন আসতে পারে বলে ধারণা করা হয়। যেমন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার। উন্নয়ন সহযোগীদের নিরাপত্তা বাহিনীর দক্ষতা ও অস্ত্রসজ্জার প্রতি মনোযোগ বাড়তে পারে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিদেশিদের বাংলাদেশে আগমন ও অবস্থানের সময় কমে গেলেও বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। এর প্রভাব পড়তে পারে পর্যটন শিল্পে। তবে সরকার যদি আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করার মত দ্রুত পদক্ষেপ নিতে পারে, তাহলে স্বল্প সময়ের মধ্যেই শঙ্কা কাটতে পারে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সন্ত্রাসবাদ দমনে বাংলাদেশের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছে। এর প্রকৃতি কী ধরনের হবে, সেটি এখন পর্যন্ত অস্পষ্ট। তবে সরকার কীভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করছে সেটি দেখতে চাইবে সবাই। এটি ঠিক, চোরাগোপ্তা সন্ত্রাস সব ক্ষেত্রে মোকাবেলা করা সম্ভব হয় না। কিন্তু ব্যক্তি কিংবা সম্পদের ওপর আঘাত হেনে কেউ রেহাই পাবে না, সেটি নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে, স্বচ্ছতার বিষয়টিও সর্বদা মনে রাখা চাই।

সন্ত্রাসবাদের সংকট বৈশ্বিক। একই সঙ্গে স্থানীয় মদদও থাকে। সন্ত্রাসবাদ দমনে আন্তর্জাতিক সহায়তার পাশাপাশি আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনীর দক্ষতা বাড়ানোর

পদক্ষেপ নিতে হবে। আমাদের কোথায় ঘাটতি আছে, সেটি চিহ্নিত করতে হবে। গোয়েন্দা বাহিনী আগেভাগে সতর্কতা জানাতে অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ – এমন সমালোচনা রয়েছে। তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও লজিস্টিক সমর্থন প্রদান করার বিষয়টি এখন নতুন গুরুত্ব পাবে।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক পর্যায়ে ব্লেমগেম বা পারস্পরিক দোষারোপের ঘটনা আমরা দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু সবাইকে বুঝতে হবে যে, দেশের স্বার্থ সবার ওপরে। বিশেষভাবে, উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রভাবিত হওয়া। বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নাগরিক কাজ করছেন। বাংলাদেশকে বিদেশিরা নিরাপদ মনে না করলে প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশীদের জন্যও তা সমস্যার কারণ হতে পারে। তারা বাড়তি নজরদারিতে পড়তে পারেন। নতুন কর্মী নেওয়া বিঘ্নিত হতে পারে। সর্বোপরি, সমস্যা দেখা দিতে পারে রেমিট্যান্স প্রবাহে। আমাদের দলমত নির্বিশেষে এ বাস্তবতা বিবেচনায় রেখে কাজ করতে হবে। আমার বিবেচনায়, বর্তমান অবস্থায় সব শ্রেণী-পেশার মানুষকে নিয়ে জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদবিরোধী একটি অরাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা জরুরি। জেলা, উপজেলা, গ্রাম – সর্বত্র তারা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কাজ করবে। জঙ্গিবাদ মোকাবেলার কৌশল নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের কথাও ভাবা যেতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের বেসরকারি সংস্থা-সংগঠনকে যুক্ত করা যায়। জাতিসংঘও এ উদ্যোগে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে।

বাংলাদেশে বিদেশি কর্মীরা যেসব প্রকল্পে কাজ করছেন সেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই জোরদার করা হয়েছে। বিশেষ করে ভাবতে হবে পদ্মা সেতুর কথা। নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি নজর দেওয়ার পাশাপাশি সাময়িক একটি পদক্ষেপও বিবেচনা করা যায় – যেখানে যেখানে সম্ভব স্থানীয় কর্মীদের দিয়ে কাজ চালানো। আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির যে সুবিধা ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে সৃষ্টি হয়েছে তার সহায়তাও নিতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্তরাও এ বিষয়টি ভাবতে পারেন। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বেসামরিক নিরাপত্তা সার্ভিসের সুযোগ গ্রহণের বিষয়টিও বিবেচনা করতে পারে। নিরাপত্তা নিয়ে যে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে, সেটি দূর করতেই হবে।

সমকাল

১৩ জুলাই ২০১৬

‘দামি টাকা’ এখন নানামুখী চাপে

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

কয়েক বছর ধরেই মার্কিন ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশের মুদ্রা টাকার দর স্থিতিশীল রয়েছে। একটি সময় ছিল যখন মার্কিন ডলারের তুলনায় টাকার দাম নিয়মিত কমে যাচ্ছিল। “টাকার আরেক দফা অবমূল্যায়ন” – এটি ছিল সংবাদপত্রের নিয়মিত শিরোনাম। এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হত বাংলাদেশ ব্যাংকে, তবে তাতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সায় থাকত। এ অবস্থায় এক যুগেরও বেশি আগে ফিক্সড এক্সচেঞ্জ রেট থেকে ম্যানেজড ফ্লোটিং রেটে বাংলাদেশের উত্তরণ ঘটে। পরের বছরগুলোতে ডলার এবং অন্যান্য মুদ্রার তুলনায় বাংলাদেশের টাকার কখনও অবমূল্যায়ন ঘটেছে, কখনও বা স্থিতিশীল রয়েছে। একটি সময় মনে হচ্ছিল, এক ডলারের মূল্য ১০০ টাকায় পৌঁছাতে পারে। অফিসিয়াল রেট ও বাইরের বিনিময় হারেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে শেষ পর্যন্ত ডলার কিনতে ১০০ টাকার প্রয়োজন পড়েনি। টাকা ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। বরং বিনিময় হারে এক ধরনের স্থিতিশীলতা লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোর মুদ্রার তুলনায় টাকার অবস্থান বেশ ভাল ছিল।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে, কিছু প্রবণতা মুদ্রা বিনিময় হার নিয়ে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। খোলা বাজারে বা কার্ব মার্কেটে টাকার বিপরীতে মার্কিন ডলারের মূল্য বেশি। এ অবস্থায় প্রবাসে কর্মরত লাখ লাখ বাংলাদেশী তাদের আয় ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে পাঠাতে নিরুৎসাহ বোধ করছে। খোলা বাজারে যদি এক ডলারের বিনিময়ে ৮২ টাকা মেলে, তাহলে কেন তারা ব্যাংকিং চ্যানেলে পাঠিয়ে ৭৮ টাকা গ্রহণ করবে? ধরা যাক, প্রতি মাসে ব্যাংকের মাধ্যমে ১০০ কোটি ডলার দেশে আসে। অফিসিয়াল ও কার্ব মার্কেটের রেটের পার্থক্যের কারণে প্রাপকরা তাহলে কিন্তু ৪০০ কোটি টাকা কম পাবে। বিনিময় হারে কয়েক বছর স্বস্তিদায়ক পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এ সময়ে

রফতানিকারকরা সুবিধা পেয়েছে। প্রবাস থেকেও অর্থ প্রবাহ বেড়েছে। মূল্যস্ফীতি ছিল নিয়ন্ত্রণে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ে কখনও দুশ্চিন্তায় পড়তে হয়নি। বরং আমরা দেখি, ক্রমাগত এর পরিমাণ বেড়ে চলছিল। রিজার্ভ রেকর্ড পরিমাণ – এমনটিও সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়েছে অনেকবার। এ সময়ে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করি – বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার অব্যাহতভাবে ৬ শতাংশের ওপরে থাকা, যা সাত শতাংশও অতিক্রম করার পর্যায়ে রয়েছে। উন্নত বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দার সময়েও বাংলাদেশ তার এ অবস্থান ধরে রাখতে পারে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ দুই অংশীদার চীন ও ভারত। তবে দু'টি দেশ থেকেই আমাদের রফতানির তুলনায় আমদানি অনেক বেশি। তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশ্বের নজর কাড়তে শুরু করেছে অনেক আগেই। বিশ্ববাজারে রয়েছে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে তাদের রফতানি প্রচুর। আবার এসব দেশেই বাংলাদেশের রফতানি পণ্য, বিশেষ করে পোশাকের বাজার। ডলারের তুলনায় টাকার মূল্যমান স্থিতিশীল থাকায় রফতানি বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে, এমন অভিমত বিভিন্ন মহল থেকে শোনা যেতে থাকে। তারা মনে করেন, দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার স্বার্থে টাকার মূল্যমান কিছুটা কমানোর সময় এসেছে। এটিও মনে রাখা দরকার যে, গত কয়েক বছরে ডলারের বিপরীতে এশিয়ার প্রায় সব প্রধান মুদ্রার অবমূল্যায়ন হয়েছে। কিন্তু টাকার দর স্থিতিশীল ছিল। ফলে টাকা এখন 'অতিমূল্যায়িত'। বাংলাদেশের পণ্য যারা আমদানি করে তারা এ অবস্থায় নিরুৎসাহ বোধ করবে, এটিই স্বাভাবিক। আমাদের রফতানিকারকদের তুলনায় তারা আমাদের প্রতিযোগীদের কাছ থেকে সুবিধাজনক সরবরাহ-দর পেয়ে যায়।

প্রবাসীদের মাধ্যমে যে অর্থ আসে, বৈধ চ্যানেলে তার গড় পরিমাণে সম্প্রতি ভাটার টান – এমন খবর নিয়মিত গণমাধ্যমে আসছে। অর্থমন্ত্রীও বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এর কারণ সঙ্গত – অফিসিয়াল ও কার্ব মার্কেটের রেটের পার্থক্যের কারণে প্রেরকরা বিকল্প সন্ধান করে এবং হুন্ডি-চক্র তার সুযোগ নেয়।

"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন নতুন জমানা – ডোনাল্ড ট্রাম্প" নিত্যদিনের সংবাদ শিরোনাম। তার নীতি রক্ষণশীল। যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাংকের সুদের হার বাড়ানো হবে, এমন আলোচনা চলছে। ফলে ডলার আরও তেজি হবে। এ কারণে, বাংলাদেশের রফতানি বাণিজ্য নতুন করে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে বলে ধারণা। আমরা বর্তমান ম্যানেজড ফ্লোটিং রেট ধরে রাখলে রফতানি আয় ও রেমিট্যান্স, উভয় ক্ষেত্রেই নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। তবে একই সঙ্গে প্রশ্ন উঠবে, ডলারের তুলনায় টাকার দাম কমানো হলে আমদানি

বাণিজ্যে কতটা নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। আমাদের রফতানির তুলনায় আমদানি বেশি এবং এ অবস্থায় পরিবর্তন ঘটার কথা নয়। আমাদের প্রধান রফতানি পণ্য হচ্ছে পোশাক। এ শিল্পের প্রয়োজনীয় বেশিরভাগ কাঁচামালও আমরা আমদানি করে থাকি। রফতানি আয় বাড়াতে গিয়ে আমদানি ব্যয়ও কিন্তু আমরা বাড়িয়ে ফেলব, যার প্রভাব শিল্প-বাণিজ্যে ও জনজীবনে পড়বে।

তবে আরেকটি বিষয়ের প্রতিও খেয়াল রাখা দরকার। বর্তমানে জ্বালানি তেলের দাম মোটামুটি সহনীয় পর্যায়ে। বিশ্ববাজারে মাঝে মধ্যে তেলের দাম কিছুটা বাড়ার প্রবণতা রয়েছে। তবে ডলারের তুলনায় টাকার মূল্যমান কিছুটা কমানো হলেও আমাদের দেশীয় অর্থনীতিতে তার প্রভাব খুব একটি পড়বে না। আমাদের এক সময়ে প্রচুর চাল আমদানি করতে হত। এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। দেশের চাহিদা মেটাতে সামান্য পরিমাণ চাল দেশে আমদানি হয়। ভোজ্যতেল, গম ও ডালের বাইরে অন্যান্য খাদ্যপণ্যের আমদানিও খুব বেশি নয়। তবে অনেক শিল্পের কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশের জন্য আমরা যেহেতু আমদানির ওপর নির্ভরশীল, সে কারণে শিল্প খাতে কিছু সমস্যা হতেই পারে।

এই সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় রেখেই আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বিশ্বের অন্যান্য মুদ্রার মূল্যমানের প্রতি রাখা চাই বিশেষ নজর। আমাদের পোশাকের একক বৃহত্তম বাজার যুক্তরাষ্ট্র।ট্রাম্প প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব শিল্পকে সংরক্ষণ সুবিধা দিতে সচেষ্ট রয়েছে। এ জন্য তারা আমদানি শুল্ক বাড়াবে। তবে বাংলাদেশের জন্য স্বস্তির খবর যে, যুক্তরাষ্ট্রে এখন পোশাক তৈরির শিল্প নেই।

সমকাল

২৬ *ফেব্রুয়ারি* ২০১৭

এত টাকা রাখি কোথায়?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

বাংলাদেশ ঝড়-বন্যার দেশ। বড় বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমরা সহ্য করেছি। ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪ সালের বন্যার রেফারেন্স এখনও দেওয়া হয়। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর কিংবা ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিলের ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাসের রেফারেন্সও আসে। ২০০৭ সালের নভেম্বরের সিডরের কথাও ভুলে যাওয়ার উপায় নেই। বড় ধরনের ঝড়-বন্যা হলে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ত্রাণ-পুনর্বাসনের ঘোষণা আসত। ঘোষণা অনুযায়ী সবকিছু মিলেছে কিনা সেটি হয়ত খতিয়ে দেখা হত না; তবে বিশ্ববাসী দুর্যোগের সময় আমাদের পাশে আছে, এটি ভরসা-সাহস যোগাত। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে আরেক চিত্র – বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণ-বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতির জোয়ার। এ ক্ষেত্রে রীতিমত প্রতিযোগিতা চলছে।

গত বছরের অক্টোবর মাসে, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বাংলাদেশ সফর করেন। সে সময় জানা গেল, বিশ্বের এক নম্বর অর্থনৈতিক শক্তি হতে চলা এ দেশটি থেকে ৩৮ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত ঋণ-বিনিয়োগ মিলতে পারে। ওই অক্টোবর মাসেই বাংলাদেশ সফর করে গেলেন বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট। পদ্মা সেতু প্রকল্পে এ সংস্থা ১২০ কোটি ডলার ঋণ দিতে চেয়েছিল। কিন্তু দুর্নীতি হতে পারে এ প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ের কিছু কাজে, এমন অভিযোগের প্রেক্ষাপটে সে ঋণ স্থগিত হয়ে যায়। কিন্তু বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টের সফরের পর দেখা যাচ্ছে, আর্থ-সামাজিক অনেক উন্নয়ন প্রকল্পে তাদের স্বল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের প্রতিশ্রুতি মিলছে। এর পরিমাণ ৫ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত হতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফর করেছেন ৭ থেকে ১০ এপ্রিল। এ সময়, ভারতের পক্ষ থেকে ৫০০ মিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তাসহ সাড়ে চার বিলিয়ন ডলারের ঋণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়। এর আগে, ভারত থেকে আরও তিন বিলিয়ন ডলার ঋণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল এবং তার ব্যবহার হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী দিল্লিতে ভারতীয় ও বাংলাদেশী উদ্যোক্তাদের সমাবেশে ১০ এপ্রিল ভাষণ দিয়েছেন। সেখানে বিদ্যুৎ ও জ্বালানিসহ বিভিন্ন প্রকল্পে ৯ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই করেছেন ভারতীয় ব্যবসায়ীরা।

আমাদের জানা আছে, জাপানের দিক থেকেও বাংলাদেশে ছয় বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাব এবং এ ক্ষেত্রে অগ্রগতি রয়েছে। বাংলাদেশ যে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা গড়ে তোলায় উদ্যোগী হয়েছে তার কয়েকটিতেও চীন, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপানসহ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। রাশিয়া থেকেও মিলছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণে বিপুল অর্থ প্রদানের সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি। বিশ্বব্যাংক সূত্র থেকে জানা যায়, বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা থেকে এ পর্যন্ত যে ঋণের প্রস্তাব পেয়েছে তার মধ্যে ৩৫ বিলিয়ন ডলার অব্যবহৃত রয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, নতুন বিনিয়োগ ও ঋণ প্রস্তাবের বাইরে পাইপলাইনে থেকে যাওয়া ৩৫ বিলিয়ন ডলার কাজে লাগানোর সুযোগও রয়েছে বাংলাদেশের।

ঋণ প্রদান ও বিনিয়োগের স্থান হিসেবে বিবেচনার এসব প্রস্তাব বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও শক্তিমত্তার পরিচায়ক। আমরা যে ইমার্জিং ইকোনমিক পাওয়ার হিসেবে গণ্য হচ্ছি, সেটি কেবল কথার পর্যায়ে নেই। এ থেকে ইঙ্গিত মেলে যে, আমাদের অর্জিত সক্ষমতা ও সম্ভাবনার খবর অন্য দেশগুলো জানতে পারছে এবং তারাও এ দেশকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের সারি থেকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করায় ভূমিকা নিতে আগ্রহী। তারা এটি বিবেচনায় নিচ্ছে যে, বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধির হার ধারাবাহিকভাবে উচ্চ থাকছে। মানুষের গড় আয় বাড়ছে। আমাদের দেশ কখনও বিদেশি ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হয়নি। বৈদেশিক অর্থ মজুদের ভাণ্ডার তেজি। শিক্ষার প্রসার ঘটছে। স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে সরকার সচেষ্ট রয়েছে। এসব তথ্য থেকে তাদের ধারণা তৈরি হচ্ছে – বিনিয়োগের জন্য আকর্ষণীয় স্থান হতে পারে বাংলাদেশ। এক দশক আগেও এমন সম্ভাবনাময় বাংলাদেশকে দেখতে পায়নি অনেক দেশ। আমাদের কিছু সনাতনী উন্নয়ন অংশীদার রয়েছে – যেমন জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মানি, বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক। তারা তাদের মত করে নির্দিষ্ট কিছু খাতে আমাদের সহায়তা দিয়েছে কিংবা বিনিয়োগ করেছে। তার ফলও ইতিবাচক। আমাদের যে অবকাঠামো

ভিত গড়ে উঠেছে, তার পেছনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অবদান উপেক্ষা করা চলে না। তারা বন্দর, সড়কপথ, বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণে অর্থ যোগান দিয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতেও মিলেছে সহায়তা। কিন্তু উদীয়মান অর্থনীতির সব চাহিদা এসব সনাতনী উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থা থেকে পূরণ হচ্ছিল না। এ প্রেক্ষাপটেই এগিয়ে এসেছে নতুন কিছু দেশ।

সাম্প্রতিক ঋণ-বিনিয়োগের যে ঢেউ তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য সনাতনী সূত্রের বাইরে দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা। ভারত-চীন-রাশিয়া থেকে প্রচুর সহায়তার প্রস্তাব মিলছে। এসব সূত্র এতদিন তেমন বিবেচনা করা হয়নি। এর কারণ হতে পারে, আমরা তাদের নবতর সক্ষমতা বিবেচনায় নেইনি, কিংবা তারাও বাংলাদেশকে তেমন নজরে আনেনি। আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় – আমরা বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা থেকে নির্দিষ্ট কিছু খাতে ঋণ নিয়েছি কিংবা বিনিয়োগের তাগিদ দিয়েছি। কিন্তু এখন নতুন নতুন ক্ষেত্র সামনে আসছে। যেমন – রেলওয়ে, নৌপথ, উপকূলীয় এলাকা। গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ নিয়ে একাধিক দেশের প্রস্তাব রয়েছে। বিশ্বব্যাংক কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশের যেসব খাত ঋণ বা বিনিয়োগের জন্য বিবেচিত হত, এখন তা থেকে ভিন্ন দিকে তাকাতে শুরু করেছি আমরা। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির একটি কারণ, পররাষ্ট্রনীতিতে লুক ইস্ট কৌশল গ্রহণ। আঞ্চলিক কানেকটিভিটি ক্রমশই বাস্তব হয়ে উঠছে এবং তা সুফল দেবে – এমন ধারণা ভিত্তি পাচ্ছে। বাণিজ্য সম্ভাবনাও বাড়ছে। ভারত ছিল আমাদের আমদানির প্রধান উৎস। এখন তার স্থান গ্রহণ করেছে চীন। দু'টি দেশে রফতানি আমদানির তুলনায় অনেক কম। এ ঘাটতি পূরণ করতে উভয় দেশের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে বাংলাদেশে – এ তাগিদ জোরদার হচ্ছে।

তবে সব সম্ভাবনা বাস্তবে রূপলাভ করবে, এমন নয়। ঋণের সনাতনী বলয় থেকে বাংলাদেশ বের হয়ে আসতে পারছে, এটি সুলক্ষণ। তবে এটিও মনে রাখতে হবে যে, নতুন উৎস বিশেষ করে ভারত ও চীন থেকে যে ঋণ মিলবে তার সুদের হার বেশি পড়বে এবং পরিশোধের মেয়াদ হবে তুলনামূলক কম। এসব ঋণের মধ্যে কনসেনশনাল অংশ সাধারণত থাকে না। অর্থাৎ ঋণ হবে এতদিনের বিভিন্ন সূত্রের ঋণের তুলনায় ব্যয়বহুল। সঙ্গত কারণেই এ ঋণ যেসব প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যবহার করা হবে, তার যথাযথ মনিটরিং গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মত প্রতিষ্ঠান থেকে যে ঋণ গ্রহণ করা হয় তার সুদের হার কম থাকে। তারা বিভিন্ন প্রকল্প বাছাইয়ের আগে নানা পর্যায়ে মনিটর করে। সুশাসন, মানবাধিকার এসব বিষয়ও তারা বিবেচনায় আনে। নতুন সূত্রের ঋণে বাস্তবায়ন করা বিভিন্ন প্রকল্পের ব্যয় যেন অনাবশ্যক না বাড়ে, তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখার জন্য ইতিমধ্যেই তাগিদ দিচ্ছেন অর্থনীতিবিদরা। এ বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনায়

রাখতে হবে। আমাদের সামনে নতুন সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং তা গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে, বিশেষভাবে নজর দিতে হবে প্রকল্পের ব্যয় যথাসম্ভব কমিয়ে রাখা এবং সময়মত কাজ সম্পন্ন করার প্রতি। প্রকল্প বাছাইয়ের বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। সংশ্লিষ্ট দেশগুলো ঋণের অর্থ তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তাগিদ দিতেই পারে। বড় অঙ্কের ঋণ বা বিনিয়োগের প্রস্তাব আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রাধিকারের সঙ্গে কতটি সামঞ্জস্যপূর্ণ, সে বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনায় রাখা চাই।

আমাদের পাইপলাইনে যে প্রায় ৩৫ বিলিয়ন ডলার ঋণ প্রস্তাব রয়েছে তা কাজে লাগাতে না পারার অন্যতম কারণ আমাদের আভ্যন্তরীণ সক্ষমতার অভাব। এ সক্ষমতা বাড়াতে হলে মানবসম্পদ ও অবকাঠামো উন্নয়ন, উভয় দিকেই বিশেষ নজর দিতে হবে।

নতুন ঋণ ও বিনিয়োগ প্রস্তাব বাস্তবায়ন হলে আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে – তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ অর্থ পরিশোধের সময় যত ঘনিয়ে আসবে, রিজার্ভের ওপর চাপ বাড়বে এবং সৃষ্টি হবে উদ্বেগ। আরও একটি বিষয় মনে রাখতে হবে। বিনিয়োগ থেকে যদি কাঙ্ক্ষিত হারে রিটার্ন না মেলে, তাহলে এক পর্যায়ে অর্থনীতির জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটি বোঝা হয়ে উঠতে পারে। বিভিন্ন দেশে এমনকি আমাদের এখানেও 'শ্বেতহস্তী' প্রকল্প বহুল আলোচিত। শ্রীলংকা ও পাকিস্তানের অনেক প্রকল্প – যা এক সময় খুব আকর্ষণীয় বলে মনে করা হত, তা নিয়ে তাদের যে উদ্বেগ সেটি যেন আমরা বিবেচনায় রাখি। আমাদের প্রতি বিশ্ববাসীর নজর বাড়ছে, সেটি উৎসাহের। আমরা তা কাজে লাগাতে পারলে উন্নত বিশ্বের সারিতে যাওয়ার স্বপ্ন আর অধরা থাকবে না।

সমকাল
১২ এপ্রিল ২০১৭

ভ্যাট আইন চালু হলে আয়কর আদায়ও বাড়ত

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

গতকাল ১ জুলাই থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর শুরু হয়েছে। এ বছরের বাজেট সংসদে পাস হয়েছে ২৯ জুন, যা পেশ করা হয় ১ জুন। আগের বছরে দেশে অর্থনীতির সূচকগুলো মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। তবে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে ছিল ওঠানামা। উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতির মন্দাভাবের কারণে রফতানি বাজারে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায়নি। প্রবাসীদের অর্থ প্রেরণ কম হয়। এর পরও আগের বছরগুলোর মতই উচ্চ হারে জিডিপি বজায় রাখা সম্ভব হয়। এটিও লক্ষণীয়, সামষ্টিক অর্থনীতিও বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়নি। তবে ব্যাংকিং খাতে সমস্যা ছিল। সরকার নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকগুলোতে মূলধন ঘাটতির প্রবণতা চলছেই। কু-ঋণ বেড়ে যায়। বেসরকারি ব্যাংকে উদ্যোক্তা-পরিচালকদের স্বার্থে আইন সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে। কৃষি খাতে ধানের টানা বাম্পার ফলনের কারণে খাদ্যশস্যের বাজারে যে স্বস্তিদায়ক চিত্র ছিল, সেটি হঠাৎ পাল্টে যায় হাওড়ে অকাল বন্যায় ফসলহানির কারণে। চালের বাজারে আকস্মিক ঊর্ধ্বগতি মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির শঙ্কা সৃষ্টি করেছে।

এমন প্রেক্ষাপটেই অর্থমন্ত্রী ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট সংসদে পেশ করেছিলেন। ৪ লাখ ২৬৬ কোটি টাকার এ বাজেট বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) থেকে বাজেটের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় বলা হয়, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় এ ধরনের বড় আকারের বাজেটের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তবে যেভাবে আয়-ব্যয় কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে, তাতে অসঙ্গতি রয়েছে। এবারের বাজেটের একটি ইতিবাচক দিক ছিল আর্থিক খাতে সংস্কারের বলিষ্ঠ উদ্যোগ গ্রহণ। ২০১২ সালের মূল্য সংযোজন কর – ভ্যাট আইন চালুর উদ্যোগের ঘোষণা এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। আধুনিক এ কর কাঠামো চালু হলে আয়কর খাতে আদায় বাড়ার কথা।

নতুন অর্থবছরে ভ্যাট খাত থেকে আয় বেড়ে দাঁড়ানোর কথা ছিল ৯১ হাজার কোটি টাকায়। ভ্যাট ও আয়কর মিলিয়ে ৬৪ হাজার কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব আদায় হবে – এমন প্রস্তাব তুলে ধরা হয়েছিল। সিপিডি আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কর ব্যবস্থাকে স্বাগত জানালেও এ পরিমাণ বাড়তি কর আদায় সম্ভব কি না, সে প্রশ্ন তুলেছিল। বাজেটের ঘাটতি পূরণে অর্থমন্ত্রী বৈদেশিক সূত্র থেকে ৭ বিলিয়ন ডলার পাওয়ার কথা বলেছিলেন, স্বাভাবিক সময়ে যা থাকে ৩.৫ বিলিয়ন ডলারের আশপাশে। এ লক্ষ্য পূরণ সহজ নয়। আমি মনে করি, এমনকি নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন হলেও বাজেট বাস্তবায়নের জন্য অর্থ সংগ্রহ সহজ হত না।

রাজস্ব খাতের আয় এবং বৈদেশিক ঋণ-অনুদান থেকেই উন্নয়ন বাজেটের অর্থ যোগান হয়। এবারে উন্নয়ন বাজেটের আকার ১ লাখ ৬০ হাজার ডলারের কাছাকাছি। সরকার অবকাঠামো খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করে চলেছে এবং তার যৌক্তিকতা রয়েছে। তবে বাংলাদেশে বড় আকারের উন্নয়ন ব্যয় সময়মত শেষ হয় না; এমন নজির অনেক। এ কারণে প্রকল্প শেষ করতে বাড়তি ব্যয় হয়, যা সামাজিক উন্নয়ন খাতে অর্থ যোগানে বিঘ্ন ঘটায়। অবকাঠামো খাতে উন্নয়ন ব্যয় যৌক্তিক। কিন্তু অবকাঠামো তৈরি হল, বিনিয়োগ বাড়ল; অথচ শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাঙ্ক্ষিত দক্ষ শ্রমশক্তি মিলল না – এটি কাম্য নয়।

অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে আরও একটি বিষয় সামনে এসেছে – বছর বছর উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি ঘটছে, কিন্তু কর্মসংস্থানে সমস্যা প্রকট হচ্ছে। চলতি বছরের বাজেটেও জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার ধরা হয়েছে ৭.৪ শতাংশ। কিন্তু চ্যালেঞ্জ – কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিশেষ করে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর। অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বাড়ায় সরকারি খাতে কিছু বাড়তি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হলে বেসরকারি খাতে প্রবৃদ্ধি কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কেন পৌঁছায় না, এ নিয়ে আলোচনা জরুরি।

সরকার বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে আর্থিক খাতের মাধ্যমে প্রণোদনা দিচ্ছে। যেমন, সংরক্ষণ সুবিধা মিলছে তথ্যপ্রযুক্তি, সোলার প্যানেল, মোটরসাইকেল সংযোজন, চামড়া ও প্লাস্টিক দ্রব্য উৎপাদনে। এ ধরনের সংরক্ষণ সুবিধা চালু থাকার পরও কাঙ্ক্ষিত বিনিয়োগ হচ্ছে না কেন? আমি মনে করি, সংরক্ষণ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য থাকা উচিত এবং এর নিয়মিত পর্যালোচনা হতে হবে। এ সুবিধা নতুন নতুন পণ্যের জন্য ছড়িয়ে দেওয়ার প্রতিও নজর রাখতে হবে।

গত ৫-৬ বছরে আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। তবে শিল্প-কারখানায় বিদ্যুৎ পৌঁছানোর সমস্যা এখনও রয়ে গিয়েছে। গ্যাসের চাহিদা পূরণে

এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের অগ্রগতি শ্লথ। ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক জোন স্থাপনের ভাল পরিকল্পনা বাস্তবায়নেও তেমন অগ্রগতি নেই। ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়ক চার লেন হয়েছে। কিন্তু অনেক জেলায় সড়কপথ এখনও দুর্বল। নৌ-রেলপথেও বড় ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের দাবি রয়েছে। এসব না হলে বাজেটে আর্থিক প্রণোদনা থেকে প্রত্যাশিত ফল মিলবে না।

নতুন বছরের বাজেটে বেসরকারি খাতে বাড়তি ৬৬ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে বলে ধারণা ব্যক্ত হয়েছিল। বৈশ্বিক অর্থনীতিতে শ্লথ গতির কারণে আমাদের রফতানি বাজারে কিছুটা সমস্যা হতে পারে। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থও কম হতে পারে। এর সঙ্গে যদি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সমস্যা যুক্ত করি, তাহলে নিট ফল দাঁড়ায় অর্থনীতিতে ভোগের চাহিদা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় না হওয়া, যা আভ্যন্তরীণ বাজারকে সংকুচিত করে রাখে। এর পরিণতিতে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হতে পারে।

১ জুলাই থেকে নতুন বাজেট চালু হয়েছে। কিন্তু ভ্যাট আইন দুই বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। কেন এ পিছু হটা? সরকারের কি ভ্যাট আইন চালুর জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিতে ঘাটতি ছিল? এ আইন কার্যকর হলে উদ্যোক্তা ও খুচরা ব্যবসায়ীদের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হবে, সেটি আলোচনায় ছিল। কিন্তু ভোক্তা পর্যায়ের প্রতিক্রিয়া নিয়ে তেমন ভাবা হয়নি। চালের দাম বাড়ার কারণে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। নতুন ভ্যাট আইন চালু এবং রমজান মাসের কারণেও বাজারে প্রভাব পড়েছে। ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ; এটিকে অনেকে উচ্চ মনে করেছেন। অর্থমন্ত্রী করমুক্ত অর্থে কিছুটা ছাড় দিয়ে ভোক্তাদের সুবিধা বাড়াতে পারতেন। ন্যূনতম করের হার ১০ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশে নামিয়ে এনেও সাধারণ ভোক্তাদের সুবিধা দেওয়া যেত। ভ্যাটের হার ১৫ থেকে ১২ শতাংশ নামিয়ে আনার প্রস্তাবও বিবেচনা করা যেত। কিন্তু এখন কিছু বিষয় হয়ে পড়ল এলোমেলো।

ভ্যাট আইন চালু হলে আয়কর আদায়েও তার প্রভাব পড়ত। কিন্তু ভ্যাট বলবৎ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি দেখা গেল না। ভারতে পণ্য ও সেবা কর বা জিএসটি বলবৎ হয়েছে এ বছরের ১ জুলাই থেকে। এ জন্য রাজনৈতিক ঐক্যমতের চেষ্টা চলেছে। ব্যবসায়ীসহ সমাজের সব অংশের সমঝোতার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তারপরও বন্ধ ডাকা হয়েছে কোথাও কোথাও। আমরা নতুন আইন চালু করতে চেয়েছি, কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইসিআর মেশিনের যোগান নেই। অনলাইন নিবন্ধন কতটি হয়েছে, স্পষ্ট নয়। মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থায় যেসব দুর্বলতা, তা কাটানো যায়নি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বলছে, শুরু তো হোক — ঘাটতি ক্রমে পুষিয়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু ভোক্তা ও খুচরা পর্যায়ে সচেতনতা বাড়ানো না হলে ভ্যাট আদায়ে যে বিশৃঙ্খলা হতে পারে,

সেটি কি ভাবা হয়েছে? এনবিআর বলছে, তারা ২ লাখ লোককে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। অথচ ব্যবসায়ীদের সংগঠন থেকে দাবি করা হচ্ছে — কোন প্রশিক্ষণই হয়নি।

এখন ভ্যাট আদায় দুই বছর পিছিয়ে গেল। এ সময়টি কীভাবে কাজে লাগানো হবে, সেটি নিয়ে এখন থেকেই ভাবা দরকার। সরকারের আয়-ব্যয়ে কী প্রভাব পড়বে, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভ্যাট আদায়ের নতুন পদ্ধতি চালু হলে আয়কর আদায়েও ইতিবাচক প্রভাব পড়ত। এখন কী হবে? তবে কেউ কেউ মনে করছেন, বিদ্যমান ভ্যাট আইন প্রয়োগ করেও বাজেটে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য পূরণ সম্ভব। কী হয়, সে জন্য অপেক্ষা করতেই হবে। কিন্তু শঙ্কা হয়, ঘাটতি পূরণে আভ্যন্তরীণ উৎসের ওপর নির্ভরতা বাড়বে। ফলে পরের বছর সুদ খাতে আরও বেশি অর্থ গুনতে হবে। সরকার বাজেটের আকার ৪ লাখ ২৬৬ কোটি টাকাই রেখে দিয়েছে। এটি কমিয়ে এখনই ৩ লাখ ৭৫ হাজার কোটি টাকার মত করা যেত। এর ফলে আয়-ব্যয় নিয়ে উৎকণ্ঠা কম হত, বাস্তবায়নকারীরা বছরজুড়েই সচেষ্ট থাকতেন লক্ষ্য পূরণে। এ পথে না চলায় বছরের মাঝামাঝি গিয়ে বাজেটে বড় ধরনের কাটছাঁট প্রয়োজন হতে পারে। এর অর্থ, ব্যয়ের ক্ষেত্রে বছর শেষে তাড়াহুড়ো করা।

আরও একটি বাস্তবতা মনে রাখতে হবে। ২০১৮ সালকে নির্বাচনের বছর হিসেবে ধরা হচ্ছে। এ সময়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্থিরতা বাড়তে পারে। সঙ্গত কারণেই বেসরকারি খাতে বিনিয়োগে দেখা দিতে পারে স্থবিরতা কিংবা গতি হতে পারে শ্লথ। খাদ্যশস্যের বাজারে অস্থিরতাও অস্বাভাবিক নয়। এর সঙ্গে যদি রফতানি আয় ও প্রবাসীদের অর্থ প্রেরণে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় প্রবৃদ্ধি না ঘটে তাহলে নতুন অর্থবছরের উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা পূরণ কঠিন বৈকি।

সমকাল

২ জুলাই ২০১৭

অর্থনীতিতে ক্যান্সার

ফাহমিদা খাতুন

ব্যাংকিং খাত বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম ভিত। এখানে পুঁজিবাজার, বন্ড ও ইক্যুইটি মার্কেট – আর্থিক খাতের এসব অংশ তেমন শক্তিশালী নয়। সঙ্গত কারণেই ব্যাংকিং খাতের ওপর অর্থনীতির নির্ভরতা অনেক। যথার্থভাবেই বলা হয়, এ খাত বাংলাদেশের অর্থনীতির লাইফলাইন।

নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ব্যক্তি খাতের প্রাধান্য শুরু হয়েছে। এ সময়ে কাঠামোগত সংস্কারও শুরু হয়। ব্যাংকিং খাতেও প্রভাব পড়ে। বিভিন্ন কমিশন-কমিটির সুপারিশে ব্যাংকিং খাতের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করা হয় এবং এর ভিত্তিতে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হতে থাকে। এ ধরনের সংস্কারের জন্য বিদেশি দাতাদেরও চাপ ছিল।

আমাদের অর্থনীতির আকার বড় হচ্ছে। জাতীয় বাজেট, মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপিতে ব্যাংকিং খাতের ভূমিকা বাড়ছে। এখন ৫৭টি তফসিলি ও বিশেষায়িত ব্যাংক কাজ করছে এবং এগুলোর বেশিরভাগ বেসরকারি মালিকানাধীন, যাদের হাতে রয়েছে মোট আমানতের প্রায় ৭০ শতাংশ। কিন্তু সার্বিক বিচারে বলা যায়, ব্যাংকিং খাতের স্বাস্থ্য ভাল নয়। নন-পারফর্মিং লোন বা কু-ঋণের পরিমাণ অনেক। সরকার নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকগুলোতে এ সমস্যা বেশি। বৃহস্পতিবার সমকালে "শীর্ষ খেলাপির বেশিরভাগই সরকারি ব্যাংকের : অনিয়ম-দুর্নীতি ও রাজনৈতিক প্রভাব প্রধান কারণ" শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। অর্থমন্ত্রী সম্প্রতি জাতীয় সংসদে ঋণখেলাপি একশ' প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির যে তালিকা প্রকাশ করেছেন, তার বিশ্লেষণ থেকেই মিলেছে এ তথ্য। এসব

ব্যাংকে দক্ষ মানবসম্পদের ঘাটতি রয়েছে। জবাবদিহিতার ক্ষেত্রেও রয়েছে সমস্যা। কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি-নজরদারি বাড়ানোর বিষয়টিও আলোচিত। ব্যাংকের বোর্ডে নিয়োগ দেওয়া হয় প্রধানত রাজনৈতিক বিবেচনায় — এমন অভিযোগ রয়েছে। আমরা জানি, দেশে রাজনৈতিক সংযোগ রয়েছে এমন ব্যক্তিদের মধ্যেও অনেক দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তি রয়েছেন। কিন্তু সরকার নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকগুলোর পরিচালনা পর্ষদে যাদের নিয়োগ দেওয়া হয়, তাদের অনেকে এ মানদণ্ড পূরণ করেন না, অথচ ব্যাংকের অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তারা হস্তক্ষেপ করেন বলে অভিযোগ। বড় অঙ্কের ঋণ মঞ্জুরে তাদের ভূমিকা দৃশ্যমান। এ ধরনের ঋণে নীতিমালা মানা হয় না। প্রকল্পের উপযোগিতা, গ্রহীতার ঋণ সঠিকভাবে কাজে লাগানো, ঋণ ফেরত দানের রেকর্ড — এসব তাদের কাছে তেমন গুরুত্ব পায় না। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অন্যান্য শীর্ষ পদে মনোনয়নেও তাদের পছন্দ-অপছন্দ থাকে।

ব্যাংকের অর্থ নিয়ে যারা ফেরত দেন না তারা প্রভাবশালী। সমাজে প্রভাবশালী আরও অনেকের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ থাকে। এর সঙ্গে ব্যাংকের বোর্ড ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্তদের সংযোগ ঘটলে ঋণ আদায় কার্যক্রম বিঘ্নিত হওয়া স্বাভাবিক।

ব্যাংকিং খাতের তদারকি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংক। ব্যাংকিং খাতের তদারকিতে তাদের ভূমিকা রয়েছে এবং গত কয়েক বছরে এ ক্ষেত্রে তাদের সক্রিয়তা বেড়েছে। কিন্তু ওপর মহলের প্রভাব বিস্তারের কারণে তারা যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে না — এমন অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে আমরা ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার উদাহরণ টানতে পারি। লিকার ব্যারন হিসেবে পরিচিত বিজয় মালিয়া ভারতে ব্যবসায়ী মহলে পরিচিত নাম। তার খেলাপি ঋণ ছিল ৯ হাজার কোটি রুপি। তিনি লন্ডনে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু, গত এপ্রিল মাসে তাকে ভারতের অনুরোধে গ্রেফতার করা হয়েছে। সাহারা গ্রুপের প্রধান সুব্রত রায়। ভারতীয় ক্রিকেট দলের স্পন্সর ছিল এ গ্রুপ। কিন্তু বিনিয়োগকারীদের ২৪ হাজার কোটি রুপি আত্মসাতের অভিযোগে দুই বছর যাবৎ তিনি জেলে রয়েছেন। ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক এ ক্ষমতা প্রদর্শন করছে এবং সেখানকার সরকার তা মেনে নিয়েছে। কিন্তু আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এখনও সেটি পারছে না। এখন পর্যন্ত বড় কোন ঋণখেলাপির গুরুতর শাস্তি হয়েছে — তেমন উদাহরণ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কিছু ক্ষেত্রে মামলা হয়, কিন্তু সময় গড়িয়ে গেলেও নিষ্পত্তি হয় না, অর্থ উদ্ধার হয় না। প্রভাবশালী মহলের সঙ্গে ব্যাংকের ঋণখেলাপিদের যোগাযোগের কারণেই এটি ঘটছে। আমাদের কু-ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি পেতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের এসব বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে।

অর্থমন্ত্রী সংসদে খেলাপি প্রতিষ্ঠানের তালিকা দিয়েছেন। ঋণখেলাপিদের নিয়ে সমাজে যে উদ্বেগ, তার প্রেক্ষাপটে এটি ভাল পদক্ষেপ। কোন কোন প্রতিষ্ঠান ব্যাংকের কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের অর্থ নিয়ে ফেরত দিচ্ছে না, তার তালিকা প্রকাশ করে অর্থমন্ত্রী একটি ভাল কাজ করেছেন এবং এ জন্য তিনি ধন্যবাদ পাবেন। তালিকাটি সংসদে উত্থাপনের সময় তিনি ছিলেন না। অর্থ প্রতিমন্ত্রীও ছিলেন না। এ কারণে খাদ্যমন্ত্রী তা সংসদে পেশ করেন। বাংলাদেশে ঋণখেলাপি ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে গণমাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এ কারণে খেলাপি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জনমনে একটি সাধারণ ধারণা রয়েছে। তবে তালিকায় হলমার্ক গ্রুপ এবং আরও দুয়েকটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া আলোচিত অন্যদের নাম অনুপস্থিত। তাদের নাম কি এতদিন ভুল করে আলোচনায় আনা হয়েছে? তারা কি বকেয়া ঋণ ফেরত দিয়েছেন? কিংবা তারা ঋণ পুনঃতফসিল করিয়ে নিয়েছেন? এসব প্রশ্ন স্বাভাবিক। তালিকায় প্রকাশিত কোম্পানিগুলোর পরিচালনা পর্ষদে কারা রয়েছেন, কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে কত টাকা পাওনা, কতদিন ধরে পাওনা, ঋণ প্রথম কবে নেওয়া হয়েছে এবং তার কত অংশ এ পর্যন্ত ফেরত দেওয়া হয়েছে – এসব তথ্য নেই অর্থমন্ত্রীর তালিকায়।

আমরা জানি, বড় অঙ্কের ঋণখেলাপিদের ঋণ পুনর্গঠন করেছিল ব্যাংকগুলো। উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছিল, অর্থনীতির বৃহত্তর স্বার্থ এবং বকেয়া ঋণ আদায়ের সুবিধার্থে এ পদক্ষেপ। কিন্তু বাস্তবে কোন অগ্রগতি নেই। ২০১৫ সালের প্রথমদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণ দেখিয়ে ১১টি শিল্প গ্রুপের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ হাজার কোটি টাকার ঋণ পুনর্গঠন করা হয়। যাদের ঋণ ৫০০ কোটি টাকার বেশি তারাই এ সুবিধার আওতায় আসে। কিন্তু, কিস্তি পরিশোধের সময় এলে তাদের অনেকে পুনর্গঠন করা ঋণে আরও ছাড় চাইছেন। কেউ কেউ কোন অর্থই পরিশোধ করেননি। কেউ কেউ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। অর্থমন্ত্রী এদের ক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ নেবেন, সেটি দেশবাসীর জানার অধিকার রয়েছে। সরকার নিয়ন্ত্রিত কয়েকটি ব্যাংকের অর্থ সংকট কাটাতে জাতীয় বাজেট থেকে বর্তমান অর্থবছরে দুই হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করা হলে বিভিন্ন মহল থেকে সমালোচনার ঝড় ওঠে। আগেও এ ধরনের ভর্তুকি বাজেট থেকে দেওয়া হয়েছে। ব্যাংক ঋণ আদায়ে কার্যকর পদক্ষেপ না নিয়ে কেন তার দায় জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে – এ প্রশ্ন সঙ্গত।

এখন সময় এসেছে নতুন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের। আমরা চাই, একটি স্থায়ী ব্যাংকিং কমিশন, যাদের তদারকিতে গোটা ব্যাংকিং খাতের কার্যক্রম থাকবে। বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং দেশি-বিদেশি সব ব্যাংক তাদের সুপারিশ যেন গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ

করে, সে ক্ষমতা তাদের থাকতে হবে। অর্থমন্ত্রী নিজে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের পক্ষে — সেটি বিভিন্ন সময়ে বলেছেনও। এখন প্রয়োজন বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ।

বাংলাদেশে ব্যাংকের আমানত ৯ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। এর প্রায় ৭০ শতাংশ এখন বেসরকারি ব্যাংকগুলোতে গচ্ছিত। এসব ব্যাংকের পরিচালনা পদ্ধতি নিয়েও বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ ওঠে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এ ব্যাংকটি ভালভাবে চলছিল। এক ব্যক্তি বিপুল পরিমাণ শেয়ারের মালিক হয়ে গিয়েছেন — এ ধরনের কথা শোনা যাচ্ছে। এটি কি আমরা পরিবর্তন বলব? যিনি বড় অংশের শেয়ারহোল্ডার, আবার তিনিই বড় অঙ্কের ঋণগ্রহীতা — ব্যাংকে এমন ঘটনা ঘটলে সেটিকে ভালভাবে গ্রহণ করা হয় না। অর্থনীতির জন্যও তার ফল শুভ হয় না। ব্যাংকিং আইনের একটি পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়েও প্রশ্ন আছে। এত দিন বিধান ছিল, এক পরিবারে সর্বোচ্চ দু'জন সদস্য পরিচালনা পর্ষদে থাকতে পারবেন। কিন্তু এর পরিবর্তন করে চারজন রাখার প্রস্তাব করা হচ্ছে, যারা পরপর তিন টার্মে ৯ বছর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। আমরা জানি, বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর অর্থের সিংহভাগের যোগান আসে আমানতকারীদের কাছ থেকে। ছোট-বড় অঙ্কের অর্থ তারা জমা রাখেন। উদ্যোক্তাদের অর্থের তুলনায় আমানতকারীদের জমা অর্থ অনেক অনেক বেশি। এ অবস্থায় ব্যাংকগুলোকে কেন পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে দেওয়া? এখন চলছে কর্পোরেট যুগ। কিন্তু সরকার কেন ব্যাংকিং খাতকে সাবেকী যুগে ফেরত নিতে সহায়তা করবে? আমাদের বেসরকারি ব্যাংকেও সুশাসনের অভাব রয়েছে বলে অভিযোগ। ব্যাংক পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলে এ সমস্যা আরও প্রকট হবে।

ব্যাংকিং খাত এখন অশেষ সম্ভাবনাময়। তারা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণ বাড়াচ্ছে, কৃষি খাতে ঋণ বাড়াচ্ছে। বড় বড় অর্থনৈতিক উদ্যোগে তারা অর্থ যোগাতে সক্ষম। ব্যাংকগুলোতে সর্বসাধারণের অংশগ্রহণ বাড়ছে। আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় এ খাতের অবদান দৃশ্যমান। ব্যাংকগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এ ভূমিকা আরও বাড়বে। সংশ্লিষ্ট সবাই নিশ্চয় এই দিকটির প্রতি মনোযোগ বাড়াবেন।

সমকাল
১৪ জুলাই ২০১৭

দুর্নীতি দূর করাই সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)-এর অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ করে জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট করেন। তিনি 'বাংলাদেশ ইকোনমিক অ্যাসোসিয়েশন'-এর আজীবন সদস্য। তাঁর গবেষণা ও লেখালেখির মূল বিষয় ট্রেড পলিসি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি, কারখানার পরিবেশ, ইত্যাদি। নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উত্তরণের পর নতুন চ্যালেঞ্জ, ভবিষ্যৎ অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কালের কণ্ঠের সঙ্গে তাঁর কথা হয়। একান্ত আলাপচারিতায় তিনি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি অবকাঠামো উন্নয়ন ও দুর্নীতি প্রতিরোধে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন শারমিনুর নাহার।

কালের কণ্ঠ: বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই সাফল্যের ক্ষেত্রে কোন নিয়ামকগুলো ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করেন।

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: বাংলাদেশ কিছুদিন থেকেই একই মাত্রার একটি অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে আছে। প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের ভেতরেই ওঠানামা করছে। তুলনামূলকভাবে অন্যান্য দেশের সূচকের যেখানে নানা মাত্রায় উত্থান-পতন হয়েছে সেখানে আমাদের প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের মধ্যে ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে। এ থেকে হয়ত মনে হতে পারে, আমরা ৬ শতাংশের বৃত্ত থেকে বের হতে পারিনি, আবার অন্যদিকে বলা যায় এটি ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে। ২০১১ থেকে ২০১৪ সাল সময়কালে, উচ্চ প্রবৃদ্ধির দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল গড়পড়তা ৪২তম। এর ফলে অর্থনীতিতে একচেটিয়া সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে। তবে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্য আয়ের দেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে

কিছু বিশেষ বিশেষ সূচকের ভূমিকা রয়েছে। মূলত মাথাপিছু আয়, মুদ্রা বিনিময় হার ও মূল্যস্ফীতি – এই তিনটি সূচকের কিছু উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কারণে এটি সম্ভব হয়েছে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং অন্যদিকে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হার ক্রমাবনতিও ভূমিকা রেখেছে।

তবে মনে রাখা দরকার, এই অর্জন কোন সরকারের একক কৃতিত্ব নয়। এটি ধারাবাহিকভাবে দশক জুড়েই হয়েছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বেসরকারি খাতের ভূমিকা। সাধারণ মানুষের বেসরকারি খাতে অংশগ্রহণের কারণে সামষ্টিক অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে। কৃষি, শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, কুটির শিল্পসহ নানা ধরনের সেবা খাতের এ ভূমিকা রয়েছে। কৃষির উৎপাদন বেড়েছে, শিল্পের রফতানি আয় নিশ্চিত হয়েছে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। যদিও এখনও সেই প্রক্রিয়ার মানে যে সামগ্রিক উন্নতি দরকার, তা সম্ভব হয়নি। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় ওঠানামা করছে। রেমিট্যান্সের প্রবাহ বেড়েছে। যদিও সামগ্রিকভাবে সরকারের বেসরকারি খাতের যে সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন, তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

কালের কণ্ঠ: বিগত তিন বছর ধরে প্রবৃদ্ধির মাত্রা স্থিতিশীল রয়েছে। যদি এ অবস্থান ধরে রাখা না যায় অথবা যদি নেমে যায়, তাহলে কি আমরাও নেমে যাব?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: হ্যাঁ, যাব। তবে এটি ঠিক যে প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক হতে হবে। অর্থাৎ গড়পড়তা বিশ্বব্যাপী সূচক যেখানে গিয়ে একত্রিত হয় আমরা যদি সেখানকার চেয়ে নিচে নেমে যাই, তাহলে বর্তমান র‍্যাঙ্ক থেকে নেমে যাব। তবে আগামী বছর আমরা ৭ শতাংশ টার্গেট করেছি। ২০২০ সাল নাগাদ ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নির্ধারণ করছি। এটি থাকলে নেমে যাওয়ার আশঙ্কা নেই। বরং সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা।

কালের কণ্ঠ: মাথাপিছু আয় বাড়ালে অনেক ক্ষেত্রে আয় বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বাড়ে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এগোতে হলে কোন কোন প্রতিবন্ধকতাকে পার হতে হবে।

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: হতদরিদ্র দেশ থেকে যখন আমরা দারিদ্র্যমুক্ত দেশের কাতারে ঢুকছি, তখন মনে রাখা দরকার যে দেশের ভেতরে এখনো সাড়ে ২৩ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে। আমাদের মাথাপিছু দৈনিক আয় তিন ডলার। সুতরাং বড় কোন অর্জন আমরা করতে পারিনি। আরও ভেঙে বললে, এ মুহূর্তে দেশের

প্রায় চার কোটি লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে। অন্যভাবে বললে, এতসংখক মানুষ এখনো কর্মহীন। তাদের কর্ম নিশ্চিত করা যায়নি বা যাচ্ছে না। এটি ঠিক যে বৈষম্য রয়েছে। তবে বৈষম্যের মধ্যকার গ্যাপ কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। আমরা এখন অর্থনীতির যে কাতারে ঢুকেছি সেটি নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশগুলোর একেবারে শুরুর দিকে। এই ক্যাটাগরিতে আরও ৫০টি দেশ রয়েছে। সেখানে ভারতও রয়েছে। ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা এসব দেশও রয়েছে।

কালের কণ্ঠ: এসব দেশ তো কিছুটা সামনে, আমাদের এ মুহূর্তের চ্যালেঞ্জগুলো কী?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: আমরা আয়বৈষম্য কমিয়ে সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে চলতে পারব কি না তা আসলে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। এখনই সেই লক্ষ্যে কাজ করার মত কাঠামো বা পরিস্থিতি কোনটাই আমাদের নেই। দেশীয় অর্থনীতিতে এখনো বড় বড় অনেক জায়গায় কাজ করতে হবে। দারিদ্র্য নিরসন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেকারত্ব দূর করা। এগুলোই এখন বড় ফোকাস। সরকার এই জায়গাগুলোকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। এ অবস্থার মধ্যেই এখনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। আর আয়-বৈষম্যের বা শ্রেণীর সমস্যা আমাদের একার নয়। সব দেশেই আছে। ভারত আয়-বৈষম্য কমানোর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করছে। যা দরিদ্র মানুষগুলোর মানবিক চাহিদা পূরণ করতে পারে। ন্যূনতম স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা দিতে পারে। সে চেষ্টা আমাদের এখানেও আছে। সরকার সোশ্যাল সেফটিনেসের প্রকল্প দীর্ঘদিন থেকেই পরিচালনা করে আসছে। তার প্রত্যক্ষ কিছু ফলও পাওয়া গিয়েছে। এখন প্রয়োজন সোশ্যাল সেফটিনেসকে সোশ্যাল সিকিউরিটিতে রূপান্তর করা। সামাজিক বেষ্টনীকে সামাজিক নিরাপত্তার মানদণ্ডে বিবেচনায় আনা।

কালের কণ্ঠ: এটি গেল শুধু একটি প্রসঙ্গ।

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: যতই বলছি যে আমরা ওপরের দিকে যেতে চাই, সেটি অবশ্যই প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর কারণেই সম্ভব হবে। তবে প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর জন্য ব্যাপক বিনিয়োগ প্রয়োজন। বিনিয়োগ বাড়ার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে বেসরকারি খাত। সে জন্য সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, দারিদ্র্যের হার কমাতে যেটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। সরকার নতুন যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিচ্ছে সেখানে এ বিষয়গুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছে। সেই সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের নিজস্ব কিছু টার্গেটও আছে। এগুলো ছাড়াও উৎপাদনশীল খাতের (প্রডাক্টিভ রিসোর্স) সৃষ্টিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

শুধু কৃষি নয়, শিল্প খাতেও উৎপাদন বাড়াতে হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতে যে বিনিয়োগ করা হচ্ছে সেটি বাড়াতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা হল, সেটি এখন পরিমাপ করতে হবে। অর্থাৎ যে পরিমাণ ব্যয় করা হচ্ছে সেই পরিমাণ ফেরত আসছে কি না। আমরা শিক্ষা খাতে যে খরচ করছি তার গুণগত মান বাড়ছে কি না। এখন পর্যন্ত সরকারের বেশি ব্যয় হচ্ছে ব্রডার স্কেলে; সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে। সরকারের কমিটমেন্ট অবশ্য সেখানেই থাকে যে সে এক সংখ্যক মানুষের স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষাসেবা নিশ্চিত করতে পারল। কিন্তু কতখানি ব্যয় হল এবং কী পরিমাণ ফেরত এল, সরকারের এখন তা পরিমাপ করার সময় এসেছে। আমি যে স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছি তা গুণগতভাবে ভাল কি না; যে শিক্ষাসেবা দিচ্ছি তা বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে কি না; যে শ্রমিক কারখানায় কাজ করছে, তার কাজের পরিবেশটা যথাযথ কি না; তার কাজের মান ভাল কি না, ইত্যাদি। অর্থনীতির ভাষায় আমরা বলি, আনুভূমিক থেকে এখন উল্লম্বভাবে, হরাইজেন্টাল থেকে ভার্টিক্যালি দেখতে হবে। গুণগত মানের দিকে নজর দিতে হবে।

কালের কণ্ঠ: দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শ্রীলঙ্কা অর্থনৈতিকভাবে শক্ত অবস্থানে গিয়েছে। তাদের কোন দিকগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: ভাল বলেছেন, শ্রীলঙ্কা আমাদের জন্য ভাল উদাহরণ হতে পারে। শুরুতে শ্রীলঙ্কার প্রবৃদ্ধির কারণটি বলি। প্রথমত, তার শিক্ষিত জনগোষ্ঠী। ফলে এই জনসংখ্যাকে সে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করতে পেরেছে। সেখানে সাধারণভাবে সবার ইংরেজির মান ও কম্পিউটারের দক্ষতা রয়েছে। দেখা যাবে, দেশের বাইরে যারা কাজ করছে, তারাও অনেক উচ্চ অবস্থানে। আবার আমাদের মত সস্তা গার্মেন্ট পণ্য সে তৈরি করে না। এটি গুণগতভাবে পৃথক। দ্বিতীয়ত, শ্রীলঙ্কার গুরুত্বপূর্ণ খাত হল পর্যটন খাত। তারা নিজেদের যা আছে তাকেই ঢেলে সাজিয়েছে। ট্যুরিস্টবান্ধব পরিবেশ বলতে যা বোঝানো হয়। বিপরীতভাবে, আমরা এখনো এখানে দৃষ্টি দিতে পারিনি। তৃতীয়ত, তার কিছু কৃষিপণ্য আছে। যেমন – চা, মসলা, ইত্যাদি তারা রফতানি করে। একটি দু'টি দেশ নয়, সারা বিশ্বেই তাদের মসলার সুনাম প্রাচীনকাল থেকেই। মূল কৃষিপণ্য না হলেও এই পণ্যগুলো তাদের রফতানি খাতকে সমৃদ্ধ করেছে। চতুর্থত, শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ভারতের যে দ্বিপক্ষীয় মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি আছে সেটিও তাদের প্রবৃদ্ধির জন্য সহায়ক। হয়ত আমাদের দেশের বিদেশি সহায়তা এসেছে বা আসছে; কিন্তু তুলনামূলকভাবে তাদের বেশি। কারণ, যদি জনসংখ্যা অনুপাতে হিসাব করি তাদের বেশি হবে।

কালের কণ্ঠ: শ্রীলঙ্কায়ও একসময় রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল। তার মধ্যেই তারা কীভাবে এগোল?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: এটি ঠিক যে তাদের ওখানেও পুরো এক দশকের বেশি সময়জুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল। সেই অস্থিরতার মধ্যেই তারা এগোনোর চেষ্টা করেছে। আর রাজনৈতিক অস্থিরতা যখন পুরোমাত্রায় স্থিতিশীল হয়েছে তখন আট থেকে ১০ বছরের মধ্যে একটি বুম ঘটে গিয়েছে। একটি মজার বিষয়, শ্রীলঙ্কার জ্বালানি কিন্তু আমদানিনির্ভর। এ ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এগিয়ে। কিন্তু এই আমদানিনির্ভর জ্বালানিকেই সে আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করেছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা কেটে যাওয়ার পর যে এলাকাগুলোতে আগে যাওয়া যেত না, এখন সেখানে নতুন করে পুনর্বাসন হচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা বাড়ছে। তারা সমুদ্র সম্পদকে ব্যবহার করতে পেরেছে। আর সবচেয়ে বড় বিষয় বিনিয়োগকারীদের নিশ্চয়তা ও সুবিধা দিতে পেরেছে, যা আমরা এখনো পারিনি।

কালের কণ্ঠ: নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের অর্থনীতির সূচকে বৈদেশিক রেমিট্যান্স সহায়তা করেছে – এটি কী আরও বাড়ানো যেতে পারে না?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: আমরা সিপিডি থেকে সব সময় একটি উদাহরণ দিই যে, আমাদের সমপরিমাণ লোক ফিলিপাইনে, যারা বাইরে কাজ করে। কিন্তু আমাদের রেমিট্যান্সের তুলনায় তাদের রেমিট্যান্সের পরিমাণ দ্বিগুণ। কীভাবে? প্রধান কারণ ফিলিপাইনের যারা বাইরে কাজ করে তারা কেউ হোটেল বয় নয়, ক্লিনার নয়। তারা ম্যানেজমেন্টে কাজ করে, নানা ধরনের সেবা খাতে কাজ করে। এখন বাংলাদেশের একজন শ্রমিক যখন বাইরে যাচ্ছে, তার যে চ্যানেল সেও কিন্তু হোটেলেই কাজ করে। সুতরাং অবধারিতভাবে সেও সেখানে বা তেমন প্রতিষ্ঠানে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। আর ফিলিপাইনের চ্যানেলই আলাদা, উচ্চপর্যায়। ফলে অফিসার লেভেলের কাজ পাচ্ছে একজন নতুন লোক। এদিকগুলো সরকারকে ভাবতে হবে। সরকারের কৌশল পরিবর্তন করতে হবে। সেবা খাতে বা অন্যান্য দক্ষ কাজের ব্যাপারে আমাদের সুনাম রয়েছে, আমাদের দক্ষতা রয়েছে এই দৃষ্টিভঙ্গিটা আনতে হবে। সেই চ্যানেলগুলোকে সামনে আসতে হবে। সরকারের জনশক্তি রফতানির নীতিমালা, কর্মপদ্ধতি, কৌশল সবগুলোর মানোন্নয়ন জরুরি। শুধু সংখ্যা দিয়ে বিবেচনা নয়, গুণ ও মানের দিক ভাবতে হবে। মনিটরিং সিস্টেম উন্নত করতে হবে। উপযুক্ত লোককে উপযুক্ত কাজে বসাতে হবে। যাচাই-বাছাই ছাড়া কাউকে গুরুদায়িত্ব দিলেই তো হবে না।

কালের কণ্ঠ: মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার যে চ্যালেঞ্জগুলো বললেন, সেগুলোর জন্য সরকারের যথাযথ প্রস্তুতি ও মনোভাব দেখতে পাচ্ছেন কি?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: সরকারের তো সব সময় একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকে। সে অনুযায়ী তাকে পরিচালিত হতে হয়। কিন্তু এখন আসলে সরকারের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ, যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তার বাস্তবায়নের জন্য যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে – তাতে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে কি না। এ ক্ষেত্রে, সরকারের যথাযথ মনিটরিং জরুরি। আর সবচেয়ে বড় বিষয় দুর্নীতি দূর করতে হবে।

দুর্নীতি দূর করতে না পারলে আমরা কোন লক্ষ্যেই পৌঁছাতে পারব না। এখানে একটি উদাহরণ দিই, পদ্মা সেতুর ব্যয় বাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া চলমান আরও দু-একটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে এমন করা হয়েছে। আমি বলছি না যে, আমার টাকা নেই বলে বিশ্বব্যাংক থেকে নেব। কিন্তু যদি আমরা বাইরের অর্থ নিতাম, তাহলে সেখানে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা থাকত। তাদের একটি কমিটমেন্ট থাকত। কাজ ভাল হত। এখন এর ব্যয় কত হবে শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা বলতে পারছি না। সুতরাং, অবকাঠামোগত উন্নয়ন অবশ্যই জরুরি। কিন্তু সেই সঙ্গে দুর্নীতি, সরকারি কাজের দীর্ঘসূত্রতা অবশ্যই পরিহার করতে হবে। দুর্নীতি দূর করে কাজে স্বচ্ছতা আনাও এখন সরকারের চ্যালেঞ্জের একটি অংশ।

কালের কণ্ঠ: আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: কালের কণ্ঠকেও ধন্যবাদ।

কালের কণ্ঠ
১৩ জুলাই ২০১৫

ব্যবসায়ীদের মতামত মূল্যায়ন করতে হবে

মোস্তাফিজুর রহমান

কালের কণ্ঠ: মোটাদাগে আপনার দৃষ্টিতে গত বছর বাংলাদেশের অর্থনীতি কেমন গেল?

মোস্তাফিজুর রহমান: এ দেশের রাজনৈতিক গতিধারার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে অর্থনীতিতে। গত বছরের শুরুতে ছিল টানা অবরোধ, বিক্ষিপ্ত হরতাল। এতে অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বিনিয়োগে উৎসাহ ছিল না বেসরকারি খাতের। সুদের হার কমানোর পরও বিনিয়োগের চেয়ে সঞ্চয়পত্রে আগ্রহী ছিল অনেকে। অর্থপাচার কমাতে যথাযথ কৌশল গ্রহণে ব্যর্থ হয় সরকার। ব্যাংকের রিজার্ভ আগের ধারা থেকে সরে আসেনি। ব্যাংকের আভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ড বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ব্যাংকঋণ গ্রহণে উদ্যোক্তাদের তেমন দৌড়ঝাঁপ চোখে পড়েনি। রাজস্ব আদায়ে এনবিআর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জিডিপির লক্ষ্যমাত্রা ৭ শতাংশ নির্ধারণ করা হলেও সাময়িক হিসেবে ৬.৫১ অর্জিত হয়। তবে সব কিছু ছাপিয়ে গত বছর বাংলাদেশের বড় অর্জন ছিল নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশে প্রবেশ। সারা বছরের অর্থনৈতিক স্থবিরতা শেষ সময়ে কিছুটি কাটিয়ে ওঠে। বছরের শেষ ভাগে, সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা ফিরে আসতে থাকে। তবে গত বছর বড় ধরনের সরকারি বিনিয়োগ হয়। কিন্তু বিগত দিনের ধারাবাহিকতায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের গতি ছিল শ্লথ।

কালের কণ্ঠ: আন্তর্জাতিক অর্থনীতির গতিধারা গত বছর এ দেশের অর্থনীতির ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলেছে?

মোস্তাফিজুর রহমান: আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক গতিধারা বাংলাদেশের ওপর কিছুটা প্রভাব ফেললেও খুব বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারেনি। বিশেষভাবে, খাদ্য সংকট

তৈরি না হওয়ায় এ দেশের অর্থনীতি অনেকটা ভারমুক্ত ছিল। মূল্যস্ফীতি মোটাদাগে নিয়ন্ত্রণে ছিল। তবে শিল্পের কিছু খাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দর কমলেও তার সুবিধা পাননি এ দেশের বিনিয়োগকারীরা। অথচ দেশের বাজারে জ্বালানি তেলের দর কমানোর সুযোগ ছিল। সে পথে যায়নি সরকার।

কালের কণ্ঠ: ২০১৫ সালে সরকারের মূল চ্যালেঞ্জ ছিল বিনিয়োগ বাড়ানো; অথচ বিনিয়োগে বেসরকারি খাতের আশানুরূপ অংশগ্রহণ ছিল না। এর মূল কারণ কী বলে আপনি মনে করেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: ২০১৫ সালে সরকারের মূল চ্যালেঞ্জ ছিল বিনিয়োগে ত্বরণ সৃষ্টি করা। বিনিয়োগ না বাড়ার প্রধান বাধা উদ্যোক্তাদের আস্থার সংকট। গত বছরের আগের দুই বছরের প্রায় সারাটা সময়ে ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা। গত বছরের শুরুতেও এ সংকট ছিল। টানা অবরোধ, বিক্ষিপ্ত হরতালে ব্যবসা-বাণিজ্যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। তবে বছরের মাঝামাঝিতে প্রকাশ্যে অস্থিরতা না থাকলেও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আবারও রাজনৈতিক বৈরীতা বৃদ্ধি পাবে – এমন আশঙ্কা ছিল। দু'জন বিদেশি হত্যার কারণে বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য-বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিদেশিদের মধ্যে একটা সংশয় দেখা যায়। তবে বেসরকারি খাতের ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোকে বিনিয়োগে সাধারণ উদ্যোক্তাদের আস্থা ফেরাতে সরকার পাশে রাখতে সক্ষম হয়। স্থানীয় পর্যায়ে বিনিয়োগের ধারা বড় ধরণের ধাক্কা খেলেও কিছুটা সামলে নিতে সক্ষম হয়।

কালের কণ্ঠ: বিনিয়োগে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ পিছিয়ে দিতে রাজনৈতিক অস্থিরতার পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য আর কোন বিষয়গুলো প্রভাব ফেলে?

মোস্তাফিজুর রহমান: উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে বিমুখ করতে রাজনৈতিক অস্থিরতা বড় কারণ হলেও একমাত্র কারণ নয়। গত বছর ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগে যে গতি সৃষ্টি করার প্রয়োজন ছিল তা সরকার পারেনি। ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগে অনিশ্চয়তা কাটিয়ে ওঠেনি। বেসরকারি খাতে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের চাহিদা সৃষ্টি হয়নি। কাঁচামালের আমদানিপ্রবণতা ছিল না। মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি ২০১৫ সালের জুলাই-অক্টোবরে তার আগের বছরের তুলনায় ১৭ শতাংশ কমে। জ্বালানি সংকটে অনেক উদ্যোক্তা আগে স্থাপিত কারখানা সচল করতে পারেননি। অনেক এলাকায় বিদ্যুৎ পৌঁছালেও সক্ষমতার অভাবে কারখানার বিদ্যুৎ সংযোগ সম্ভব হয়নি। চাহিদামত গ্যাস পাননি অনেক বিনিয়োগকারী। অবকাঠামোগত দুর্বলতাও গত বছর কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। অবকাঠামো উন্নয়নের অনেক পরিকল্পনার কথা শোনা গেলেও বা অনেক ক্ষেত্রে কাজ শুরু

হলেও তা শেষ হয়নি। জমির দর গত বছরও কমেনি। বিনিয়োগের সবচেয়ে বড় পুঁজি চলে যায় এখানে। কারখানা নির্মাণে সুবিধামত জমি সরবরাহে সরকার এখনও কার্যকর উদ্যোগ নিতে পারেনি। অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও গত বছরও তা বাস্তবায়িত হয়নি। যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন গত বছরও আশানুরূপ হয়নি। বিশেষভাবে, ঢাকা-চট্টগ্রামের যোগাযোগব্যবস্থা গত বছরও উদ্যোক্তাদের ভোগান্তির কারণ ছিল। বিরাজমান এসব সমস্যা ২০১৫ সালে কাটেনি। সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় ও গতিশীলতা আনয়নের কথা বলা হলেও তা সফল হয়নি। এভাবে গত বছরও উদ্যোক্তারা পুরনো সমস্যার আবর্তে ঘুরপাক খেয়েছেন। ব্যাংকের আভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ড বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তবে বাংলাদেশের মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল ছিল। এটি ছিল স্বস্তির কারণ।

কালের কণ্ঠ: বিনিয়োগে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ না বাড়লেও উল্লেখযোগ্য সরকারি বিনিয়োগ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে শিল্প-কারখানা নির্মাণে বড় মাপের বিদেশি বিনিয়োগ দেখা না যাওয়ার কারণ কী?

মোস্তাফিজুর রহমান: এ দেশের সরকারি খাতের বিরাজমান দূর্বল অবস্থা সবার জানা। গত বছরও সরকারি খাত একই ধারায় চলেছে। সরকারি খাতের বড় অংশই ভর্তূকির ওপর নির্ভর করে চলছে কর দাতার টাকার ওপর ভর করে। সরকারের নিয়ন্ত্রিত শিল্প-কারখানায় বিনিয়োগ লাভজনক হবে এটি আশা করার কোনো কারণ নেই। এখানে বড় ধরণের সংস্কার প্রয়োজন। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা অনেক যাচাই-বাছাই করে তবেই বিনিয়োগে আসেন। শিল্প খাত টিকে আছে বেসরকারি বিনিয়োগের ওপর। বাংলাদেশের মত একটি দেশে বেসরকারি স্থানীয় উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে আগ্রহী না হলে বিদেশি বিনিয়োগ আসবে না। সরকার অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ করছেন এটি ইতিবাচক। কিন্তু এ বিনিয়োগের স্বার্থকতা অনেকখানি নির্ভর করবে ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগকে আকর্ষণ করার সক্ষমতার ওপর।

কালের কণ্ঠ: গত বছর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সবচেয়ে বড় অর্জন কী?

মোস্তাফিজুর রহমান: ২০১৫ সালে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সবচেয়ে বড় অর্জন বাংলাদেশের নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশে প্রবেশ। আন্তর্জাতিক বাজারে বিশ্ব ব্যাংকের সফট উইনডো (আইডিএ) থেকে স্বল্প সুদে ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সংকোচন হবে, আবার ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ক্রেডিট রেটিং-এ সুবিধা হবে। বড় বড় অবকাঠামোতে সরকারি বিনিয়োগ হয়েছে। বিশেষভাবে, গত বছর পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ যথেষ্ট দ্রুত এগিয়েছে, যা এ

দেশের অর্থনীতির জন্য বড় ধরনের সুখবর। এতে আঞ্চলিক বৈষম্য কমবে বলে আশা করা যায়।

কালের কণ্ঠ: বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, দেশ থেকে অর্থপাচার বাড়ছে। অর্থপাচার বন্ধে গত বছর বিভিন্ন উদ্যোগের কথা জানা যায়। এসব কতটা কার্যকর হয়েছে?

মোস্তাফিজুর রহমান: গত বছর বিদেশি একটি সংস্থার প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বাংলাদেশ থেকে বড় অঙ্কের অর্থপাচার হচ্ছে। ট্রেড মিস ইনভয়েসিং-এর মাধ্যমেই বেশি হচ্ছে বলে বলা হয়েছে। গত বছর অর্থপাচার রোধে বাংলাদেশ ব্যাংক, এনবিআর, দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে বারবার তাগাদা দেওয়া হলেও অর্থপাচারকারীরা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। সরকারের প্রস্তুতি দেখে ধরে নেওয়া হয়েছিল, কিছু অর্থপাচারকারীকে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে; কিন্তু তা হয়নি। গত বছরের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পাচারকৃত অর্থ সব যে অবৈধভাবে আয় হয়েছে তা নয়, বরং বৈধভাবে আয় করা অর্থও পাচার হচ্ছে। কেবল অবৈধভাবে যে অর্থ পাঠানো হচ্ছে তা নয়, বরং আইনের মধ্যে থেকেও সুকৌশলে অর্থপাচার হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ট্রেড মিস প্রাইজিং, আন্ডার ইনভয়েসিং, ওভার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে বৈধভাবে আয়ের একটা অংশ বাইরে যে চলে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

কালের কণ্ঠ: গত বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকার কতটা সফল? পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ কতখানি?

মোস্তাফিজুর রহমান: সরকারি বিনিয়োগ বেড়েছে যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি কাজের গতিতে পুরনো দিনের শ্লথগতির বাস্তবায়নের ধারা থেকে গত বছরও বেরিয়ে আসতে পারেনি। এতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ব্যয় বাড়ছে। সময় নষ্ট হচ্ছে। এগুলো থেকে রিটার্ন কমে যাবে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আরও জোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। গত বছর এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যথেষ্ট উদ্যোগ ছিল না।

কালের কণ্ঠ: আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সক্ষমতা অর্জনে গত বছর বাংলাদেশ যেসব চুক্তি করেছে বা চুক্তি করতে আলোচনায় বসছে সেসব কার্যকর হলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কী প্রভাব পড়বে?

মোস্তাফিজুর রহমান: ২০১৫ সালে বাংলাদেশ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বেশ কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল যানবাহন ও পণ্য চলাচল চুক্তি। বিবিআইএন, মোটর ভেহিকেল এগ্রিমেন্ট, বিসিআইএম অর্থনৈতিক করিডর ও দ্বিপাক্ষিক ফ্রি ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট (এফটিএ) বিষয়ে আলোচনা চলছে। এসব চুক্তির ফলে বাংলাদেশের বাইরে পণ্য রফতানির নতুন সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে, সরকারকে নিজের দেশের স্বার্থ রক্ষায় শক্ত অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। আলোচনায় উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে।

কালের কণ্ঠ: জাতীয় বাজেটের প্রায় ৬০ শতাংশ অর্থায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এনবিআরের ওপর। এ বিষয়ে গত বছর এনবিআর কতখানি সফলতা অর্জন করতে পেরেছে? গত বছর উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল পে স্কেল। এর কি চাপ পড়বে রাজস্ব খাতের ওপর? আপনার মতে, এ বিষয়ে সরকার কি যথেষ্ট প্রস্তুত?

মোস্তাফিজুর রহমান: রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে, গত বছর যে লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে কাজ করা হয়েছে তা পুরোপুরি অর্জন হয়নি। বাধ্য হয়ে পরবর্তীতে, মাঝামাঝি সময়ে এসে লক্ষ্যমাত্রা সংশোধন করতে হয়েছে। এর মূল কারণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে উচ্চাভিলাষী প্রাক্কলন। এনবিআরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যেসব পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন ছিল সেখানেও দূর্বলতা রয়ে গিয়েছে। কর ফাঁকির বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়নি। তাই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন দুরূহ হয়ে পড়েছে। এনবিআরের আরও সক্ষমতা বাড়াতে হবে। কর্মকর্তাদের দক্ষতা বাড়াতে হবে। কর আদায়ের ক্ষেত্রে পেপার ট্রেইল নিশ্চিত করতে হবে। আমদানি-রফতানির সঠিক হিসাব আনতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও এনবিআরের কার্যক্রমের মধ্যে অটোমেশনের মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করতে হবে। এতে করদাতাদের সঠিক তথ্য জানা যাবে। শুধু এনবিআরের আদায় বাড়াতে মনোযোগী হলেই হবে না। একই সঙ্গে এনবিআরবহির্ভূত আদায়েও সরকারকে মনোযোগী হতে হবে। পে স্কেল বাস্তবায়নে রাজস্ব খাতের ওপর আরও চাপ পড়বে। এই চাপ সামলাতে না পারলে সরকারকে আরও দিশাহারা অবস্থায় পড়তে হবে। পে স্কেল বাস্তবায়নে গত বছরই রাজস্ব খাতে আরও মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন ছিল সরকারের।

কালের কণ্ঠ: ২০১৬ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে স্বস্তি আনতে কোন বিষয়ে নজর দেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিনিয়োগে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বাড়ানো ও ব্যাংকিং খাতের কর্মকাণ্ডে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হবে ২০১৬ সালে সরকারের

জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। গত বছর বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত ছিল আলোচিত ইস্যু। ব্যবসায়ীদের দাবিতে সুদের হার কিছু কমালেও এখনো তা উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। এ খাতে দুর্নীতি ও অব্যবস্থা হ্রাস করা সম্ভব হয়নি। সুদের হার কমাতে ও দুর্নীতি দূর করতে কার্যকর ও আইনী পদক্ষেপ নিতে হবে। বিনিয়োগ বৃদ্ধির ওপর সরকারকে সবচেয়ে জোর দিতে হবে। বেসরকারি খাতের সঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে। নীতিসহায়তা এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে সবার একসাথে কাজ করতে হবে। সরকারকেই এখানে মূখ্য ও উদ্যোগী ভূমিকা রাখতে হবে। উৎপাদনশীলতা বাড়াতে নজর দিতে হবে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সক্ষমতা, সুশাসন ও সাশ্রয়ীভাবে বাস্তবায়নে নজর দিতে হবে। মানবসম্পদ উন্নয়নে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে, ভোকেশনাল স্ট্রীমকে শক্তিশালী করতে হবে। প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ ও মানসম্মত শিক্ষার সংশ্লেষ ও সম্মিলন নিশ্চিত করতে হবে।

কালের কণ্ঠ: কালের কণ্ঠকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

মোস্তাফিজুর রহমান: আপনাকেও ধন্যবাদ।

কালের কণ্ঠ
৪ জানুয়ারি ২০১৬

চীনের প্রকল্প অর্থায়নঃ বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতে ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভাবনা

মোস্তাফিজুর রহমান

সংবাদঃ চীনের সঙ্গে চুক্তিগুলো বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশের কতটুকু লাভ হবে বা এর অর্থনৈতিক প্রভাব কী হবে?

মোস্তাফিজুর রহমানঃ চীনের সঙ্গে স্বাক্ষরিত বিনিয়োগ চুক্তিগুলো বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তার ফল ইতিবাচক হবে এটি আশা করা যায়। এসব প্রকল্পের মধ্যে জ্বালানি, সড়ক উন্নয়ন, সেতু নির্মাণ, ইত্যাদি উন্নয়ন প্রকল্প রয়েছে। তাই এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশের বিদ্যমান অবকাঠামোগত দূর্বলতা কাটিয়ে উঠার ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এসব ক্ষেত্রে সক্ষমতা আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সরাসরি জড়িত। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য আরও সহজ হবে। কস্ট অফ ডুয়িং বিজনেস কমে আসবে। তবে প্রকল্প বাস্তবায়নে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কারণ প্রকল্পগুলো ভালভাবে বাস্তবায়ন না হলে আমাদের প্রত্যাশিত রিটার্ন আসবে না। সব কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এবং সাশ্রয়ীভাবে করতে হবে। সুশাসন নিশ্চিত করে প্রকল্পের কাজ চালাতে হবে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে যাতে ব্যয় মাঝপথে না বাড়ে, বিলম্ব যাতে না হয় সে দিকে নজর রাখতে হবে।

সংবাদঃ চীনের সঙ্গে প্রায় ২৫টিরও বেশি প্রকল্পের মাধ্যমে ২ হাজার কোটি ডলারের ওপরে বিনিয়োগ চুক্তি হওয়ার কথা রয়েছে, এত বড় বিনিয়োগ নেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কতটুকু সক্ষম বলে আপনি মনে করছেন?

মোস্তাফিজুর রহমানঃ দেখুন, আমরা ইতিমধ্যেই বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছি। এখনও করছি। সুতরাং আমাদের ক্যাপাসিটি রয়েছে। তবে সেই ক্যাপাসিটিতে কিছু ঘাটতিও রয়েছে। এই দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে হবে। যারা প্রকল্প বাস্তবায়নে দক্ষ, যারা এসব বিষয় নিয়ে কাজ করেছে, চীনের সঙ্গে যে প্রকল্পগুলোর চুক্তি হবে সেগুলোতে তাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ ছাড়া চুক্তির বিষয়গুলোও ভালভাবে বুঝে নিতে হবে।

সংবাদঃ চুক্তির ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে কিংবা কোন বিষয়ে নজর রাখতে হবে বলে মনে করছেন?

মোস্তাফিজুর রহমানঃ প্রকল্প থেকে রিটার্ন নির্ভর করছে কী শর্তে আমরা সাহায্য পাচ্ছি তার ওপর। এ ক্ষেত্রে যে চুক্তিগুলো হবে সেগুলোর ক্ষেত্রে দেখতে হবে আমাদের কস্ট-বেনিফিট-রেশিও কী, ব্যক্তিখাতকে সেসব বিনিয়োগ কতটুকু সহায়তা করবে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তা কী ভূমিকা রাখবে। আমাদের সুবিধা ও লাভ কীভাবে হবে তা নিশ্চিত করতে হবে, উইন-উইন সমাধান খুঁজতে হবে। এজন্য প্রয়োজন স্মার্ট নেগোসিয়েশন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে আলোচনার মাধ্যমে আগেই নির্ধারণ করে নিতে হবে।

সংবাদঃ স্মার্ট নেগোসিয়েশন বলতে কি বুঝাচ্ছেন?

মোস্তাফিজুর রহমানঃ স্মার্ট নেগোসিয়েশন বলতে প্রকল্প বাছাই, অগ্রাধিকার নির্ধারণ, প্রকল্পে অর্থায়নের শর্ত, বাস্তবায়নের রূপরেখা, সোর্সিং ও প্রকিউরম্যান্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সুবিধাটুকু আদায় করে নেওয়াকেই বুঝিয়েছি। আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা রয়েছে। তাই চুক্তি করার সময় দেখতে হবে প্রকল্পগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হচ্ছে কিনা। সুদের হার কী হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে, যতটা সম্ভব স্বল্প সুদে ও সুবিধাজনক শর্তে ঋণ গ্রহণ করতে সচেষ্ট হতে হবে। রিটার্নের সময় কতটুকু হচ্ছে। যতটা পারা যায় বেশি সময় রাখতে হবে। গ্রেস পিরিয়ড কতটুকু হবে, যতটুকু পারা যায় বাড়িয়ে রাখতে হবে। প্রকিউরমেন্টের পদ্ধতি কী হয়, তার শর্তগুলো আমাদের পক্ষে কতটুকু হয়েছে। আমাদের দেশ থেকে যেসব জিনিস কেনা যায় তা আমাদের এখান থেকে নিতে হবে। তাদের দেশ থেকে কিনতে হলে তা যেন সহজ শর্তে হয়। প্রযুক্তির হস্তান্তর যাতে হয়।

সংবাদঃ অভিযোগ রয়েছে চীনের কোন প্রকল্পই নির্ধারিত সময়ে শেষ হয় না। তারপরও চীনের সঙ্গেই এতগুলো প্রকল্প চুক্তি করা কতটুকু যৌক্তিক?

মোস্তাফিজুর রহমানঃ শুধু চীনের প্রকল্প বাস্তবায়নেই বিলম্বিত হয় এমনটি নয়। আইএমইডি-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে মোট প্রকল্পের ৫০ শতাংশই বিলম্বিত হয় – বাস্তবায়নের সময় বৃদ্ধি পায় এক-তৃতীয়াংশ। বিশেষ করে, যেসব প্রকল্পে বিদেশিদের অর্থ সংশ্লিষ্টতা থাকে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে কিছু শর্ত থাকে, সেগুলো মানা হয় না। তখন বিবাদ ও মতান্তর হয়, কালক্ষেপণ হয়। ফলে প্রকল্প বিলম্বিত হয়। জমি একোয়ার করা যায় না, অর্থ ছাড় হয় না, টেন্ডার নিয়ে সমস্যা হয়, বিভিন্ন কারণ রয়েছে। সুতরাং, এসব বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে, খেয়াল রাখতে হবে প্রকল্প ডকুমেন্টে যেসব শর্ত ও বিষয় থাকবে তা যাতে দ্ব্যর্থবোধক না হয়, ডিসপিউট রেজুলেশন এর বিষয়ে যাতে স্পষ্টতা থাকে।

সংবাদঃ প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় আমাদের কোন পদ্ধতি অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত বলে মনে করছেন?

মোস্তাফিজুর রহমানঃ রেজাল্ট-বেইজড ম্যানেজমেন্টর কথা অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়েছে। বর্তমানে বিজ্ঞান-সম্মত বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা আছে, তাদের মতামতকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে।

সংবাদ
১৪ অক্টোবর ২০১৬

এবারের বাজেট বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টিতে সরকারের জন্য একটি টেস্ট কেস

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

সিপিডির (সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ) অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ করে জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট করেন। তিনি 'বাংলাদেশ ইকোনমিক অ্যাসোসিয়েশন'-এর আজীবন সদস্য। তাঁর গবেষণা ও লেখালেখির মূল বিষয় ট্রেড পলিসি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি, কারখানার শ্রম ও কর্ম পরিবেশ ইত্যাদি। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ঘোষিত বাজেট মূল্যায়ন নিয়ে তিনি কথা বলেন কালের কণ্ঠের সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন শারমিনুর নাহার।

কালের কণ্ঠ: ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ঘোষিত বাজেট নিয়ে সিপিডির মূল্যায়ন কী?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট ঘোষিত হয়েছে একটি স্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে, যা সরকারের জন্য স্বস্তিদায়ক। ঘোষিত বাজেটে বর্তমান রাজস্ব ব্যয়ের ধারা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, নতুন সামাজিক ব্যয়ের প্রস্তাবনা, ইত্যাদি রয়েছে। উন্নয়ন বাজেটে যোগাযোগ খাতের পাশাপাশি শিক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, কৃষি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে অপেক্ষাকৃত কম ব্যয় ঘোষণা রয়েছে। বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আলাদা বাজেট ঘোষণা উল্লেখযোগ্য দিক। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে বাজেট কাঠামো পরিবর্তনের ঘোষণা ইতিবাচক।

একই সঙ্গে, বাজেট ঘোষিত হয়েছে বেশ কিছু অস্বস্তির মধ্যেও, যা আগামী দিনের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে। অর্থনীতির আকার বড় হওয়ার পাশাপাশি যে পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়া দরকার, সে অনুযায়ী কর্মসংস্থান বাড়ছে না। ফলে জাতীয় আয়ে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে; কিন্তু সেই প্রবৃদ্ধি কর্মসংস্থানকে যথাযথভাবে উৎসাহিত করছে না। সাম্প্রতিককালের প্রবৃদ্ধির উৎস মূলত সেবা খাতকেন্দ্রিক, যেখানে তুলনামূলকভাবে কম বিনিয়োগ ও কম কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়; হয়ত এ কারণে কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগে আশানুরূপ প্রবৃদ্ধি চোখে পড়ছে না।

বেসরকারি খাতে বিনিয়োগে শ্লথ প্রবৃদ্ধি আরেকটি দুশ্চিন্তার কারণ। শ্রমবহুল ও মূলধনবহুল ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে বিনিয়োগ বাড়লে প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ত। এ বছরের বাজেটে বেসরকারি বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়গুলো রফতানিমুখী ও দেশীয় বাজারমুখী এ দুই ধরনের শিল্পের জন্য আলাদাভাবে বিবেচনা করা যায়। অর্থমন্ত্রী স্বীকার করেছেন বৈশ্বিক দুর্বল চাহিদা বাংলাদেশের রফতানিতে আগামী অর্থবছরে প্রভাব ফেলতে পারে। এর প্রতিক্রিয়া রফতানিমুখী শিল্পের বিনিয়োগেও পড়বে। আভ্যন্তরীণ বাজারমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন হতে পারে। এ বছরের বাজেটে শুল্ক কাঠামো পরিবর্তন করে আভ্যন্তরীণ বাজারমুখী মধ্যবর্তী পণ্য ও কাঁচামাল উৎপাদকদের কথা বিবেচনা করে ১৫ শতাংশের আলাদা শুল্কস্তর ঘোষিত হয়েছে। সম্পূরক শুল্ক কাঠামোতে পরিবর্তন দেশীয় শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষণ সুবিধা বা কম মূল্যে কাঁচামাল প্রাপ্তির সুবিধা দেবে। এর ফলে, আভ্যন্তরীণ বাজারমুখী শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। এসএমই খাতে করবহির্ভূত লেনদেনের সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। তবে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর ঘাটতি এ বছরও অব্যাহত থাকবে। এটি ঠিক যে, বড় বিনিয়োগকারীরা উৎসাহিত না হলেও আগামী বছর বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ অবকাঠামো প্রস্তুতির বছর হিসেবে চিহ্নিত হবে। সরকার বেশ কিছু মেগা প্রকল্প নিয়েছে, যার কয়েকটি এখন চলমান। প্রকল্পগুলো শেষ হলে অবশ্যই বিনিয়োগকারীরা উৎসাহিত হবে। সে হিসেবে আগামী অর্থবছরকে বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণে সরকারের প্রচেষ্টার একটি 'টেস্ট বছর' বিবেচনা করা যেতে পারে।

বাজেটের আয়-ব্যয় ভারসাম্যের দুর্বলতা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মত ২০১৬-১৭ অর্থবছরেও দেখা যাচ্ছে। প্রতিবছর ঘোষিত বাজেট ও অর্থবছর শেষে বাস্তবায়িত বাজেটে পার্থক্যের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়ছে। বাজেটের আকার ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারকে আরও দক্ষ হতে হবে। প্রত্যাশা ও বাস্তবতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে। সিপিডির বিশ্লেষণে দেখানো হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ, যেমন ভারতের বাজেট বাস্তবায়নের সক্ষমতা বাংলাদেশের তুলনায় বেশি।

কালের কণ্ঠ: এবার বাজেটের সার্বিক ইতিবাচক দিকগুলো কী?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: অর্থমন্ত্রী ভবিষ্যতে বাজেট কাঠামোতে কিছু পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন, যা ইতিবাচক মনে হয়েছে। ভবিষ্যতে বাজেটের আয়-ব্যয় কাঠামোর পরিবর্তন করে বর্তমানের উন্নয়ন বাজেট ও রাজস্ব বাজেট আলাদাভাবে না রেখে শুধু আয় ও ব্যয় – এমন দুই ভাগে ভাগ করার কথা অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। উন্নয়ন-অনুন্নয়ন বাজেটের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ধীরে ধীরে বেড়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে প্রচলিত বাজেট কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা কমে আসছে।

দ্বিতীয়ত, অর্থমন্ত্রী ভবিষ্যতে ফলাফলভিত্তিক বাজেট কাঠামো বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়েছেন। সিপিডি থেকে এ ব্যাপারে বাজেট প্রস্তাবনাকালে বলা হয়েছিল। বর্তমান বাজেট কাঠামোয় কেবল অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অর্থ ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ করা হয়। ফলাফলভিত্তিক বাজেট কাঠামোতে প্রকল্পের মূল প্রস্তাবনায় যেসব লক্ষ্য অর্জনের ঘোষণা রয়েছে তা অর্জিত হল কি না, যে আভ্যন্তরীণ প্রাপ্তির হার ঘোষিত হয়েছিল তা কতটুকু পাওয়া গেল ও প্রকল্প ব্যয়ের ক্ষেত্রে বর্ণিত মাত্রা বজায় রাখা হয়েছে কি না ইত্যাদি বিষয় প্রকল্পটি শেষ হওয়ার পর যাচাই-বাছাই করা হবে। তৃতীয়ত, এবার বাজেটে সরকার দীর্ঘ মেয়াদে সামাজিক খাতে বড় কিছু উদ্যোগ নেওয়ার প্রচেষ্টা নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সামাজিক সুরক্ষা খাতের আকারের বিস্তৃতি দেখতে পাচ্ছি। অর্থমন্ত্রী বেসরকারি খাতে পেনশন স্কিম চালুর কথা বলেছেন। এটিও বাস্তবায়িত হতে সময় লাগবে। অন্যদিকে, আয়বৈষম্য কমাতে উচ্চ আয়ের মানুষের আয়ে করহার বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে।

কালের কণ্ঠ: সরকার ঘোষিত বাজেটের নেতিবাচক দিকগুলো কী বলে আপনি মনে করেন?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: বাজেটের আয়-ব্যয় কাঠামোর দুর্বলতা অন্যান্য বছরের মত আগামী বছরেও রয়ে যাবে। উচ্চ ব্যয় মেটাতে আভ্যন্তরীণ উৎস থেকে রাজস্ব আদায়ের যে লক্ষ্যমাত্রা ঘোষিত হয়েছে, অর্থমন্ত্রী নিজেই তাকে উচ্চাভিলাষী বলেছেন। ফলে ঘাটতি বাজেটের আকার বড় হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সরকার ঘাটতি বাজেট মেটাতে বিদেশি অর্থায়নের ওপর জোর দিয়েছে। সাম্প্রতিককালে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ৩ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য সরকারের ৫ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহারের ঘোষণা বাস্তবায়ন অসম্ভব মনে হচ্ছে। ঘাটতি অর্থায়নের ক্ষেত্রে কম ব্যয়বহুল

উৎস ব্যবহার না করে বেশি ব্যয়বহুল উৎস ব্যবহার করার কারণে উত্তরোত্তর সুদজনিত ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। আশার কথা, আগামী বাজেটে তুলনামূলকভাবে কম ব্যয়বহুল আভ্যন্তরীণ উৎসের ঋণ বেশি ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। মনে রাখা দরকার, বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে বেশি ব্যয়বহুল উৎসের ঋণ অতি ব্যবহারের কারণে দীর্ঘ মেয়াদে ঋণ ও সুদ মেটানোর দায় বাড়তে পারে। এ ক্ষেত্রে, প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ঘাটতি অর্থায়নের ক্ষেত্রে দেশটি তুলনামূলকভাবে বেশি ব্যয়বহুল উৎসের ঋণ অতি ব্যবহারের কারণে মধ্য মেয়াদে ঋণের দায় মেটাতে অসমর্থ হয়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের কাছ থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছে।

কালের কণ্ঠ: তাহলে কি আরও বড় বাজেট আমাদের দরকার?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: জাতীয় আয়ের অংশ হিসেবে বাজেটের আকার বিবেচনা করলে বাংলাদেশের বাজেট খুব বড় নয়। সে হিসেবে বড় বাজেটের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু বড় বাজেট দরকার মানেই বড় বাজেট ঘোষণা নয়। বরং বাজেট বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত রাজস্ব আয়ের সক্ষমতা ও গুণসম্পন্ন বাজেট ব্যয়ের কাঠামো দরকার। এ দুই বিবেচনায় বাংলাদেশের পরিস্থিতি আশাব্যঞ্জক নয়। প্রতিবছর বাজেটের আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে; কিন্তু আয় ও ব্যয়ের চ্যালেঞ্জগুলো থেকে যাচ্ছে। প্রতিবেশী অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের রাজস্ব আদায় (জাতীয় আয়ের অংশ হিসেবে) কম, এমনকি নেপালের চেয়েও কম। দ্বিতীয়ত, আমাদের বাজেট বাস্তবায়ন এখনো মন্ত্রণালয়নির্ভর। এর অর্থ দাঁড়ায়, বড় বাজেট বাস্তবায়নের জন্য হয় উন্নয়ন প্রশাসনের দক্ষতা বাড়াতে হবে নয়ত উন্নয়ন প্রশাসন, বিশেষত মন্ত্রণালয়ের আকার বৃদ্ধি করতে হবে। এতে ঠিক বাজেট বাস্তবায়নে উন্নয়ন প্রশাসনের কিছুটা দক্ষতা বেড়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এই দক্ষতা বৃদ্ধির একটি সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে মন্ত্রণালয়ের কলেবর বৃদ্ধিই সমাধান কি না তা প্রশ্নসাপেক্ষ। সরকারের স্থানীয় প্রশাসন এখনো বাজেট বাস্তবায়নে তেমনভাবে যুক্ত নয়। জেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, থানা, পৌরসভা, ইত্যাদি স্থানীয় প্রশাসন নিজেদের অঞ্চলের প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করতে সক্ষম। বাজেট বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় বা মন্ত্রণালয়নির্ভর কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে একটি বিকেন্দ্রায়িত বাজেট বাস্তবায়ন কাঠামোর দিকে যাওয়ার সময় এসেছে বলে আমরা মনে করি। অর্থনীতির আকার বৃদ্ধির পাশাপাশি উন্নয়নকেন্দ্র এখন শুধু কতিপয় বড় শহর বা রাজধানী শহরে সীমাবদ্ধ নেই। তা ছড়িয়ে পড়েছে শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে। তাই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করে বাজেট বাস্তবায়ন করতে না পারলে সরকার স্থানীয় পর্যায়ের চাহিদা মেটাতে পুরোপুরি সক্ষম হবে না।

তৃতীয়ত, এসএমই খাতে প্রতিবছর ঋণ বাড়ছে, এটি ভাল দিক। সিপিডি থেকে প্রাক-বাজেট আঞ্চলিক সংলাপ আয়োজনকালে বগুড়ায় উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি তাঁরা এই সুবিধা পর্যাপ্তভাবে পাচ্ছেন না। বিভিন্ন প্রশাসনিক জটিলতা ও চাহিদামাফিক ঋণপণ্য না থাকায় উদ্যোক্তাদের মধ্যে হতাশা রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে ঋণের সুবিধা উপযুক্তভাবে পৌঁছানোর জন্য সরকারের যে ধরনের কাঠামো দরকার, সেটি দক্ষ নয়। তাহলে সন্দেহ তৈরি হয়, যে ঋণ দেওয়া হচ্ছে সেটি কাদের কাছে যাচ্ছে? যদি এ ঋণ অন্য খাতে ব্যয় হয়, তবে প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জন ব্যাহত হবে। উদ্যোক্তাদের চাহিদার নিরিখে বিশেষত ক্ষুদ্র, ক্লাস্টারভিত্তিক, মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশাসনিক জটিলতা কমিয়ে, প্রয়োজনে প্রশাসনিক জটিলতা এড়াতে এনজিওর সহায়তা নিয়ে ‘উপযুক্ত চাহিদামাফিক ঋণপণ্য’ অনুযায়ী ঋণ বিতরণ করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

কালের কণ্ঠ: স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কি সেই সক্ষমতা গড়ে উঠেছে যে তারা নিজেরা কর আদায় ও ব্যয় যথাযথভাবে করতে পারবে?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: এটি ঠিক, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কিন্তু সেটিও হয়েছে তাদের দীর্ঘদিন কাজ করার সুযোগ না করে দেওয়ার জন্য। এ ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে তাদের অধিকভাবে জড়িত করা গেলে ও স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্ব আদায়ে তাদের সুযোগ বৃদ্ধি করলে দীর্ঘ মেয়াদে ভাল ফল পাওয়া যাবে। তবে এর জন্য সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার থাকা দরকার, মন্ত্রণালয়কেন্দ্রিক বাজেট বাস্তবায়ন কাঠামোর মধ্যে বিকেন্দ্রায়িত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি।

কালের কণ্ঠ: ব্যাংক ব্যবস্থাপনা নিয়ে আপনাদের পরামর্শ জানতে চাই।

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: সাম্প্রতিককালে, আর্থিক খাতের পরিস্থিতি থেকে মনে হয়েছে তারা মূল ট্র্যাক থেকে সরে যাচ্ছে। সরকারি ব্যাংকের পাশাপাশি বেসরকারি ব্যাংক, ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের দুর্বলতার মধ্যে রয়েছে। অনেক ব্যাংকের ন্যূনতম মূলধনের ঘাটতি রয়েছে। ব্যাংকের কু-ঋণ বাড়ছে। বিশেষত, সরকারি ব্যাংকগুলোতে এ সমস্যা বেশি। এসবের সঙ্গে সম্প্রতি আবার সাইবার চ্যালেঞ্জ যুক্ত হয়েছে। সুতরাং সব মিলিয়ে ব্যাংকিং খাতে কয়েক রকমের পরিবর্তন দরকার। সরকারি ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে সরকারের একটি সিদ্ধান্তে আসা দরকার। মূলধন পুনর্ভরণ সরকারি ব্যাংকগুলোর সমস্যার সমাধানে ভূমিকা রাখছে কি না তা ভেবে দেখা দরকার। আগামী অর্থবছরে দুই হাজার কোটি টাকা ব্যাংকের মূলধন পুনর্ভরণের জন্য রাখা হয়েছে।

গত চার অর্থবছরে সরকারি ব্যাংকে মূলধন হিসেবে সাড়ে ১৪ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। এত টাকা দেওয়ার পরও সরকারি ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসেনি, বরং উল্টো কাজ হয়েছে। সরকারি ব্যাংকসহ ১৪টি ব্যাংকে পর্যবেক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর কোন ইতিবাচক ভূমিকা চোখে পড়ছে না। সুতরাং সার্বিক ব্যাংক ব্যবস্থাপনা নিয়ে সরকারের একটি সিদ্ধান্তে আসার সময় হয়েছে। এত বেসরকারি ব্যাংক, সরকারি ব্যাংকের এত শাখা ও তাদের সেবাদানের পরিস্থিতি, তাদের লাভ-ক্ষতির বিষয় ভাবার সময় এসেছে। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে, সিপিডি একটি 'স্বাধীন আর্থিক খাতের পর্যালোচনা কমিশন' গঠনের কথা বলেছে, যে কমিশন আর্থিক খাতের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সরকারের কাছে সুপারিশ দেবে।

কালের কণ্ঠ: ভ্যাট আইন বাস্তবায়নের জন্য সরকার ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কিছুটা সময় নিল, এটিকে কীভাবে মূল্যায়ন করছেন?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী ভ্যাট আইন বাস্তবায়নের প্রাক-প্রস্তুতি নিয়ে আগামী অর্থবছরে কী কী কার্যক্রম নেওয়া হবে সে দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন নিয়ে যে যুক্তিগুলো বিভিন্ন পক্ষ থেকে দেওয়া হচ্ছে সেগুলোর যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। প্রথমত, ভ্যাটের জন্য যে প্রশাসনিক কাঠামো থাকা দরকার তা এখন পর্যন্ত আকারে গড়ে ওঠেনি। দ্বিতীয়ত, ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর থাকাটা যৌক্তিক কি না এটিও ভেবে দেখা যেতে পারে। ভ্যাটের হার কিছুটা কমিয়ে যদি আদায় বেশি হয়, তাহলে সেটি ভাল হতে পারে। তৃতীয়ত, বাংলাদেশের মানুষের আয় কাঠামোয় ব্যাপক ফারাক রয়েছে; সেদিক থেকে যে কোন পণ্য বা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সমান ভ্যাট বসানোও ঠিক কি না তা বিচার করা যেতে পারে। আমাদের প্রত্যাশা, সরকার আগামী এক বছর প্রস্তুতি নিয়ে সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে ভ্যাট আইন বাস্তবায়নে সক্ষম হবে।

কালের কণ্ঠ: আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: কালের কণ্ঠকেও অনেক ধন্যবাদ।

কালের কণ্ঠ

১২ জুন ২০১৬

সম্পদ সঞ্চালনে দক্ষতা বাড়াতে হবে

ফাহমিদা খাতুন

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের গবেষণা পরিচালক। এর আগে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ইউএনডিপি ও ইউএসএআইডিতে কাজ করেছেন। খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করেছেন যুক্তরাজ্যের কিংস কলেজ ও গ্রিনিচ বিশ্ববিদ্যালয়ে। যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের অধীন ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি লাভ করেন। পরবর্তীতে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্ট-ডক্টরেট করেছেন। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থ ইনস্টিটিউটে অধ্যাপক জেফ্রি স্যাক্সের সঙ্গে এসডিজি নিয়ে কাজ করেছেন। নরওয়ের ক্রিশ্চিয়ান মিকেলসেন ইনস্টিটিউট, দক্ষিণ কোরিয়ার কোরিয়া ইনস্টিটিউট ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিকস অ্যান্ড ট্রেড এবং ভারতের সেন্টার ফর স্টাডি অব সায়েন্স, টেকনোলজি অ্যান্ড পলিসি নামক গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ভিজিটিং ফেলো ছিলেন। রাষ্ট্রায়ত্ত জনতা ব্যাংকে ও এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার সঙ্গে বাজেটসহ বিভিন্ন বিষয়ে কথা হয় বণিক বার্তার।

প্রস্তাবিত বাজেটের ভাল দিক ও চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কে কিছু বলুন।

এবারের বাজেটটি প্রণীত হল যে সামষ্টিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে, সেখানে আমরা দেখছি মূল্যস্ফীতির চাপ কম, রফতানির প্রবৃদ্ধি ভাল, লেনদেন ভারসাম্য অনুকূলে রয়েছে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ভাল, জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার উচ্চমুখী, আর্থিক ঘাটতিও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে। আবার আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য নিম্নপর্যায়ে রয়েছে। অন্যদিকে, বিনিয়োগ নিয়ে উৎকণ্ঠা রয়েছে। ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ জিডিপির ২২ শতাংশের মধ্যে আটকে রয়েছে। তা ছাড়া বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও ধীরগতি

লক্ষণীয়। স্বল্প পরিসরে বাজেটের ভাল দিক ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে বলাটা কঠিন। তবে ভাল দিক হচ্ছে, বেশকিছু খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। যেমন – শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ গতবারের চেয়ে শতকরা ৩৫ ভাগ বেড়েছে। স্বাস্থ্য খাতে গতবারের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ১৮ দশমিক ১ শতাংশ বেড়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা খাতেও বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। যদিও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী এবং আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় এ বরাদ্দ এখনো অনেক কম। তবুও বাড়ানোর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এ ছাড়া প্রবৃদ্ধির হার, বিনিয়োগ, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, সম্পদ সঞ্চালন, ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে লক্ষ্যমাত্রাগুলো ধরা হয়েছে সেগুলো যদি অর্জন করা যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা অর্থনীতিতে অনেক প্রাণচাঞ্চল্যতা লক্ষ্য করব। কিন্তু এগুলো কীভাবে অর্জন করব সেটিই হবে চ্যালেঞ্জ। উন্নয়ন ব্যয় ও অনুন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চতর প্রবৃদ্ধির জন্য উন্নয়ন ব্যয় বাড়াতে হবে। কিন্তু প্রস্তাবিত বাজেটে উন্নয়ন ব্যয়ের চেয়ে অনুন্নয়ন ব্যয় বেশি দেখা যাচ্ছে। ব্যয় মেটানোর জন্য আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় উৎস থেকেই সম্পদ আহরণের যে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে, তা পূরণ করাটিও চ্যালেঞ্জিং।

অনেকেই অর্থ সংস্থানের বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। বিষয়টি সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

কয়েক বছরের ধারাবাহিকতা দেখে মনে হচ্ছে, বাজেটে কর আহরণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ কঠিন হবে। নতুন করদাতা ও করের ক্ষেত্র বৃদ্ধির মাধ্যমে করের জাল ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি না করলে কর-জিডিপি হার বাড়ানো সম্ভব নয়। আমাদের অর্থনীতির আকার যেভাবে বাড়ছে, সেখানে আভ্যন্তরীণ সম্পদ সঞ্চালন বাড়াতে হবে। এজন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অবকাঠামো ও মানবসম্পদ প্রয়োজন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন প্রয়োজন। তাদের লোকবলও বাড়াতে হবে। কর আহরণের জন্য নতুন করদাতা এবং নতুন নতুন খাত খুঁজে বের করতে হবে। যারা এরই মধ্যে কর দিচ্ছেন, তাদের ওপরই আরও কর দেওয়ার চাপ বাড়ছে। কর দেওয়াকে জনগণ যাতে বোঝা না ভাবে বরং এটিকে যাতে তার নাগরিক দায়িত্ব মনে করে, সে ব্যাপারে কর বিভাগকে কাজ করতে হবে। জনগণকে হয়রানির মধ্যে না ফেলে সহযোগিতার মনোভাব থাকলে আমার মনে হয়, কর আহরণ আরও বাড়বে।

আমাদের অনুন্নয়ন ব্যয় দিন দিন বাড়ছে। এর ফলাফল কী?

অনুন্নয়ন ব্যয় কর্মসংস্থান এবং সামগ্রিক উন্নয়নে তেমন ভূমিকা রাখে না। কিন্তু মূল্যস্ফীতির ওপর চাপ ফেলে, যা প্রকারান্তরে মানুষের জীবনযাত্রার মানের ওপর প্রভাব ফেলে।

অনুন্নয়ন ব্যয় করতে হয় নিজস্ব অর্থায়নে। সুতরাং সরকারকে প্রায়ই ব্যাংকঋণের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। এতে সরকারের দায়দেনার পরিমাণ বেড়ে যায়। সুদাসলে সেগুলো ফেরত দিতে হয়।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সঙ্গে বাজেটের সমন্বয় রয়েছে কী?

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনের একটি হাতিয়ার হল বাজেট। তাই দু'টোর মধ্যে সমন্বয় না থাকলে মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন দুষ্কর হয়ে যায়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে উদ্দেশ্য ও অর্থায়ন-বিষয়ক লক্ষ্যগুলো থাকে, সেগুলো যত বাস্তবমুখী হবে, তার অর্জন তত ভাল হবে। নিয়মিতভাবে প্রতি তিন মাস পর অর্থমন্ত্রী সংসদে বাজেট বাস্তবায়নের অগ্রগতি তুলে ধরলে বাজেট বাস্তবায়নে আরও গতিশীলতা আসবে। সেটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণেও সহায়ক হবে।

২০১৬ সালে যে সময়ে বাজেট প্রস্তাব করা হল, এ সময়ে আমাদের সামনে এসডিজি বাস্তবায়ন, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরু এবং ভিশন-২০২০ বাস্তবায়নের বিষয় আছে। এগুলোর সঙ্গে প্রস্তাবিত বাজেটের সম্পৃক্ততা কতখানি?

হ্যাঁ, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের সামনে একটি বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতও রয়েছে। একদিকে, আমরা নিজেদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাগুলো পূরণ করব। পাশাপাশি বৈশ্বিকভাবেও আমরা যে প্রতিজ্ঞা করেছি, সেগুলো বাস্তবায়নের কাজও শুরু করতে হবে। ২০১৫ সালে বিশ্ব সম্প্রদায় অনেক অঙ্গীকার করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন বা এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা এবং জলবায়ু পরিবর্তন-সংক্রান্ত জাতিসংঘের ঘোষণা বা কপ২১। পাশাপাশি ২০১১ সালে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য ১০ বছর মেয়াদি যে ইস্তাম্বুল প্ল্যান অব অ্যাকশন করা হয়েছিল, তারও একটি মধ্যমেয়াদি মূল্যায়ন হয়ে গেল এ বছরের মে মাসে। এর সবগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের স্বার্থ যুক্ত। এগুলো পূরণ হলে আমরা দ্রুত এগিয়ে যাব।

কীভাবে?

যেমন ধরুন, এসডিজিতে যে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা ও ১৬৯টি টার্গেট আছে, সেগুলো বাস্তবায়নে ব্যাপক প্রস্তুতি প্রয়োজন। আমাদের হাতে ২০৩০ সাল পর্যন্ত সময় রয়েছে। কিন্তু কাজের পরিসরও অনেক বড়। তাই প্রাধিকার ঠিক করে কাজ শুরু করতে হবে। সে ক্ষেত্রে আমাদের বাস্তবতা অর্থাৎ আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য কোনগুলো,

সম্পদ সঞ্চালনের অবস্থা কী, মানবসম্পদের অবস্থা কী, এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে এসডিজি বাস্তবায়নের প্রাধিকার ঠিক করতে হবে। তাই এসডিজির লক্ষ্যগুলো আমাদের জাতীয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে বা সমান্তরালভাবে এ কাজগুলো করলে লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। পরিকল্পনা কমিশন দেখিয়েছে যে, এসডিজির কোন কোন লক্ষ্যগুলো আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এরই মধ্যে রয়েছে। পুরোপুরিভাবে এসব লক্ষ্য জাতীয় পরিকল্পনায় একীভূত করতে পারলে বাস্তবায়ন সহজ হবে। তবে এজন্য প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ অর্থের। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সংস্থা এর অর্থায়নে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তার সঙ্গে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অনেক তফাৎ রয়ে যাচ্ছে। তার মানে, প্রতিটি দেশের জন্যও বরাদ্দ কম হবে। কাজেই আভ্যন্তরীণ সম্পদের ওপর আমাদের অনেকখানি নির্ভর করতে হবে। তাই আবারো ঘুরেফিরে এক জায়গায়ই ফেরত আসতে হচ্ছে। তা হল সম্পদ সঞ্চালনে আমাদের দক্ষতা আরও বাড়াতে হবে এবং বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি সত্ত্বেও বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ছে না। বেসরকারি বিনিয়োগ না বাড়লে সরকারের পরিকল্পনাগুলো কীভাবে বাস্তবায়ন হবে?

বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ার জন্য একদিকে যেমন দরকার গ্যাস, বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট অর্থাৎ অবকাঠামোর উন্নয়ন, তেমনি দরকার সামনের দিনগুলো সম্পর্কে মধ্যমেয়াদে স্বচ্ছ ধারণা, তাদের বিনিয়োগের ফলাফল সম্পর্কে পরিষ্কার পথরেখা। বেসরকারি বিনিয়োগ না বাড়লে অর্থনীতিতে গতিময়তা ব্যাহত হয়, শিল্পায়ন, সেবা খাতের প্রসার, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, ইত্যাদি সম্ভব হয় না। তাই বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকা উচিত। অবকাঠামোগত দুর্বলতা, ব্যাংকের সুদের হার, সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা, ইত্যাদি সমস্যার কথা সবসময়ই বলা হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত সমস্যাগুলো কী, বিনিয়োগকারীরা কী ভাবছেন, সেটি বোধ হয় আমরা এখনো বুঝতে পারছি না।

জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের ওপর হচ্ছে কয়েক বছর ধরে। এর যথাযথ প্রভাব কি অর্থনীতিতে পড়ছে?

অর্থনীতির আকার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং কর্মচাঞ্চল্য বাড়বে, জিডিপির আকারও বাড়বে। কিন্তু জিডিপির প্রবৃদ্ধি টেকসই হবে কিনা এবং প্রবৃদ্ধির সঙ্গে মানুষের জীবনের মান উন্নত হল কিনা, সেটিই মূলত দেখতে হবে। প্রবৃদ্ধি বা জাতীয় আয় বাড়লেই সবার আয় বাড়বে এমনটি নয়। আয়বৈষম্য কমে যাবে, সেটিও নয়।

বৈশ্বিকভাবেও দেখা গিয়েছে, যখন সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এমডিজি বাস্তবায়ন করা হল, তখন ২০০০ সাল থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী এক বিলিয়নের মত লোকের দারিদ্র্য বিমোচন করা গিয়েছে। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হল, আয়বৈষম্য কমেনি। এ উদ্বেগ আমাদের জন্যও প্রযোজ্য। সম্পদের পুঞ্জীভবন উপরের দিকে হচ্ছে। অতি দরিদ্রদের দারিদ্র্যসীমার উপরে তুলে আনতে হবে। অর্থাৎ বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুপেয় পানি, পয়োনিষ্কাশন, ইত্যাদি সুবিধা সবাই পাচ্ছে কিনা এবং কতটুকু পাচ্ছে, এগুলোই দেখার বিষয়। দেখতে হবে, মানুষের মৌলিক সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে গুণগত মান বাড়ছে কিনা। এগুলো নিশ্চিত করতে না পারলে প্রবৃদ্ধি যতই বাড়ুক, তাতে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কোন লাভ হবে না। সেজন্য প্রবৃদ্ধির গুণগত মানের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য একদিকে যেমন প্রয়োজন দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অন্যদিকে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের পরিসর ও আর্থিক বরাদ্দ বাড়ানো। সক্ষম প্রতিটি ব্যক্তিই যেন শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ করে আয় করার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে, সে লক্ষ্যে বাজেটে বরাদ্দ রাখা উচিত।

সরকারের সার্বিক দক্ষতা কীভাবে বাড়ানো যায়?

বাজেট বাস্তবায়নে দক্ষতা বাড়ানোর কথা অর্থমন্ত্রী নিজেও প্রায়ই বলে থাকেন। কিন্তু তার প্রতিফলন আমরা খুব একটি দেখি না। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ছাড়া দক্ষতা বাড়ানো সম্ভব নয়। দক্ষ জনবল, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত প্রশাসন, কাজের মান অনুযায়ী কর্মকর্তাদের মূল্যায়ন, ইত্যাদি সরকারের সামগ্রিক দক্ষতা বাড়ানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বাজেটে বেশ কয়েকটি সংস্কার পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো যত দ্রুত বাস্তবায়ন হবে, ততই দক্ষতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে এগোনো যাবে।

সাধারণ মানুষের ওপর ভ্যাটের বোঝা বাড়ছে। এটিকে কীভাবে দেখেন?

আভ্যন্তরীণ সম্পদ সঞ্চালনের জন্য করের আওতা বাড়ানোর বিকল্প নেই। তবে তা এমন হতে হবে, যাতে সেটি প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা হয়। অর্থাৎ যার যতটুকু সামর্থ্য রয়েছে, সে অনুযায়ী কর দেবে। মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট হচ্ছে পরোক্ষ কর এবং তা সবাইকে একই হারে দিতে হয়। সেজন্য এটি গরিবের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। ভ্যাট যেহেতু ভোক্তা ও ক্রেতার ওপরই এসে বর্তায়, তাই এটি যুক্তিশীল হারে প্রয়োগ করা উচিত।

ব্যাংকিং খাতের অনিয়ম নিয়ে কিছু বলুন...

এটি নিয়ে নতুন করে আর বলার নেই। দুঃখজনক হচ্ছে, অনিয়ম বন্ধ করার সক্রিয় উদ্যোগও চোখে পড়ছে না। কয়েক বছর আগেও বিভিন্ন সংস্কারের পর ব্যাংকিং খাতে এক ধরনের গতিময়তা ফিরে আসতে শুরু করেছিল। কিন্তু এখন একদিকে কু-ঋণের পরিমাণ বাড়ছে, অন্যদিকে বড় বড় অনিয়ম ধরা পড়ছে। তার ওপর রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকগুলোর মূলধন ঘাটতি মেটাতে সরকার টাকা ঢালছে। এ বছরের বাজেটেও ২ হাজার কোটি টাকা রাখা হয়েছে ব্যাংকগুলোর মূলধন ঘাটতি মেটানোর জন্য। এগুলো কোন টেকসই সমাধান নয়। ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতের জন্য একটি কমিশন গঠন করার কথা আমরা অনেক দিন থেকেই বলছি। এ কমিশন আর্থিক খাতের দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে এর উন্নয়নের জন্য সুপারিশ করবে। এ খাতের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা ও সুশাসন। ব্যাংকগুলোর পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করতে হলে প্রযুক্তির ব্যবহার আরও বাড়াতে হবে। সে সঙ্গে প্রযুক্তিগত অপরাধ বন্ধ করার জন্যও প্রস্তুতি থাকতে হবে।

শ্রুতিলিখন: *হুমায়ুন কবির*

বণিক বার্তা
২৬ জুন ২০১৬

২০১৬: সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিয়েছে মূল্যস্ফীতি

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

আরও একটি বছর শেষ হল। দেশের অর্থনীতি, আর্থিক খাতের জন্যও বছরটি ছিল আলোচিত-সমালোচিত। অর্থনীতিতে স্বস্তির পরশ যেমন ছিল, তেমনি ছিল দুশ্চিন্তার কারণও। যা কিছুই ঘটুক অর্থনীতিতে, এর প্রভাব এসে পড়ে মানুষের ওপর। বছরজুড়ে অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি নিয়ে বিশ্লেষণ ও গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। তিনি প্রথম আলোর এ সপ্তাহের সাক্ষাৎকারে তাঁর বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলেছেন ২০১৬ সালটির ভালমন্দ। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সুজয় মহাজন ও রাজীব আহমেদ।

প্রথম আলো: ২০১৬ সালটি দেশের অর্থনীতির জন্য কেমন ছিল?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: মোটা দাগে বলতে গেলে বছরটিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির অনেকগুলো সূচক স্থিতিশীল ছিল। অর্থনীতির যেসব সূচক সরাসরি সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করে, সেসব সূচকের বেশ কয়েকটি স্বস্তিদায়কই ছিল বলা চলে।

প্রথম আলো: অর্থনীতির কোন সূচকগুলো ইতিবাচক ছিল? যার জন্য সাধারণ মানুষ স্বস্তিতে ছিল বলে মনে করছেন।

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: বছরজুড়ে মূল্যস্ফীতি সহনীয় মাত্রায় ছিল। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে এ সূচকটি। এ ছাড়া কৃষিপণ্য উৎপাদন পরিস্থিতি ভাল থাকায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যও সহনীয় ছিল। এ কারণে

সাধারণ মানুষ, তথা সীমিত আয়ের মানুষকে বড় ধরনের কোন অসহনীয় পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়নি। তবে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করে যদি দেশেও যথাসময়ে জ্বালানি তেলের দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া যেত, তাহলে দ্রব্যমূল্যে কিছুটা হলেও তার সুফল পাওয়া যেত। এর বাইরে ২০১৬ সালটি সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্যও বেশ স্বস্তির ছিল। এ বছরটিতে তাঁদের বেতন-ভাতা বেড়েছে।

প্রথম আলো: অর্থনীতির আর কোন কোন সূচক ইতিবাচক ছিল বলে মনে করেন?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: ব্যাংকিং খাতে ঋণের সুদহার নিম্নমুখী ছিল। এটি বিনিয়োগের জন্য সহায়ক। যদিও বেসরকারি খাতের বিনিয়োগে আমরা কাঙ্ক্ষিত গতি দেখতে পাইনি। এ ছাড়া শিল্প খাতের পরিবেশ, উৎপাদন পরিস্থিতি, মোট দেশজ উৎপাদন বা জাতীয় প্রবৃদ্ধির মত গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলোও ইতিবাচক ছিল এ বছরটিতে। প্রথমবারের মত ৭ শতাংশের বেশি জাতীয় প্রবৃদ্ধি হয়েছে আমাদের এ বছরটিতে। যদিও এ প্রবৃদ্ধি নিয়ে কারও কারও মনে কিছুটা সংশয় রয়েছে। তা সত্ত্বেও যে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে, তা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে উল্লেখ করার মতই।

এ ছাড়া বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, ১৫ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জন, রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণ, রাজস্ব আয় বাড়ানোর উদ্যোগ, বিদেশি শ্রমশক্তি রফতানিও অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক।

প্রথম আলো: বছরটিতে অর্থনীতির জন্য খারাপ বা নেতিবাচক কিছু ছিল কি?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: ২০১৬ সাল জুড়ে সরকারের মধ্যে বড় বড় প্রকল্প গ্রহণের প্রবণতা ও চুক্তি স্বাক্ষরের প্রতি বেশ আগ্রহ দেখা গিয়েছে। তার বিপরীতে চলমান কিছু বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যাশিত গতি দেখতে পাইনি। বেসরকারি বিনিয়োগেও ছিল শ্লথগতি। রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় কমে যাওয়া বছরটিতে দুশ্চিন্তার কারণ ছিল।

প্রথম আলো: তরুণ জনগোষ্ঠীর আশাবাদী হওয়ার মত কোন ঘটনা কি বছরটিতে ছিল?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: গত কয়েক বছরের ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালেও আমরা তরুণদের মধ্যে স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রবণতা দেখেছি। এটি অবশ্যই ইতিবাচক। এর ফলে আরও অনেকেই উৎসাহিত হবে। এ স্বকর্মসংস্থান উদ্যোগের কারণে প্রচ্ছন্নভাবে

বেকারত্ব কমছে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে তরুণ উদ্যোক্তা তৈরিতে বেশ কিছু সহায়ক কর্মসূচি বা উদ্যোগও ছিল বছরজুড়ে। এটিও তরুণদের আশাবাদী হওয়ার মত। তবে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ার প্রবণতা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে ছিল এ বছরটিতেও।

প্রথম আলো: ২০১৬ সালটি আর্থিক খাতের জন্য কেমন ছিল বলে মনে করেন?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: এ বছরটিতেই আর্থিক খাতে বিশ্বজুড়ে আলোচিত রিজার্ভের অর্থ চুরির ঘটনাটি ঘটেছে। এর মধ্য দিয়ে আমরা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা দুর্বলতার বিষয়টি জানতে পারলাম। আবার চুরি যাওয়া রিজার্ভের অর্থ উদ্ধারে বছরজুড়ে যে চেষ্টা বা উদ্যোগ ছিল, তাতেও একধরনের সমন্বয়হীনতার চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ ছাড়া, যথারীতি রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর অনিয়ম ও মূলধন ঘাটতিতে পড়ার বিষয়টি ছিল উদ্বেগজনক। এ মূলধন ঘাটতি মেটাতে সরকার জনগণের করের টাকায় মূলধন যোগান দিয়েছে। ব্যাংকিং খাতে সংস্কার না করে এ মূলধন যোগান দেওয়ায় তার খুব বেশি সুফল পাওয়া যায়নি।

প্রথম আলো
৩১ ডিসেম্বর ২০১৬

ভ্যাট আইন পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে আরও প্রস্তুতি দরকার

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

দেশের বাজেট কাঠামো এখন আর শুধু অর্থনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক অর্থনীতি ও নৈতিকতা। এ ধরনের অর্থনীতিতে ক্ষমতাসীন দল, শক্তিশালী মহল, প্রভাবশালী ব্যক্তি ও গোষ্ঠী কাজ করে। এজন্য তাদের আঘাত দিয়ে বাজেট প্রণয়ন করাকে চ্যালেঞ্জ মনে করে সরকার। যুগান্তরের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির (সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ) ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এসব কথা বলেন। তার মতে, অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য ৫টি সংস্কার জরুরি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – ব্যাংকিং খাত, পুঁজিবাজার, স্থানীয় প্রশাসন, কৃষি খাত ও জনপ্রশাসন। এ ছাড়াও বহুল আলোচিত ভ্যাট আইন পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে আরও প্রস্তুতি দরকার বলে মনে করেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খ্যাতিমান এ অর্থনীতিবিদ। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মনির হোসেন।

প্রশ্ন: নির্বাচনের আগে সরকারের পূর্ণাঙ্গ বাজেটে কী কী চ্যালেঞ্জ থাকতে পারে?

উত্তর: তথাকথিত নির্বাচনী বাজেটের প্রভাব হয়ত এবার থাকবে। তবে সামনের বছরের প্রতিশ্রুতি আরও বেশি নির্বাচনমুখী হবে। আমার দৃষ্টিতে, গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য প্রতিটি বাজেটই হওয়া উচিত নির্বাচনী। কারণ এক বছরে সব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা যায় না। ধারাবাহিকভাবে করতে হয়। ফলে শেষ সময়ে এসে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে। কিন্তু তা আর বাস্তবায়ন করা যায় না। কয়েক বছর ধরে বাজেটের চ্যালেঞ্জগুলো একই রকম। প্রথম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সম্পদ সমাবেশ।

আভ্যন্তরীণ সম্পদ বাড়াতে রাজস্ব বৃদ্ধির বিশাল চাপ রয়েছে। এবারের বিশেষ পরিস্থিতি হল নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন। এতে কী হারে ভ্যাট দিতে হবে, তার ওপরই অনেক কিছু নির্ভর করছে।

প্রশ্ন: দীর্ঘদিন ধরেই দেশের অর্থনীতিতে আলোচিত ও সমালোচিত বিষয় ভ্যাট আইন। এ ক্ষেত্রে সরকারের যৌক্তিক অবস্থান কী হওয়া উচিত?

উত্তর: ভ্যাট আইন সম্পূর্ণভাবে কার্যকরের জন্য প্রস্তুতি এখনও শেষ হয়নি। আমি মনে করি, এজন্য সরকারের আরও প্রস্তুতি দরকার। পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্যও প্রস্তুতির প্রয়োজন। তবে এ ভ্যাট আইন আধুনিক। আমরা নীতিগত অভিন্ন ভ্যাট আইন বাস্তবায়নের পক্ষে। কিন্তু সেজন্য আরও প্রস্তুতি লাগবে। এজন্য সিপিডির পক্ষ থেকে প্রস্তাব ছিল প্রাথমিকভাবে একটু কম হারে প্রয়োগ করা। তিনি বলেন, রাজস্ব খাতে একটি প্রবণতা লক্ষণীয়। যারা কর দেন, প্রতিবছর তাদের ওপর চাপ বাড়ে। কিন্তু সেই তুলনায় নতুন করদাতা আসে না। সিপিডির পক্ষ থেকে বিকল্প একটি প্রস্তাব ছিল। ভ্যাটের কারণে আগামী বছর মূল্যস্ফীতি বাড়বে। তাই ন্যূনতম করদাতাদের করের হার ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে সাড়ে ৭ শতাংশ করা উচিত।

প্রশ্ন: বাজেট থেকে সরকারি ব্যাংকগুলোকে মূলধনের যোগান দেওয়া হয়। এটি কতটা যৌক্তিক?

উত্তর: মানুষ আশা করে করের অর্থে তার জীবনযাত্রার মান বাড়বে। সরকার এই টাকা নিয়ে অবকাঠামো নির্মাণ ও আইনশৃঙ্খলায় খরচ করবে। এতে সে আরও স্বাচ্ছন্দ্যভাবে জীবনযাপন করতে পারবে। কিন্তু ঋণের নামে এই করের হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট হয়েছে। সেই ঋণ আদায় না করে বাজেট থেকে আবারও মূলধন যোগান দেওয়া হচ্ছে। এটি নৈতিকভাবে অন্যায়। এটি অর্থনীতির কোন নীতিমালার মধ্যে পড়ে না।

প্রশ্ন: সরকারি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থ ব্যয়ের গুণগতমান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

উত্তর: বাংলাদেশ সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে যে সাফল্য দেখিয়েছে, সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ওই পরিমাণ দক্ষতা দেখাতে পারেনি। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অর্থ ব্যয়ের হার যেভাবে কমছে, তার গুণগতমানের ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রশ্ন থেকে যাবে। এডিপিতে কয়েকটি সমস্যা সুনির্দিষ্ট। তা হল টাকা খরচ করা যাচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, যতটুকু খরচ হচ্ছে, তারও গুণগতমান ভাল নয়। তৃতীয়ত, পদ্মাসেতুর মত তথাকথিত কয়েকটি বড়

প্রকল্পে টাকা দিয়ে রেখেছে, কিন্তু খরচ না করতে পারায় ফেরত যাচ্ছে। কিন্তু শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নেই। এটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বৈষম্য বাড়ায়।

প্রশ্ন: প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক সহায়তা পাইপ লাইনে আটকে আছে, এর কারণ কী?

উত্তর: বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্য অনেক রেয়াতি সুদে এমনকি বিনা সুদে বিদেশ থেকে অনুদানের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু সেসব বিদেশি সাহায্য ব্যবহার করতে পারছে না সরকার। বিপরীতে ব্যাংক ও সঞ্চয়পত্র থেকে উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে ঘাটতি পূরণ করা হচ্ছে। এটি দেশের রাজস্ব আয় ব্যয় ব্যবস্থাপনার মধ্যে গলার ফাঁস হয়ে দেখা দিয়েছে। ফলে রাজস্ব ব্যয়ের এক চতুর্থাংশ আভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ পরিশোধে ব্যবহার হচ্ছে। এটি রাজস্ব ব্যবস্থাপনার বড় ধরনের ত্রুটি।

প্রশ্ন: এ সমস্যা বহুদিনের। এখান থেকে উত্তরণের উপায় কী?

উত্তর: যে কোন সরকার বাজেট তৈরির সময় একটি আয়-ব্যয় কাঠামো দেয়। তখন থেকে অগ্রাধিকার ইস্যুগুলোকে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির সঙ্গে মিলিয়ে প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। আর এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে অব্যাহতভাবে নীতি সংস্কারের মাধ্যমে দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে হয়। কিন্তু বর্তমান সরকার ২০১২-১৩ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংস্কারে দম হারিয়ে ফেলেছে। এর ফলে ব্যাংকিং খাত ও পুঁজিবাজার বিকলাঙ্গ হয়েছে। এটি শক্তিশালী বিনিয়োগের দু'টি পায়ের মত। কিন্তু বর্তমানে এ দুই পায়ে গ্যাংরিনের মত পচন ধরেছে। প্রশ্ন হল, সমস্যা উত্তরণে পা কেটে ফেলতে হবে, নাকি চিকিৎসা শেষে আবারও দৌড়ানো শুরু করব আমরা।

আরেকটি বিষয় হল, স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা। এ ছাড়াও সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি কমিয়ে কৃষককে পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হবে। অন্যদিকে, হাজার হাজার কোটি টাকা বেতন বাড়ানো হলেও জনপ্রশাসনে কোন সংস্কার নেই।

প্রশ্ন: দীর্ঘদিন পর্যন্ত দেশের ব্যাংকিং খাতে এক ধরনের লুটপাট চলছে। ব্যাংকের পরিচালকরাই এর সঙ্গে জড়িত। ঠিক এ সময়ে ব্যাংক কোম্পানি আইনের খসড়া অনুমোদন করে পরিচালকদের ক্ষমতা আরও বাড়ানো হয়েছে।

উত্তর: এ আইনটি নিয়ে সরকার সম্পূর্ণ উল্টো সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণ যে কমিটির ভিত্তিতে ব্যাংক কোম্পানি আইন সংশোধন করা হয়েছে, ২০০৩ সালে ওই কমিটিতে

আমি ছিলাম। সাইফুর রহমান অর্থমন্ত্রী ছিলেন। ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদের নেতৃত্বে কমিটি হয়েছিল। সুপারিশে আমরা বলেছিলাম, শুধু সরকারি নয়, বেসরকারি ব্যাংকেও সুশাসন আনার জন্য পরিবারের ভূমিকাকে সীমিত করে অন্য শেয়ারহোল্ডারদের কণ্ঠ শক্তিশালী করতে হবে। এজন্য আমরা স্বাধীন পরিচালকের কথা বলেছিলাম। যদিও স্বাধীন পরিচালক হিসেবে এখনও যাদের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে, তারা সবাই স্বাধীন না। যে কারণে ব্যাংকের আজকের এই পরিস্থিতি। তার সুরাহা না করে ব্যক্তি খাতের ব্যাংকগুলোকে আরও দুর্যোগের মুখে ঠেলে দেওয়া হল। অর্থাৎ সরকার একদিকে সরকারি ব্যাংকে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার জন্য, লুটপাটের জন্য টাকা ফেরত নেয় না। বেসরকারি ব্যাংকগুলোতেও পরিবারের আধিপত্যের মধ্য দিয়ে ব্যবস্থাপনা নীতির খেলাপ করবে। এটি দিয়ে বোঝা যাচ্ছে, এ রাজনৈতিক অর্থনীতিতে ক্ষমতাসীন, শক্তিশালী, প্রভাবশালী অর্থনৈতিক ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও দলীয় শক্তি কাজ করে। ফলে তাদের বিপক্ষে গিয়ে, তাদের আঘাত দিয়ে নির্বাচনী বাজেট দিতে চাইবে বলে মনে হয় না। কিন্তু এ আঘাত যদি দেওয়া হত, তবে সাধারণ মানুষ সরকারের পক্ষে আরও বেশি আসত। অর্থাৎ নির্বাচনের চিন্তা করে সরকার যেটা করে, আসলে তার উল্টো ফল পাওয়া যায়। জনগণ এসব দেখছে। কারণ বাংলাদেশের জনগণ খুব সচেতন।

প্রশ্ন: সাম্প্রতিক সময়ে অর্থ পাচারের ইস্যু বারবার সামনে আসছে। অর্থ পাচাররোধে বাজেটে কী ধরনের সংস্কার পদক্ষেপ থাকা উচিত।

উত্তর: যে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যায়, তার চারগুণ টাকা বিদেশে চলে যাচ্ছে। আমরা জানি, কার নামে বিদেশে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাড়ি আছে। কে বিদেশে বিনিয়োগ করছে, ওই দেশের নাগরিকত্ব নিচ্ছে। গরিব মানুষের করের টাকা বিদেশে চলে যাবে, এটি কোন ধরনের নৈতিকতা। বাজেট শুধু অর্থনীতির বিষয়ে সীমাবদ্ধ নেই। রাজনৈতিক অর্থনীতি ও রাজনৈতিক নৈতিকতার প্রশ্ন এখন বাজেটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন: দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হিসাব নিয়ে নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে।

উত্তর: এখানে দু'টি বিষয় লক্ষণীয় – সেবা খাতের বাইরে শিল্প ও কৃষি খাতে কী পরিমাণ প্রবৃদ্ধি আসছে। বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে একটি সেবা খাতনির্ভর অর্থনীতি হচ্ছে। অর্থাৎ শিল্পায়নের আগেই শিল্প থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় বিষয় হল, প্রবৃদ্ধির সঙ্গে কী পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। প্রবৃদ্ধি মানে হল কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, মানুষের আয় বাড়বে। সিপিডি দীর্ঘদিন থেকে বলে আসছে, দেশে যে হারে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে, ওই হারে কর্মসংস্থান বাড়ছে না।

প্রশ্ন: দেশের অর্থনীতিতে প্রতিষ্ঠিত একটি বিষয় হল, বেসরকারি বিনিয়োগ হচ্ছে না। গত কয়েক বছর পর্যন্ত এভাবে মন্দা চলছে। বিনিয়োগ বাড়াতে আপনার সুপারিশ কী?

উত্তর: সরকারি বিনিয়োগ হলেও ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ নেই। এর কারণ হল, কোথাও একটি অনিশ্চয়তা বোধ আছে। এ অনিশ্চয়তা থেকেই উদ্যোক্তারা বিদেশে বিনিয়োগ করতে চায়। এ ক্ষেত্রে আফ্রিকাকে তারা বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত মনে করছেন। এটি একটি বড় ধরনের সিগন্যাল (সংকেত)।

যুগান্তর
২৫ মে ২০১৭

সরকার নীতি-সংস্কার ও উদ্ভাবনী কৌশলে পিছিয়ে

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য একজন অর্থনীতিবিদ। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো। দুই দশক ধরে তিনি বাজেট বিশ্লেষণের সঙ্গে জড়িত। আর এক দিন পরেই উপস্থাপিত হবে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের নতুন বাজেট। আসন্ন এই বাজেটের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নিয়ে তিনি কথা বলেছেন প্রথম আলোর সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন শওকত হোসেন।

প্রথম আলো: গত বছর বাজেটকে আপনি তীর-ধনুকের সঙ্গে তুলনা করে বলেছিলেন, এই তীর দিয়ে লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে না। ঠিক এক বছর পর এসে কী মনে হচ্ছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এ বছরের প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হয়েছে ৭.২ শতাংশ। কিন্তু প্রাথমিক বাজেটীয় তথ্য বলছে, প্রাক্কলিত সামষ্টিক ও খাতওয়ারি লক্ষ্যসমূহের সঙ্গে প্রকৃত অর্জনের পার্থক্যটা আগের বছরের চেয়ে বেড়েছে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় কিছুটা চাপ বেড়েছে। তাই ধনুকের টানাটাও দুর্বল হয়ে গিয়েছে কি না, তীরটাও ভোঁতা হয়ে গেল কি না – এটিই এখন আলোচ্য বিষয়।

প্রথম আলো: বাজেট বাস্তবায়নে কী কী সমস্যা দেখতে পাচ্ছেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বর্তমানে বাজেট ব্যবস্থাপনায় অনেকগুলো সমস্যা রয়েছে। যেমন, যত দ্রুততার সঙ্গে আভ্যন্তরীণ উৎস থেকে কর আদায় করেছি, ঠিক সে রকম দক্ষতার সঙ্গে সরকারি ব্যয় করতে পারছি না। বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার দ্রুততর করতে পারিনি। যেহেতু আর্থিক কাঠামোটা দুর্বল, এর ভেতরের প্রাধিকারগুলো এটির দ্বারা

নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। প্রকল্পগুলো সময়মত শেষ না হওয়ায় তা ব্যক্তি বিনিয়োগের ওপর প্রভাব রাখেনি। প্রকল্প ব্যয়ের গুণমান বিচার করার জন্য কোন কাঠামো এখনো দাঁড়ায়নি। তাই সামষ্টিক প্রবৃদ্ধি অর্জন হলেও কাঙ্ক্ষিত কর্মসংস্থান, সামাজিক উন্নয়ন ও সুষম উন্নয়নের ক্ষেত্রে আশানুরূপ প্রতিফলন আমরা দেখছি না।

প্রথম আলো: কর আহরণ হচ্ছে ঠিকই কিন্তু অন্যান্য সমস্যাও তো আছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: জনগণের কাছ থেকে নেওয়া কর হাত ঘুরে বিদেশে পাচার হওয়া আরও বেড়েছে। পাচারকারীদের নাম প্রকাশ হওয়ার পরও কোন আইনি ব্যবস্থা না নেওয়া, বিভিন্ন দেশে সম্পত্তি ক্রয় এখন খোলামেলা সত্য। বড় বড় ঋণখেলাপির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে আদায়কৃত বাড়তি কর দিয়ে সরকারি ব্যাংকের পুনঃপুঁজীকরণ হচ্ছে। এ ছাড়া ১৫ শতাংশ হারে একক ভ্যাট হার প্রচলন নিয়ে সমস্যার কথা তো সবাই জানে। তাই কর আহরণ বাড়লেও সেটির নৈতিক ভিত্তি কিছুটা দুর্বল। করের বোঝা সুষম করার জন্য সিপিডি বলেছিল, ব্যক্তি করের প্রথম হারটি ১০ শতাংশ থেকে সাড়ে ৭ শতাংশতে কমানোর কথা।

প্রথম আলো: যে কথাগুলো বললেন, এ ধরনের কথা তো কয়েক বছর ধরেই আলোচনা হচ্ছে, তারপরও কিছু হচ্ছে না।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ধারাবাহিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, নীতি সংস্কার ও উদ্ভাবনী অর্থনৈতিক কৌশল নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার পিছিয়ে আছে। ২০১২-১৩ সালের পর থেকে বর্তমান সরকার কোন বড় ধরনের সংস্কারে যায়নি। এই উদ্যোগহীনতা এখন পুঞ্জীভূতভাবে দেশের বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

প্রথম আলো: সংস্কার না হওয়ায় অর্থনীতিতে কী ধরনের সমস্যা তৈরি হচ্ছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সফল বাজেট বাস্তবায়নের জন্য একটি অনুকূল নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ লাগে। যেমন ব্যাংক খাত এখন অর্থনীতির ভেতরে একটি দুষ্টু ক্ষত। প্রয়োজন ছিল সমস্যার প্রকৃত রূপ চিহ্নিত করার জন্য ও সমাধান বের করার জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট ব্যাংকিং কমিশন গঠন করা। অথচ হল উল্টো পক্ষে যাত্রা। ব্যাংক কোম্পানি আইন সংশোধনে ২০০৪-০৫ সালে যে কমিটি করা হয়েছিল, আমি নিজে সেটির সদস্য ছিলাম। সেখানে বেসরকারি ব্যাংকগুলোকে পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করা, সুশাসন শক্তিশালী করা, স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগে যেসব সুপারিশ ছিল তা পরবর্তী

সময়ে কার্যকর করা হয়। অথচ এখন আবার পারিবারিক পরিচালকের সংখ্যা ও মেয়াদ বাড়িয়ে অর্থ জমাকারীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করা হল। রেইনট্রি হোটেল নির্মাণে অর্থায়নের প্রক্রিয়া প্রমাণ করে যে ব্যক্তি খাতের পরিচালকেরা কীভাবে বাধাহীনভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে। আর ইসলামী ব্যাংকের মালিকানা পরিবর্তনে অভিযোগ উঠেছে যে, বৃহৎ ঋণগ্রহীতা কীভাবে অন্যতম মালিক হয়ে যায়। পুঁজিবাজারের অবস্থা অনেকটা নীরব ক্যানসারের মত। পুঁজিবাজারেরও এত সংস্কারের উদ্যোগ এখনো কোন কার্যকর ফল দিল না। নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক প্রতিবেদনের স্বচ্ছতা, বিও অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনায় জটিলতা, ইত্যাদি সমস্যা রয়ে গিয়েছে। তাই ক্ষুদ্র লগ্নিকারকেরা ঝুঁকিতে রয়ে গেলেন।

ভবিষ্যতে বাজেট যদি বাড়াতে হয় তাহলে ঢাকায় বসে এত টাকা খরচ করা হবে কল্পনাতীত ব্যাপার। আর্থিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় সম্পদের সমাবেশ, স্থানীয় সরকারের ভূমিকাকে জোরদার করার দিকে এগোলাম না। উল্টো জেলা বাজেট তৈরির উদ্যোগকে পরিত্যাগ করলাম। একইভাবে, জনপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের স্বাধীনভাবে মেধার ভিত্তিতে কাজ করার আইন পাস করলাম না।

বাজেটের ওপর জনপ্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণও অনেক ক্ষীণ। সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোও কোন ভূমিকা এ ক্ষেত্রে রাখে না। এরা মন্ত্রণালয়ের তিন বছর মেয়াদি বাজেট-কাঠামোকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রকল্প চয়ন, বাস্তবায়নে নজরদারি এবং প্রকল্প শেষ হলে মূল্যায়ন করার মত কোন কাজই করে না। সংসদেও অর্থনীতির নীতিগত কোন বিষয় নিয়ে সে রকম আলোচনা হয় না। শেষ পর্যন্ত বাজেট অত্যন্ত আমলানির্ভর থেকে যায়। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি বা পিপিপি একটি আকর্ষণীয় ধারণা ছিল, এর অক্ষরগুলো দিয়ে কোন সাফল্যের বাক্য আমরা রচনা করতে পারলাম না।

প্রথম আলো: অর্থনৈতিক সংস্কার না করেও প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের বেশি হচ্ছে, এর ব্যাখ্যাটা কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বাংলাদেশের অর্থনীতির ৫০ শতাংশের বেশি হল সেবা খাত। এ খাতে যদি ৬ থেকে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয় তাহলে বাংলাদেশে কখনোই প্রবৃদ্ধির হার ৪ শতাংশের নিচে নামবে না। তবে সেবা খাতের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হিসাব করার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। উৎপাদনশীল খাতের জন্য যে প্রাক্কলন করা হয়, সেটিও বছরের তিন-চার মাসের প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে করা হয়, বাকিটা অনুমাননির্ভর। সাম্প্রতিক অকালপ্লাবন কৃষির প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধি কমিয়ে দেবে, রফতানি আয় ইদানীং দুর্বল হয়ে

যাওয়ায় শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি কার্যত কমে যাবে। তাই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে উৎপাদনশীল খাতের বিকাশ। অথচ এ বছর ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ হার বাড়েনি, ভোগের ক্ষেত্রেও সরকারি অংশ বেড়েছে। আর রেমিট্যান্স আয় নেতিবাচক থাকায় মোট জাতীয় সঞ্চয়ের হারও কমবে।

আসলে প্রবৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে দেশে একটি মানসিক বৈকল্য (প্যারানয়া) সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রবৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এটিই একমাত্র ধ্রুব না। সত্যি সত্যিই যদি বর্তমান প্রবৃদ্ধি এত তাৎপর্যপূর্ণ হত তাহলে ৪০ শতাংশ যুবক কর্মহীন থাকত না। উচ্চমাত্রার প্রবৃদ্ধি যদি প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি না করে তাহলে এ প্রবৃদ্ধির গুণগত মান নিয়ে চিন্তা করতে হবে। বড় প্রমাণ হল, সাম্প্রতিক শ্রম জরিপ প্রদত্ত তথ্য। হয়ত দেশ একটি পর্যায় দিয়ে যাচ্ছে, যেখানে নতুন প্রযুক্তি আসার ফলে শ্রমের চাহিদা তুলনামূলকভাবে কমছে।

প্রথম আলো: সরকারের মনোযোগ তো এখন বড় বড় প্রকল্পের দিকে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: কিন্তু মেগা প্রকল্পে মাইক্রো স্বস্তি দিচ্ছে না। মেগা প্রকল্পে অতি-অর্থায়ন, বিলম্বিত বাস্তবায়ন, প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে সম্পদের অপচয় হচ্ছে। অথচ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে টাকা না দিয়ে এসব প্রকল্পে অর্থ দেওয়া হচ্ছে। তাই জনগণ দুই-তিন দিক দিয়ে বঞ্চিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতি দ্রুত কাটাতে হবে। এটি শুধু বাজেটের কোন ব্যাপার না। প্রয়োজন রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, অর্থনৈতিক নেতৃত্ব এবং সামাজিক সমর্থন।

প্রথম আলো: তাহলে এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি টেকসই নয়?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমাদের সৌভাগ্য, গত আট বছরে আমরা একটি অনুকূল বিশ্ব পরিস্থিতির মধ্যে ছিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যেই, আমাদের বৈদেশিক খাতে চিড় দেখা দিচ্ছে। রেমিট্যান্স ও রফতানি আয় শ্লথ হচ্ছে। এর ফলে মাঠপর্যায়ে ভোগের মাত্রা সীমিত হচ্ছে। বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়ছে না। এই চিড় যদি ফাটল হয়ে দেখা দেয়, তাহলে সূচকে বড় ধরনের ধাক্কা লাগবে। নতুন ভ্যাট আইন, চালের দাম বেড়ে যাওয়া এবং জ্বালানির দাম না কমানোয় আগামী বছর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও উৎপাদন খরচ বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। আর মেধা ও পরিশ্রমের মূল্যায়ন না হলে অর্থনীতিতে উদ্ভাবনী শক্তি থাকে না। বৈষম্যমুখী সমাজের মধ্যে আরেক ধরনের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন – মাদকাসক্তি, অসহিষ্ণুতা, জঙ্গিভাবাপন্ন মনোভাব।

প্রথম আলো: অর্থনৈতিক সংস্কারে সরকারের হাত না দেওয়ার কারণ কী বলে মনে করেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সরকার কি চেতনার অভাবের কারণে নাকি সচেতনভাবে সংস্কার না করার সিদ্ধান্ত নিল – এটি বোধগম্য নয়। সামনে নির্বাচন। তাই সরকারের কোন পদক্ষেপ এখন কোন পক্ষকে অখুশি করবে বলেও মনে হয় না। নির্বাচনের আগে পুঁজিবাজারের দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দেবে, বেসিক ব্যাংকের মত 'বেসিক' বিষয়ে হাত দেবে – তা আশা করতে পারি না। অথচ রাজনৈতিক অর্থনীতিকে ঠিক করতে না পারলে কেবল প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় বাজেট বাস্তবায়ন দক্ষ করার সুযোগ কম। এখন আসলে তীর-ধনুকের আলোচনার চেয়ে তীরন্দাজদের নিয়েই বেশি আলোচনা করতে হবে বলে মনে হচ্ছে।

প্রথম আলো: শেষ কথা তাহলে কী বলবেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সরকার তার বর্তমান মেয়াদকালের শুরুতে প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতিমালা সংস্কারের বিশেষ কোন পদক্ষেপ নেয়নি। সব দেশে অর্থ মন্ত্রণালয়ই গোষ্ঠীস্বার্থের ওপরে থেকে সংস্কারের উদ্যোগ নিয়ে থাকে। সংস্কারের কারণে সৃষ্ট সাময়িক দুঃখ-কষ্টের জন্য তাদের গালমন্দ শুনতে হয়, কিন্তু শেষ বিচারে মানুষ এই দূরদর্শী ভূমিকার জন্য তাদের প্রশংসা করে। আমরা তো এ ক্ষেত্রে শুধু উদ্যোগহীনতাই দেখলাম না, দেখলাম অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা-সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রকট সমন্বয়ের অভাব। এর মধ্যে পড়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজস্ব বোর্ড, বিনিয়োগ বোর্ড, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন। দেখুন, বাজেট ঘোষণার এক সপ্তাহ আগেও ভ্যাটের হার নিয়ে বিভ্রান্তিকর অবস্থা। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নীতিনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিতে না পারাটা ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সুতরাং এ পরিস্থিতিতে বাজেট বাস্তবায়নের জন্য তীরন্দাজেরা নতুন কী কর্মপরিকল্পনা দেয়, তা দেখার অপেক্ষায় আছি।

প্রথম আলো: আপনাকে ধন্যবাদ।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ধন্যবাদ।

প্রথম আলো
৩১ মে ২০১৭

অধ্যায় ৩

পোশাক ও ট্যানারি শিল্প

পোশাক শিল্পের চ্যালেঞ্জ ও বাধ্যবাধকতা

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের সামনে এখন বড় লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে রফতানি ৫০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছানো, বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী যা ৪ লাখ কোটি টাকার মত। আমাদের চলতি বছরের উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেটের পরিমাণ ৩ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকা। আগামী বছর এর পরিমাণ ৪ লাখ কোটি টাকা হতে পারে, এমন ধারণা দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। এর সঙ্গে রফতানি লক্ষ্যমাত্রার তুলনা করে আমরা চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সময়েই আমাদের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে আরেকটি বড় ঘটনা ঘটতে চলেছে – স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের সারিতে উত্তরণ। এ লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে, পোশাক শিল্পকে নিতে হবে বিশেষ ভূমিকা। বিশেষভাবে, গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বিষয় হচ্ছে কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন। ২০২১ সালের একটি রাজনৈতিক তাৎপর্যও রয়েছে – এ বছরেই পালিত হবে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের রফতানি আয়ের সিংহভাগ আসে পোশাক খাত থেকে। শিল্প শ্রমিকদের বড় অংশও এ খাতে নিয়োজিত। নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এ শিল্পের গুরুত্ব আমরা বুঝতে পারি। পরবর্তী চার বছরের মধ্যে ৫০ বিলিয়ন ডলার রফতানি উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা, তাতে সন্দেহ নেই। যদি তাতে বড় ধরনের ঘাটতি থাকে তাহলে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের পর্যায়ে পৌঁছানোর পথেও আমাদের হোঁচট খেতে হবে।

পোশাক শিল্পের উৎপাদক ও রফতানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ সম্প্রতি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে "বাংলাদেশ আরএমজি রোডম্যাপ : ২০২১ সালের মধ্যে ৫০ বিলিয়ন ডলার রফতানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন" শিরোনামে। এ রোডম্যাপে বলা হয়, বর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্যে অগ্রগতির যে হার এবং বিশেষ করে রফতানি যে হারে বাড়ছে

(২০১৫ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ছিল ৯.২ শতাংশ), সেটি অব্যাহত থাকলে মাত্র চার বছর পর এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কঠিন। পোশাক শিল্পের সঙ্গে যুক্তরাই বলছেন, বর্তমান হার বজায় থাকলে ২০২১ সালে রফতানি বড়জোর ৪৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে। সঙ্গত কারণেই উপসংহার – ২০২১ সালের লক্ষ্য অর্জন করতে হলে বছরে ১.৮ শতাংশ বেশি রফতানি করতে হবে।

লক্ষ্য অর্জন করতে হলে কী করণীয়, কোথায় অগ্রাধিকার – সেটি স্পষ্ট বলেছে এ খাতের উদ্যোক্তাদের সংগঠন। যেমন – অবকাঠামো, জ্বালানি, উৎপাদনশীলতা, অ্যাপারেল ডিপ্লোমেসি ও শ্রমিক ইস্যু। এর বাইরে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে রয়েছে নতুন বাজার অনুসন্ধান, গবেষণা ও উদ্ভাবন, ব্যাকওয়ার্ড ও ফরোয়ার্ড লিংকেজ উন্নয়ন, টেকসই উন্নয়ন ও ইথিকাল প্র্যাকটিস এবং রিলোকেশন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সর্বোচ্চ ও দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকারসমূহ কি যথাযথ মনোযোগ পাচ্ছে? এর সঙ্গে কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের সারিতে পৌঁছানোর বিষয়টিও সরাসরি জড়িত।

স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ উন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে রফতানি বাণিজ্যে কিছু সুবিধা পাচ্ছে। এ 'মর্যাদার' কারণে সহজ শর্তে ও কম সুদে মিলছে বৈদেশিক ঋণ। কিছু অনুদানও মিলছে। কিন্তু একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে এ 'মর্যাদা' প্রকৃতপক্ষে অমর্যাদার কলঙ্কতিলক। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষ্য তাই সঙ্গত এবং তা অর্জন করতে পারা গৌরবের। বাংলাদেশ এ জন্য সচেষ্ট রয়েছে। কিন্তু এটিও মনে রাখতে হবে যে স্বল্পোন্নত দেশের সারি থেকে পরবর্তী উন্নত ধাপে পৌঁছানোর জন্য মূল্য দিতে হয়। এ অর্জনের কারণে বাংলাদেশকে নতুন কিছু বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হবে। প্রথমেই বলা দরকার – উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে পাওয়া কিছু 'সুবিধা' হারাবে কিংবা তার পরিমাণ কমে যাবে। কিছু শর্ত পুনঃনির্ধারিত হবে। অথবা নতুন শর্ত আরোপ করা হবে। যেমন, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে বাংলাদেশ 'অস্ত্র ছাড়া যে কোন পণ্য রফতানিতে শূন্য হার' শুল্ক সুবিধা ভোগ করে আসছে। উন্নয়নশীল দেশের সারিতে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে এ সুবিধা আর থাকবে না। তখন আমাদের রফতানি বাজার ধরে রাখতে হলে নতুন কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো তখন নতুন শর্ত আরোপ করবে। যেমন – পরিবেশ, শ্রম, সুশাসন, বুদ্ধিবৃত্তিগত সম্পত্তি অধিকার, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট, ইত্যাদি। সুতরাং, বাংলাদেশকে নতুন বাস্তবতার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে। এ জন্য চাই সহায়ক আইন ও নিয়মকানুন।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে যে সব নতুন শর্ত আসবে তা পূরণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের করণীয় রয়েছে। তাদের দিক থেকে চাই বিশেষ প্রস্তুতি ও পদক্ষেপ। এ সব টেকসই হতে হবে, প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। বেসরকারি খাতের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা যেমন বাড়াতে হবে এবং এ জন্য সরকারের দিক থেকে সহায়তা দিতে হবে, তেমনি তাদের কর্মকাণ্ড নিয়মিত মনিটর করার পন্থা সরকারকে উদ্ভাবন করতে হবে। এভাবে নতুন মানে উন্নীত হতে হলে উৎপাদন ও রফতানি ব্যয় বেড়ে যাবে। রফতানি বাজারের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে এটি বড় বাধা হয়ে উঠতে পারে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাজারে শূন্য শুল্ক সুবিধা পাওয়ার জন্য বাংলাদেশকে কিছু ক্ষেত্রে নতুন করে আলোচনাতেও বসতে হতে পারে। ইতিমধ্যে যে সব দেশ উন্নয়নশীল দেশের সারিতে পৌঁছেছে তাদের জন্য যে বাণিজ্য শর্ত রয়েছে, তা আমাদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে।

বাংলাদেশের জন্য আরও কিছু জটিল সমস্যা রয়েছে। যেমন, কয়েকটি প্রধান উন্নত দেশের প্রবৃদ্ধির হার নিম্ন পর্যায়ে থেকে যাচ্ছে। অথচ তারাই আমাদের রফতানি পণ্যের, বিশেষত পোশাকের প্রধান বাজার। আরও মনে রাখতে হবে, গত দুই বছরে পোশাকের রফতানিতে ওঠানামা ছিল। এ অবস্থায় ৫০ বিলিয়ন ডলারের রোডম্যাপ কীভাবে অর্জিত হতে পারে? যুক্তরাষ্ট্রে এখন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্টদের তুলনায় সংরক্ষণবাদী নীতি অনুসরণ করবেন, এমনই ধারণা করা হচ্ছে। এর প্রভাব পোশাক রফতানির ওপরেও পড়তে পারে। তাহলে কি রফতানি লক্ষ্যমাত্রা পুনঃনির্ধারণ করতে হবে? আমার ধারণা, এ খাতে বছরে ৭.৫ শতাংশ রফতানি বৃদ্ধির প্রাক্কলন বাস্তবসম্মত এবং এটি ধরে রাখতে পারলে ২০২৪ সাল নাগাদ আমরা ৫০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারি। একই বছরটি কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নত দেশের সারিতে পৌঁছানোর জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

২০২৪ সালে এ দু'টি লক্ষ্য অর্জন করতে হলে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হবে। এক. আরও ভাল প্রতিযোগিতা এবং দুই. আরও ভাল শ্রম ও কারখানা পরিবেশ। রোডম্যাপে প্রতিযোগিতায় আরও সক্ষমতা অর্জনের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু কমপ্লায়ান্সের ইস্যুটি তেমন আলোচনায় নেই। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে উৎপাদন ব্যয় কমানো এবং পণ্যের মান বাড়ানোর কাজ গুরুত্ব দিয়ে করা চাই। যদি বিদ্যমান বড় বাজারগুলোতে শূন্য শুল্ক সুবিধা হারাতে হয় তাহলে এর বিকল্প নেই। এমনকি সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির জন্যও আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে – আমাদের এফএফএন ট্যারিফ দিতে হতে পারে। এ ধরনের শুল্ক বাংলাদেশের রফতানিকারকদের জন্য বাড়তি সমস্যা সৃষ্টি করবে, সন্দেহ নেই। ফলে আমাদের পণ্য

বিদেশের বাজারে আরও দামি হবে, যা সেখানকার ভোক্তাদের নিরুৎসাহিত করবে। এ অবস্থায় উৎপাদকদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হবে – পণ্যের উৎপাদন ব্যয় কমানো। একই সঙ্গে উৎপাদন বহুমুখী করা, ডিজাইনের উন্নয়ন, কমদামি পোশাকের পাশাপাশি আরও উন্নত মানের পোশাক উৎপাদন, ইত্যাদি বিষয়ের প্রতিও মনোযোগ দিতে হবে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে গেলে এ প্রতিযোগিতা তীব্র হবে এবং তার মাত্রা বাড়বে।

কমপ্লায়েন্স অনেক দিন ধরেই আলোচনায়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন বা আইএলওর বিধিবিধান মেনে চলা, পরিবেশ দূষণ ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে দুর্নীতি কমিয়ে আনা – এসব এখন গুরুত্বপূর্ণ। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো যেন নিয়মকানুন মেনে চলে সেজন্য সরকারের বিভিন্ন সংস্থার দায়িত্ব রয়েছে। রোডম্যাপে কারখানার নিরাপত্তা ইস্যুটি গুরুত্ব পেয়েছে। নৈতিকতা-সংক্রান্ত কিছু বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে যাত্রা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে কিছু বিষয় আমাদের কারখানাগুলোকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে। যেমন, শিল্প দূষণ ব্যবস্থাপনা ও সুশাসন। উৎপাদকদের জন্য তা মেনে চলা বাধ্যতামূলক।

রফতানি ৫০ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়া এবং স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের সারিতে উত্তরণ – এ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু আমাদের সামনে। এ দু'টি লক্ষ্য অর্জন করতে হলে আমাদের অবশ্যই বেটার কমপিটিটিভনেস ও বেটার কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা চাই।

সমকাল
১৮ মার্চ ২০১৭

চামড়া থেকে সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজন নিশ্চিত করা চাই

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

বাংলাদেশ মুসলিম অধ্যুষিত জনবহুল দেশ। এ বছর কোরবানি হয়েছে আনুমানিক ৮০ লাখ থেকে এক কোটি পশু। কেউ বলেন, কোরবানি হয় আরও বেশি। বহুদিন ধরে গরু ও খাসি কোরবানির চল রয়েছে এ ভূখণ্ডে। হাল আমলে যুক্ত হয়েছে উট। কেন কোরবানির সংখ্যা বাড়ছে? একটি কারণ, টানা কয়েক বছর ধরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের ওপরে থাকা। এর ফলে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকের আয় বাড়ছে। আরেকটি বড় কারণ, বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত আয়। শহর ও গ্রাম সর্বত্র বিপুলসংখ্যক পরিবারে বিদেশ থেকে অর্থ আসে এবং দুই ঈদের প্রাক্কালে তার পরিমাণ বছরের অন্য সময়ের তুলনায় বেশি থাকে। কোরবানির ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা অবশ্যই রয়েছে। একই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সামাজিক কারণ। সাধারণ নির্বাচনের আগের ঈদে কোরবানি বেড়ে যায়, এমন খবর গণমাধ্যমে আসে। আগামীতে দেশে কোরবানি আরও বাড়বে বলেই ধারণা করা যায়।

কোরবানির সময় দেশের চামড়া শিল্পের কাঁচামালের প্রধান অংশ সংগ্রহ করা হয়। এ শিল্পের প্রধান বাজার দেশের বাইরে। ফলে উদ্যোক্তাদের সঙ্গে অনেক দেশের ক্রেতাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। বিশ্ববাজারের ওঠানামার প্রভাবও তাদের ওপর পড়ছে। রফতানি বাজার মন্দা হলে দেশে কাঁচা চামড়ার দাম পড়ে যায়। এ বছর বাজারে কাঁচা চামড়ার ব্যবসায়ীরা ভাল দাম না পাওয়ার পেছনে প্রধান কারণ বলা হয়েছে বিশ্ববাজারে কম চাহিদা। তবে বাংলাদেশেও চামড়ার বড় বাজার রয়েছে। এর পূর্ণ ব্যবহার এখনও হচ্ছে না।

এবার কোরবানির পশুর বড় অংশের যোগান এসেছে দেশীয় সূত্রে। ব্যক্তিগতভাবে, অনেক পরিবার কোরবানির বড় বাজারকে সামনে রেখে পশু পালন করেছে। আবার কিছু পশু এসেছে 'আমদানি-সূত্রে'। দেশের সর্বত্র বসে কোরবানির বাজার। অনলাইনেও এখন পশু কেনাবেচা হচ্ছে।

আমাদের চামড়া শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ঢাকার হাজারীবাগে। এক সময় সেখানে ওয়েট ব্লু উৎপাদন হত এবং সেটিই রফতানি বাজারে চামড়া খাতের প্রধান পণ্য ছিল। এক পর্যায়ে, সরকার ওয়েট ব্লু রফতানি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়। মালিকদের চামড়া প্রক্রিয়াজাত করায় এ সময়ে নানা সহায়তাও দেওয়া হয়। একই সঙ্গে চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন বাড়াতে এগিয়ে আসেন একদল উদ্যোক্তা। তবে দেশে যে পরিমাণ পাকা চামড়া মেলে তার বড় অংশ রফতানি হয়ে যায়। চীনের উদ্যোক্তারা বাংলাদেশের পাকা চামড়া কাজে লাগিয়ে পণ্য উৎপাদন করে প্রচুর মুনাফা করছে।

বিশ্ববাজারে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের কেনাবেচা এখন বছরে প্রায় ২৫০ বিলিয়ন ডলারের। এর মাত্র ০.৪ শতাংশের হিস্যা আমাদের। বছরে এ খাত থেকে আমরা ১১০-১২০ কোটি ডলারের মত আয় করে থাকি। অথচ স্বাধীনতার পর আমাদের পোশাক শিল্প ছিল না। সে সময়ে রফতানি পণ্য বলতে বোঝাত পাট, চামড়া ও চা। দুর্ভাগ্য, এখনও চামড়া প্রায় সেই চার দশকের মাত্রায় রয়ে গিয়েছে। এ খাত থেকে মূল্য সংযোগ কাঙ্ক্ষিত মাত্রার ধারেকাছেও নেই। শিল্পে পরিবেশগত নিয়ম-কানুন মেনে চলার বাধ্যবাধকতাও সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের বিষয়টি নিয়েও তেমন ভাবা হয় না।

কোরবানির সময় কাঁচা চামড়ায় গ্লাভস ছাড়া লবণ লাগাচ্ছে শ্রমিক, এমন দৃশ্য টিভি পর্দায় দেখানো হয়। কাঁধে-পিঠে চামড়া বহনের দৃশ্যও বিরল নয়।

কোরবানির চামড়ার ব্যবসার জন্য ব্যাংকগুলো ঋণ দেয়। এ ব্যবসায় যুক্ত রয়েছে শহর ও গ্রামের বিপুলসংখ্যক মানুষ। তাদের মধ্যে রয়েছে মৌসুমি ব্যবসায়ী, পাইকার, আড়তদার ও শিল্পপতি। অনেক স্থানে ছাত্র-যুবকরাও কয়েক দিনের জন্য চামড়ার ব্যবসায়ে যুক্ত হয়ে পড়ে। মাস্তান-সন্ত্রাসীরাও বাজার থেকে ফায়দা লুটতে সক্রিয় হয় বলে অভিযোগ ওঠে। হাল আমলে চামড়ার বাজার চলে গিয়েছে বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের নিয়ন্ত্রণে, এমনটিই বলা হচ্ছে। তারাই বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বসে প্রতি বর্গফুট কাঁচা চামড়ার দাম ৫০ টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যা গত বছরের তুলনায় পাঁচ টাকা কম। কেন গতবারের তুলনায় দাম কম, তার ব্যাখ্যা হিসেবে বলা

হয়েছে – বিশ্ববাজারে চাহিদা কম। অনেক প্রতিষ্ঠানে গত বছরের স্টক রয়ে গিয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে চামড়া সংরক্ষণের অপরিহার্য উপকরণ লবণের দাম বেশি। রফতানি বাজারের তথ্যে দেখা যায়, গত বছর বিশ্ববাজারে মন্দাভাব ছিল। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য কেনাবেচা কিছুটা কম হয়েছে। তবে বাংলাদেশ থেকে আগের বছরের তুলনায় রফতানি বেড়েছে ৮ শতাংশ।

চামড়া শিল্পের কাঁচামাল যেহেতু দেশের বাজারেই পাওয়া যায়, তাই এ নিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন তুলনামূলক সহজ। প্রতি বছর রফতানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। শিল্পের কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণের যোগান কীভাবে আসবে এবং কোন সমস্যা থাকলে তার সমাধান কীভাবে হবে, সেটি আগেভাগেই নির্ধারিত হওয়া সম্ভব। লবণের ঘাটতি হওয়ার যুক্তি তাই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে কেন সময়মত মনোযোগ প্রদান করা হবে না?

দেশেও এ শিল্পের বড় বাজার রয়েছে। আবার বিশ্ববাজারের সুযোগের সামান্যই আমরা কাজে লাগাতে পারছি। যেহেতু আমাদের কাঁচামাল রয়েছে এবং আগামীতে তার সরবরাহ বাড়বে; তাই শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্পোদ্যোক্তা, চামড়ার ব্যবসায়ী-সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের জন্যই করণীয় রয়েছে।

সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে একটি প্রস্তাব আমরা রাখতে পারি – যতদিন পাকা চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রফতানির জন্য দেশে প্রাপ্ত চামড়ার পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না, ততদিন ওয়েট ব্লু রফতানির সুযোগ প্রদান। এটি অবশ্যই সীমিত পরিসরে হতে হবে। এ সময়ে চামড়া শিল্পের বিকাশের প্রয়োজনে ওয়েট ব্লু রফতানি বন্ধ থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এবং তার সুফল মিলেছে। এখন পশু কোরবানি বেড়েছে এবং বছরের অন্যান্য সময়েও চামড়ার সরবরাহ সন্তোষজনক। এ কারণে সম্ভবত সংগঠিত শিল্পের চাহিদার বাইরে কিছু সংখ্যক চামড়া থেকে যাচ্ছে। এর প্রভাবে কাঁচা চামড়ার দাম পড়ে যাচ্ছে, যা এ চামড়ার ওপর নির্ভরশীল লোকদের ক্ষতি করছে। এ পদক্ষেপ চোরাপথে চামড়া পাচার বন্ধেরও সহায়ক হবে।

কোরবানি ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের অপরিহার্য অংশ। একই সঙ্গে পশু কেনাবেচা ও চামড়া অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দুইয়ের সমন্বয় সাধনে তাই সংশ্লিষ্টদের আরও বেশি মনোযোগী হওয়া চাই। সব পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণও গুরুত্বপূর্ণ। কোরবানি কিংবা অন্য সময়ের একটি চামড়াও যেন নষ্ট না হয় এবং প্রতিটি চামড়া থেকে সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজন সম্ভব – এটি নিশ্চিত করায় আমাদের মনোযোগী হতে হবে।

এ শিল্পের সঙ্গে পরিবেশের বিষয়টিও জড়িত। এর উন্নতি না ঘটলে চামড়া শিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা সম্ভব নয়। আমাদের হাজারীবাগ কিংবা পোস্তার যে পরিবেশ তাতে উন্নত বিশ্বের কেউ সেখানে বিনিয়োগে আকৃষ্ট হবেন না। চামড়া শিল্প সাভারে স্থানান্তরের জন্য যেসব বিষয় বিবেচনায় ছিল তার মধ্যে অন্যতম এই বিদেশি বিনিয়োগ। আমাদের এ খাত থেকে অবশ্যই মূল্য সংযোজন বাড়াতে হবে। এ শিল্পের বিশাল বাজার ছড়িয়ে আছে সমগ্র বিশ্বে। অন্যদিকে, আমাদের রয়েছে পর্যাপ্ত কাঁচামাল। শিল্পেও আমাদের দক্ষতা বাড়ছে। তাহলে কেন আমরা বাজারে নিজেদের অবস্থান সংহত করতে পারব না?

সমকাল

২১ সেপ্টেম্বর ২০১৬

বিজিএমইএকে আরও পরিণত হতে হবে

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

ক্রেতাদের জোট অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের কারখানা পরিদর্শন কার্যক্রমের সমালোচনায় নেমেছেন পোশাকশিল্পের মালিক ও একাধিক মন্ত্রী। অ্যালায়েন্সও এক বিবৃতিতে সরকারকে পরিষ্কার অবস্থান জানাতে বলেছে। অ্যাকর্ড-বিজিএমইএ গত বুধবার বৈঠক করেছে। এসব বিষয়ে প্রথম আলোর সঙ্গে কথা বলেছেন সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম।

প্রথম আলো: বিজিএমইএর নেতারা ক্রেতাদের জোট অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, এসব গলার কাঁটা। এসব কথাবার্তায় সমস্যা বাড়বে, নাকি কমবে?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: পোশাক কারখানার পরিদর্শন ও সংস্কার কার্যক্রম নিয়ে কারখানার মালিকেরা এক ধরনের চাপের মধ্যে রয়েছেন। এ সময় রপ্তানির নিম্নমুখী প্রবৃদ্ধিও দুশ্চিন্তার কারণ। এটি সত্যি, যে কোন সংস্কারই কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল। এসবের প্রতিক্রিয়া পোশাক কারখানার চেয়ে ছোট, মাঝারি বা সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানার ওপর বেশি। সব মিলিয়ে তাদের অস্থিরতা অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের সমালোচনা করার মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে। তবে সংগঠন হিসেবে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ-র আরও পরিণত আচরণ প্রয়োজন। সংগঠনের সদস্য কারখানার মালিকদের সংস্কার কার্যক্রম সময়মত শেষ করতে চাপ দেওয়া দরকার। মনে রাখতে হবে, সংস্কারকাজে দীর্ঘসূত্রতা কাঙ্ক্ষিত ফল প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। সংগঠন দু'টির পাশাপাশি সরকারের শীর্ষপর্যায়ের ব্যক্তিদের কোন প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নিয়ে মন্তব্য করার ক্ষেত্রে সরকারের দীর্ঘমেয়াদি অঙ্গীকার ও চুক্তির বিষয়গুলো মনে রাখা প্রয়োজন। অ্যাকর্ড-

অ্যালায়েন্সের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে উদ্ভুত পরিস্থিতি সমাধানে অগ্রসর না হয়ে অন্য উপায়ে গেলে সমস্যা বাড়াবে বৈ কমবে না।

প্রথম আলোঃ অ্যালায়েন্স অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারকে তার অবস্থান পরিষ্কার করতে বলেছে। সরকারের কী করা উচিত?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেমঃ অ্যালায়েন্স-প্রধানের সাম্প্রতিক বিবৃতিতে, কারখানা পর্যায়ের সংস্কারকাজে নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতা নিশ্চিত করার ব্যাপারে সরকারের অবস্থান পরিষ্কার করার কথা বলা হয়েছে। অর্থমন্ত্রীর মন্তব্য সরকারের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া না হলেও শীর্ষপর্যায়ের ব্যক্তি হিসেবে একে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হচ্ছে। এখানে মনে রাখা দরকার, সরকার যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া কর্মসূচি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে অ্যালায়েন্সের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। একইভাবে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আইএলওর সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী অ্যাকর্ডের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ। এসব চুক্তির অধীনে গৃহীত কাজের অগ্রগতি সরকার নিয়মিতভাবে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে অবহিত করছে। এ রকম ক্ষেত্রে, সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে যে কোন মন্তব্য চুক্তি বাস্তবায়নে তার অবস্থানকে দুর্বল করে। সরকারের উচিত হবে তার অবস্থান শক্তভাবে তুলে ধরা। যে কোন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকারের উচিত হবে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে উৎসাহিত করা।

প্রথম আলোঃ পোশাক-মালিকেরা বলছেন, দুই জোটের কার্যক্রমের কারণে জটিল সময় পার করছেন তাঁরা। এই বক্তব্য কতটা যুক্তিযুক্ত?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেমঃ অ্যাকর্ড-অ্যালায়েন্সের কারখানা পরিদর্শনে বিভিন্ন রকমের ত্রুটি চিহ্নিত হয়েছে। সংশোধন পরিকল্পনা অনুসারে ত্রুটি সমাধানে কারখানাগুলোকে বেশ বিনিয়োগ করতে হচ্ছে। রফতানি প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক না হওয়ায় সীমিত আয়ের মধ্যে থেকে এ বাড়তি বিনিয়োগ করতে বেগ পেতে হচ্ছে। পাশাপাশি সংস্কারের অংশ হিসেবে ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন, আইনি সংস্কার ও বাস্তবায়ন, কারখানা পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন চালু এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক কমিটি চালু করতে হচ্ছে। সার্বিকভাবে, কারখানা মালিকদের জন্য সময়টা জটিল ও কষ্টসাধ্য। তবে এসব সংস্কার নেতিবাচকভাবে দেখার সুযোগ নেই।

প্রথম আলোঃ পোশাকের রপ্তানি ২০২১ সালে পাঁচ হাজার কোটি ডলারে নিয়ে যেতে অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স কি কোন ভূমিকা রাখতে পারে?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: পাঁচ হাজার কোটি ডলার রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে শুরুর বছরেই দুর্বল প্রবৃদ্ধির কারণে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিজিএমইএ বা বিকেএমইএর যে ধরনের কর্মপরিকল্পনা নেওয়া প্রয়োজন ছিল, তা এখনো অনুপস্থিত। এ জন্য পণ্য রপ্তানির পরিমাণের প্রবৃদ্ধির ওপর নয়, বরং গুণগতমানের উচ্চমূল্যের পণ্য উৎপাদন করতে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। আর এ ক্ষেত্রে যে ধরনের কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা দরকার, তার জন্য বর্তমানে চলমান সংস্কারের গুরুত্ব আছে। তাই অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের কার্যক্রম গুরুত্বের সঙ্গে শেষ করে বিশ্বে নতুন বার্তা দেওয়া খুবই প্রয়োজন।

প্রথম আলো
২৭ জুন ২০১৫

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন: শুভংকর কর্মকার

ট্যানারি পল্লী বাস্তবায়ন কাজ সমন্বিতভাবে হচ্ছে না

মোস্তাফিজুর রহমান

রাজধানীর হাজারীবাগ থেকে ট্যানারি শিল্প সাভারে স্থানান্তরের কাজ চলছে। সাভারের হেমায়েতপুরে নতুন আঙ্গিকে ট্যানারি পল্লী গড়ে তোলা হলেও এর বাস্তবায়ন কাজ সমন্বয়হীনভাবে হচ্ছে বলে মনে করছেন গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান। সকালের খবরকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, নতুন ট্যানারি পল্লীতে ট্যানারি মালিক, শ্রমিক এবং এর সহযোগী শিল্প মালিকরাও যাতে যেতে পারে এবং সমান সুবিধা পেতে পারে সেভাবেই বাস্তবায়ন করার কথা ছিল। কিন্তু এখন সেভাবে করা হচ্ছে না। এর ফলে ট্যানারি শিল্পের স্থানান্তর কাজ আরও বিলম্বিত হচ্ছে। এ বিষয়ে তিনি আরও অনেক কথা বলেছেন। তার সাক্ষাৎকারের বিশেষ অংশ নিচে দেওয়া হল। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সকালের খবরের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক এসএম আলমগীর।

সকালের খবর: রাজধানীর হাজারীবাগ থেকে ট্যানারি শিল্প সাভারে সরিয়ে নেওয়ার কাজ চলছে। কিন্তু ১২ বছর আগে এ প্রকল্প নেওয়া হলেও আজও স্থানান্তর কাজ সম্পন্ন হয়নি। বিষয়টি আপনি কীভাবে দেখছেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: ট্যানারি শিল্প বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময় শিল্প। কিন্তু শিল্পটি পরিবেশসম্মত না হওয়ায় অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শিল্পটির যেভাবে বিকাশ ঘটার দরকার ছিল সেভাবে হয়নি। অনেক সমালোচনা এবং বিদেশি ক্রেতাদের চাপে পড়ে

সরকার ট্যানারি শিল্প হাজারীবাগ থেকে সাভারে স্থানান্তরে প্রকল্প গ্রহণ করে। কিন্তু শুরু থেকেই এ প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরে কাজ হয়েছে। এখনও একই অবস্থা বিরাজ করছে। যদিও গত কয়েক বছরের তুলনায় ইদানীং সাভারের ট্যানারি পল্লী প্রকল্পের কাজে কিছুটা গতি এসেছে, কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয়। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ট্যানারি পল্লী বাস্তবায়ন কাজ সমন্বিতভাবে হচ্ছে না। আমরা যতটা জানি, ট্যানারি পল্লী প্রকল্প যখন গ্রহণ করা হয় তখন এ খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার কথা বিবেচনা করেই প্রকল্প নেওয়া হয়। অর্থাৎ ট্যানারি মালিক, ট্যানারি শ্রমিক এবং এ খাতের সহযোগী ব্যবসায়ীদের জন্যও সেখানে জায়গা দেওয়ার কথা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেখানে কেবল ট্যানারি মালিকদের জন্য প্লট দেওয়া হয়েছে। সুতরাং সেখানে সমন্বিতভাবে কাজ করা হচ্ছে না। যা শিল্পের স্থানান্তর কাজ আরও বাধাগ্রস্ত করবে।

সকালের খবর: শুধু ট্যানারি মালিকদের প্লট দেওয়ায় ট্যানারি শ্রমিক এবং সহযোগী শিল্প মালিকরা কী ধরনের ক্ষতির মুখে পড়বে বলে আপনি মনে করেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: ট্যানারি শ্রমিক বা সহযোগী শিল্প মালিকরা কতটা ক্ষতির মুখে পড়বে তার চেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এ পুরো ট্যানারি শিল্প। কারণ ট্যানারি, ট্যানারি শ্রমিক এবং সহযোগী কেমিক্যালসহ অন্য ব্যবসায়ীরা একে অপরের পরিপূরক। ট্যানারি পল্লীতে শুধু ট্যানারি মালিকদের পুনর্বাসন করলে তো হবে না। অন্যদের কথাও বিবেচনা করতে হবে। কারণ প্রায় ৩০-৩৫ হাজার শ্রমিক কাজ করে ট্যানারি শিল্পের সঙ্গে। তারা কোথায় যাবে?

সকালের খবর: ট্যানারি শিল্প স্থানান্তরের জন্য সরকার ২৫০ কোটি টাকার সহায়তা তহবিল গঠন করেছে। এই টাকারও পুরোটাই দেওয়া হচ্ছে শুধু ট্যানারি মালিকদের। এ বিষয়টি আপনি কীভাবে দেখছেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: ট্যানারি স্থানান্তরের জন্য ট্যানারি মালিকদের অনেক অর্থ ব্যয় করতে হবে। এর জন্য সরকার যে তহবিল রেখেছে সেটির দরকার ছিল। তবে এই তহবিলের অর্থ যাতে সবাই সমানভাবে পায় সেটি নিশ্চিত করা দরকার। বিশেষ করে, অনেক ট্যানারি মালিক রয়েছে যারা আর্থিকভাবে কিছুটা দুর্বল। ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে যেন তাদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। এ ছাড়া ট্যানারি মালিকদের যেমন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে তেমনি শ্রমিক এবং সহযোগী ব্যবসায়ীদেরও ক্ষতিপূরণ দেওয়া দরকার।

সকালের খবর: ট্যানারি শিল্প স্থানান্তরে দেরি হওয়ার কারণে পুরো ট্যানারি শিল্পে কী ধরনের ক্ষতি হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: সবচেয়ে বড় বিষয়, ট্যানারি শিল্প স্থানান্তরে দেরি হওয়ায় বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় চামড়া শিল্পের বাজার হাতছাড়া হচ্ছে। আমার জানা মতে, ইউরোপের বেশ কয়েকটি ক্রেতা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ থেকে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য নেওয়া কমিয়ে দিয়েছে। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার, ইউরোপীয় ইউনিয়ন কিন্তু বেশ কয়েক বছর আগে থেকে সতর্কবার্তা দিয়ে যাচ্ছে। তারা বলেছে, পরিবেশবান্ধব ট্যানারি না হলে ইউরোপের কোন দেশ বাংলাদেশ থেকে চামড়া নেবে না। তারা ২০১৪ সালের মধ্যে ট্যানারি সরানোর সময় বেঁধে দিয়েছিল। কিন্তু সে সময়ের মধ্যে করা যায়নি। এ কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়ন সময় বাড়িয়েছে আরও বছরখানেক। এই সময়ের মধ্যে ট্যানারি স্থানান্তর না হলে তারা হয়ত আর সময় দেবে না। আর ইউরোপীয় ইউনিয়ন যদি বাংলাদেশের বাজার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে সেটি হবে এ শিল্পের জন্য বিশাল আঘাত। আশা করব সরকার এবং ট্যানারি মালিকরা বিষয়টি উপলব্ধি করে দ্রুত ট্যানারি স্থানান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।

সকালের খবর: ট্যানারি শিল্প যদি স্থানান্তর হয়ে যায় এবং সাভারে সম্পূর্ণ পরিবেশসম্মতভাবে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন হয় তাহলে এ শিল্পের সম্ভাবনা কেমন দেখছেন আপনি?

মোস্তাফিজুর রহমান: আমি তো মনে করি, ট্যানারি শিল্প হতে পারে গার্মেন্ট শিল্পের মত বাংলাদেশের আরেকটি বৃহৎ খাত। কেননা, সাভারে পুরো দমে ট্যানারির কাজ শুরু হলে সেখানে এবং এই ট্যানারি পল্লীকে ঘিরে প্রচুর বিনিয়োগ হবে। অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। শুধু দেশি বিনিয়োগকারী নয়, অনেক বিদেশি বিনিয়োগও আসবে এ খাতে। দেশের রফতানি আয়ে অন্যতম বৃহৎ খাত হিসাবে অবদান রাখার শক্তি ও সম্ভাবনা আছে এখাতের। এই সুযোগ কাজে লাগাতে হলে দ্রুত ট্যানারি শিল্প সাভারে স্থানান্তর করা দরকার, প্রয়োজন পরিবেশবান্ধব উৎপাদন, প্রয়োজন শ্রমিক-কর্মচারীর সুবিধা নিশ্চিত করা, দরকার উৎপাদনের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি।

সকালের খবর
১৯ এপ্রিল ২০১৫

অধ্যায় ৪

আঞ্চলিক সহযোগিতা ও বৈদেশিক সম্পর্ক

বিশেষজ্ঞ মন্তব্য

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক বিকাশকে যদি ত্বরান্বিত করতে হয়, তাহলে অর্থনীতির কাঠামোগত যেসব সমস্যা রয়েছে, সেগুলোকে চিহ্নিত করে তার সমাধান করতে হবে। সে জন্য আমরা মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার চেয়ে স্বল্পোন্নত দেশ হওয়ার বিষয়টি বেশি গুরুত্ব দিয়ে বলেছি। সে কারণেই আয় বাড়ানোর পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতার দিকেও মনোযোগী হওয়ার কথা বলছি।

দ্বিতীয়ত, মধ্যম আয়ের দেশের এই ধারণা এমন একটি আত্মতৃপ্তির সৃষ্টি করে যে মধ্যম আয় হলেই কিংবা ১০০০-১২০০ ডলার আয় হয়ে গেলেই আমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। পৃথিবীতে এখন গড়ে ৫৫-৫৬ বছরের চেয়ে কম কোন মধ্যম আয়ের দেশ নেই। সবচেয়ে ত্বরান্বিতভাবে যে দেশ মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উচ্চ আয়ের দেশের দিকে গিয়েছে, তার লেগেছে ২৬ বছর। ছোট দেশ হিসেবে আগে গিয়েছে মালটা, তারপর গিয়েছে জাপান, তারপর গিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। সেটি গিয়েছে আশির দশকে।

পুরো লাতিন আমেরিকা, ব্রাজিল, ইকুয়েডর থেকে শুরু করে সবাই ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে মধ্যম আয়ের দেশে রয়েছে। তারা একটি ফাঁদে (ট্র্যাপ) আছে। ফাঁদটা হল, তাদের কাঠামোগত সমস্যাগুলোর সমাধান হচ্ছে না। প্রথম যে জিনিসটার সমাধান হয় না, সেটি হল অবকাঠামো। দ্বিতীয়ত আছে, পাবলিক সার্ভিস। এরপর স্যানিটেশন। এরপর অপরিকল্পিত নগরায়ণ। সামাজিক বিভিন্ন সমস্যারও সমাধান হয় না। এর সঙ্গে আছে সুশাসনের সমস্যা। এখন যে একটি কথা বলা হয়, মধ্যম আয়ের দেশ হলে আমরা বিরাট হব। মধ্যম আয়ের দেশ হলে ঢাকার এই যানজট আমাদের সঙ্গেই

থাকবে। এর সঙ্গে পুষ্টিহীনতাও থাকবে। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুও থাকবে এবং এর সঙ্গে দুর্নীতিও থাকবে। আমার দৃষ্টিতে, আরেকটু সামগ্রিকতার নিরিখে লক্ষ্য ঠিক করা উচিত। আয় বৃদ্ধিই উন্নয়ন নয়। প্রবৃদ্ধির সুফল গড়িয়ে নিম্ন আয়ের মানুষের কাছে যাওয়ার যে তত্ত্ব, তা মোটামুটিভাবে বাতিল হয়ে গিয়েছে সেই ষাটের দশকেই। কারণ, অনেক দেশই প্রবৃদ্ধি বাড়ালেও তাতে দারিদ্র্য তেমন কমাতে পারেনি, বরং বৈষম্য বেড়ে যায়। সত্তরের দশকে এ নিয়ে অর্থনীতিবিদেরা গবেষণা করে দেখান, অনেক দেশে প্রবৃদ্ধি বাড়লেও এর সুফল দরিদ্র মানুষেরা পাননি। অনেক দেশে বৈষম্য বেড়েছে, অপূর্ণাঙ্গ কর্মসংস্থান বেড়েছে কৃষি খাতে এবং সাধারণ মানুষের জীবনমানেরও অবনতি ঘটেছে।

সত্তরের দশকেই অর্থনীতিবিদেরা এটি মেনে নেন যে, কেবল মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি একটি দেশের উন্নয়নের সঠিক বা যথাযথ নির্দেশক নয়। এরপরই উন্নয়ন তত্ত্বে পুনর্বণ্টন এবং সামাজিক সূচক বিষয়টি গুরুত্ব পায়। অথচ মধ্যম আয়ের দেশ হতে হলে এখনো কেবল মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিকেই সূচক হিসেবে গণ্য করা হয়।

মধ্যম আয়ের ফাঁদ

কেবল আয় বাড়িয়ে মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার পর 'মধ্যম আয়ের ফাঁদ'-এ পড়ে আছে অসংখ্য দেশ। এর মধ্যে এমন অনেক দেশও আছে, যারা দ্রুত আয় বাড়িয়ে দ্রুত মধ্যম আয়ের দেশ হতে পেরেছে। কিন্তু কয়েক দশক চলে যাওয়ার পরও দেশগুলো আর উচ্চ আয়ের দেশ হতে পারেনি। এর মধ্যে লাতিন আমেরিকার দেশগুলো আটকে আছে বহুদিন ধরে। সবচেয়ে বড় উদাহরণ – ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকা। এমনকি চীন ও রাশিয়াও আটকে আছে মধ্যম আয়ের ফাঁদে। মূলত যারা কেবল আয় বাড়াতেই মনোযোগ দিয়েছে বেশি, অবকাঠামো, শিক্ষাসহ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও রফতানির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামুখী থাকার দিকে নজর দেয়নি, তারাই আটকে আছে এই ফাঁদে। ফাঁদে না পড়ার সবচেয়ে ভাল উদাহরণ দক্ষিণ কোরিয়া।

বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ: মধ্যম আয়ের দেশ হতে বাংলাদেশের দুর্বলতা আছে। তাই যা দূর করতে হবে –

১. দুর্বল অবকাঠামো
২. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব
৩. উৎপাদন খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সীমিত সাফল্য
৪. দুর্বল অর্থনৈতিক শাসন পরিচালনা

৫. দ্রুত ও অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং
৬. বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের অভিঘাত

বিজিএমইএর উদ্যোগ

মধ্যম আয়ের দেশ হতে বিজিএমইএ ৫০ বিলিয়ন ডলার রফতানি করতে চায় ২০২১ সাল নাগাদ।

প্রথম আলো
১ জানুয়ারি ২০১৫

বহুমাত্রিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ় হবে

মোস্তাফিজুর রহমান

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বহুমাত্রিক। বাণিজ্য, বিনিয়োগ, সেবা খাত, যোগাযোগ – অনেক বিষয় নিয়েই এ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফরের মধ্য দিয়ে এ সম্পর্ক নতুন মাত্রা ও গতি পাবে, এমন প্রত্যাশাই যৌক্তিক। এ সময়ে নতুন কিছু চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবে আশা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ও ভারতের অর্থনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে যে কোন আলোচনাতেই ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ঘাটতির প্রসঙ্গটি উঠে আসে। বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান আমদানি উৎস ভারত। বৈধ পথ ছাড়াও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অবৈধ বাণিজ্য আছে, যার মধ্যে বৈধ পণ্য ও অবৈধ পণ্য দু'টিই আছে। বাংলাদেশ ভারত থেকে বছরে ৬৫০ কোটি ডলারের মত পণ্য আমদানি করে; ভারতে রফতানি করে মাত্র ৫০ কোটি ডলার মূল্যের পণ্য। অর্থাৎ বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ঘাটতি প্রায় ৬০০ কোটি বা ছয় বিলিয়ন ডলারের মত।

একথা জানা যে, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ঘাটতির বিষয়টিকে গভীরভাবে খতিয়ে দেখা দরকার। ভারত থেকে আমাদের আমদানি বেশি হচ্ছে কারণ ভারতীয় পণ্যের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়ছে, ভারতের অনুকূলে ট্রেড-ডাইভারশান হচ্ছে। এর ফলে ভোক্তা সুবিধা পাচ্ছেন, উৎপাদক সুবিধা পাচ্ছে, রফতানির জন্য কাঁচামাল আমদানিতে (যেমন তৈরী পোশাক খাতের জন্য তুলা, সুতা, কাপড় আমদানি) সুবিধা হচ্ছে। ভারত থেকে আমদানির একটা উল্লেখযোগ্য অংশ রফতানিমুখী শিল্পখাতের কাঁচামাল হিসাবে যাচ্ছে। দ্বিপাক্ষিক নয়, বৈশ্বিক রফতানি ভারসাম্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ভারতে আমাদের রফতানি বৃদ্ধি করতে হবে সে বিষয়েও আমাদের সচেষ্ট থাকতে হবে, সম্ভাব্য সুযোগের সদ্ব্যাবহার করতে হবে। বৈধ পথের সমান্তরালে সংগঠিত অবৈধ বাণিজ্যের বাংলাদেশ

এখন ভারতে অস্ত্র এবং মাদক ও তামাক জাতীয় দ্রব্য (২৫টি পণ্য) বাদে যে কোন ধরনের পণ্য শূন্য-শুল্কে রফতানি করতে পারে। কিন্তু এ সত্ত্বেও বাণিজ্য ভারসাম্য বিপুলভাবেই ভারতের অনুকূলে রয়ে গিয়েছে যদিও রফতানি কিছুটা বেড়েছে। এবারের শীর্ষ বৈঠকে বাণিজ্য ভারসাম্য হ্রাসের ইস্যুটিও উঠে আসবে তাতে সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশ ও ভারত সার্কের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। বিসিআইএম এবং বিমসটেকেরও সদস্য এ দু'টি দেশ। তাই দ্বিপক্ষীয় ছাড়াও উপ-আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক ফোরামের মাধ্যমে দু'দেশের সম্পর্ক আরও বিকশিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। ভারত বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী। এজন্য তারা বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা চাইছে। এর আগে ভারত বাংলাদেশকে ১০০ কোটি ডলার ঋণ দিয়েছিল, যার মধ্যে ২০ কোটি ডলার অনুদান ঘোষণা করা হয়। বিভিন্ন ক্রয়, সরবরাহ-সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বিনিয়োগে এ অর্থ ব্যয় হবে। এ অর্থ পদ্মা সেতুতে ব্যয় হচ্ছে। বাকি ৮০ কোটি ডলারের জন্যও সুদ ধরা হয়েছে স্বল্প হারে এবং পরিশোধের মেয়াদ দীর্ঘ। এটিও জানা গিয়েছে যে, ভারত আরও ২০০ কোটি ডলার ঋণ প্রদানে সম্মত। দুই প্রধানমন্ত্রীর আলোচনায় এ দ্বিতীয় লাইন অব্ ক্রেডিট-এর বিষয়টি চূড়ান্ত হতে পারে। সব মিলিয়ে বলা যায়, সম্পর্ক নিবিড় করার আকাঙ্ক্ষা দুই তরফেই রয়েছে। এমন প্রেক্ষাপটেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দু'দিনের সফরে আজ শনিবার ঢাকা আসছেন।

জানা যে, ভারত এ অঞ্চলে, ও বৈশ্বিক পরিমাপেও, বড় অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হতে চলেছে। আমাদেরই আরেক নিকট প্রতিবেশী চীন কেবল জনসংখ্যার হিসাবেই শীর্ষে নয়, ক্রয়-ক্ষমতার নিরীখে জিডিপিতেও বিশ্বের এক নম্বর অর্থনৈতিক শক্তি। এ দু'টি দেশের সঙ্গেই বাংলাদেশের সুসম্পর্ক রয়েছে। এবং তা কাজে লাগিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশকে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ এবং এ বিষয়টি প্রতিবেশী দেশ তো বটেই, উন্নত বিশ্বও অবহিত। আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং বিশ্বে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তোলার কাজে আমরা এ আগ্রহকে ও আমাদের ভৌগোলিক অবস্থানকে কাজে লাগাতে পারি। বাংলাদেশ ট্রান্স-এশীয় সড়ক ও রেলপথের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বঙ্গোপসাগরে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করার আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের যে প্রকল্পের বাস্তবায়নে একাধিক বন্ধু দেশ অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করতে ইচ্ছুক। এসব বৃহৎ অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করতে হবে বড় ভাবে। শুধু বাংলাদেশের কথা ভাবলে চলবে না, তা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনকও হবে না। প্রতিবেশী দেশগুলির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের ও বাণিজ্য সুবিধা বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে এগুলিকে বিবেচনা করতে হবে।

চীনের দক্ষিণ অংশের বিশাল ভূখণ্ড, ভারতের উত্তর-পূর্ব অংশের বিভিন্ন রাজ্য, নেপাল, ভুটান – সবাই যদি তাদের আমদানি ও রফতানি বাণিজ্যের জন্য বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর এবং রেল, নৌ ও সড়ক অবকাঠামো ব্যবহার করে, তাহলে এসবের বিনিয়োগ থেকে সর্বোত্তম সুফল মিলবে। তবে এটিও মনে রাখা চাই যে, আমাদের আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ অবকাঠামো সুবিধা এখন পর্যন্ত বেশ দুর্বল। বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক চাহিদার নিরীখেও তা অপর্যাপ্ত। আঞ্চলিক অর্থনীতির প্রয়োজনে এ অবকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে হবে, অনেক উন্নত করতে হবে এবং আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের একটি বড় ক্ষেত্র হিসেবে একে চিহ্নিত করতে হবে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি জনপ্রিয় স্লোগান হচ্ছে – মেক ইন ইন্ডিয়া। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক উন্নত করার এ ধারা অব্যাহত থাকলে মেক ইন ইন্ডিয়ার কর্মসূচির সঙ্গে বাংলাদেশও সংযুক্ত হতে পারে। বর্তমান পৃথিবীতে, অর্থনীতিতে ভ্যালু চেইন জনপ্রিয় ধারণা। বাংলাদেশেও এর আওতায় ভারতের উদ্যোক্তাদের জন্য বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে, এবং ভ্যালু চেইন সমূহে যুক্ত হতে পারে।

ভারত যে বাংলাদেশের পণ্য রফতানিতে 'শূন্য শুল্ক' সুবিধা দিয়েছে সেটি প্রত্যাশিত মাত্রায় কার্যকর হতে না পারার একটি প্রধান কারণ অশুল্ক বাধা বা এনটিবি। এ বাধা দূর করায় ভারত ও বাংলাদেশ উভয়কেই পদক্ষেপ নিতে হবে। আমাদের দুই দেশের ৯০ শতাংশ বাণিজ্য হয় স্থলপথে। কিন্তু বেনাপোল এবং অন্যান্য ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশনে অবকাঠামো এখন পর্যন্ত অত্যন্ত দুর্বল। সড়কপথ মানসম্মত করা ছাড়াও সেখানে কাস্টমস এবং পণ্যের মান যাচাইসহ বিভিন্ন সুবিধা উন্নত করার আলোচনা অনেক দিন ধরেই চলছে। এবারে সফরে এসব বিষয়ে সমন্বিত পদক্ষেপের বিষয়ে দু'দেশ সম্মত হবে বলে আশা রাখি। পণ্যের মানের বিষয়ে বাংলাদেশের সক্ষমতা বাড়ানোর বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। পণ্যমান সুরক্ষা, সীমান্তে অবকাঠামো নির্মাণ, বাণিজ্য সহায়ক পদক্ষেপ, পারস্পারিক মানের গ্রহণযোগ্যতার নিশ্চিতকরণ – এসব বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে।

ভারত ইতিপূর্বে বাংলাদেশকে যে ১০০ কোটি ডলার সহায়তা দিয়েছে তার একটি অংশ এসব কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ধরনের সুবিধা আরও ব্যাপকতর করার আলোচনা চলছে বলে জেনেছি। অশুল্ক বাধা দূর করার সঙ্গে এসবের সম্পর্ক রয়েছে। বাণিজ্য বাড়াতে রেল ও সড়কপথের উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ভারত থেকে নতুন যে ঋণ সহায়তা পাওয়া যেতে পারে তার প্রধান অংশ এসব কাজে ব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অবকাঠামোর সাথে সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে আশুগঞ্জ থেকে কলকাতার নৌপথের সংযোগকে শক্তিশালী করা। এ পথের নাব্যতা বাড়াতে ব্যাপক কর্মসূচি নিতে

হবে। এ বিনিয়োগে অর্থের যোগান দিতে পারে ভারত। আশুগঞ্জ থেকে আগরতলার সড়ক ও রেলপথ উন্নয়নের লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। বাণিজ্য এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ও বিশেষত: কানেকটিভিটির ক্ষেত্রেও মাশুল-চার্জ কী হারে নির্ধারিত হবে সেটি গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য কিছু কাজ ইতিমধ্যে অগ্রসর করা আছে। এর সঙ্গে বাংলাদেশ ও ভারত ছাড়াও নেপাল ও ভুটান জড়িত। ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহার করে ওই দু'টি দেশের পণ্য বাংলাদেশে প্রবেশ করবে, এমন সমঝোতা হয়েছে। নেপাল ও ভুটানের পণ্য বাংলাদেশের বন্দর ব্যবহার করে তৃতীয় দেশে আমদানি-রফতানির ক্ষেত্রে ভারতের আপত্তি নেই। এ সিদ্ধান্ত আঞ্চলিক সম্পর্ক উন্নয়নেও সহায়ক হবে।

জ্বালানি ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই ফলপ্রসূ সহযোগিতা শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি হচ্ছে। ত্রিপুরার পালাটানা থেকেও বিদ্যুৎ আসবে। এ কেন্দ্র নির্মাণে বাংলাদেশ সহায়তা দিয়েছে। বাংলাদেশে কয়লাভিত্তিক বড় বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনেও ভারত সহায়তা দিচ্ছে। অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বাণিজ্য, উভয় ক্ষেত্রেই দুই দেশ সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। আমরা আশা করব যে, এবারের শীর্ষ পর্যায়ের সফরের মাধ্যমে এ সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে আলোচনা হবে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে উদ্বৃত্ত যে জ্বালানি সম্পদ রয়েছে কিংবা যে নতুন বিদ্যুৎ সৃষ্টি করা সম্ভব, তার অংশীদার হতে বাংলাদেশ আগ্রহী এবং ভারতেরও সে সরবরাহ সক্ষমতা আছে। এ পারস্পারিক আগ্রহ ও চাহিদা-সরবরাহের উপর ভিত্তি করে একটি আঞ্চলিক বিদ্যুৎ গ্রিড স্থাপন করতে পারলে উভয় দেশের জন্যই তা লাভজনক।

বাংলাদেশে ভারতের বিনিয়োগ এখনও সীমিত পরিসরে রয়েছে। যেহেতু বাংলাদেশকে প্রদত্ত শূন্য শুল্ক সুবিধার সামান্যই এখন পর্যন্ত কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে, এ সুবিধা বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের গ্রহণ করতে উৎসাহিত করতে হবে। তেমনি, ভারতের উদ্যোক্তারাও যাতে ভারতের বাজারে বাণিজ্য সুবিধা গ্রহণ করে বেশি পরিমাণে পণ্য রফতানি করতে পারে সে লক্ষ্যে শিল্প-বাণিজ্য খাতে বিনিয়োগ করতে পারেন, সেজন্য প্রণোদনা ও উৎসাহ দিতে হবে। এভাবে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস করা সম্ভব। এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিনিয়োগকারীরাও এ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। ভারত বছরে ৪৫ হাজার কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করে। এর মধ্যে বাংলাদেশের অংশ মাত্র ৫০ কোটি ডলারের মত। বাংলাদেশে পণ্য উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি করার উপরে ভারতে রফতানি বৃদ্ধি নির্ভরশীল। ভারতের উদ্যোক্তারা চাইছেন বাংলাদেশে তাদের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা, যেখানে ভারতের উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ করবেন। উৎপাদন হবে বাংলাদেশে, আর রফতানির গন্তব্যস্থল হবে ভারত

কিংবা তৃতীয় কোন দেশ। বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বিনিয়োগেও ভারতীয় উদ্যোক্তাদের আগ্রহ আছে।

এটিও মনে রাখতে হবে যে, বর্তমান বিশ্ব হচ্ছে প্রতিযোগিতার বিশ্ব। এক দেশের পণ্য অন্য দেশের বাজারে প্রবেশ করতে পারে কেবল মূল্য ও মানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই। যত বন্ধু দেশই হোক, কেউ এ ক্ষেত্রে ছাড় দেবে না। সরবরাহ সক্ষমতা, প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ও পণ্য সময়মত গন্তব্যে পৌঁছানো তিনটিই গুরুত্বপূর্ণ। বাণিজ্য সম্পর্ক জোরালো করতে হলে এসব বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে। দুই দেশের শীর্ষ নেতৃত্ব নিশ্চয় এসব ইস্যু সম্বন্ধে ভালোভাবেই অবগত। নরেন্দ্র মোদি ব্যবসা-বাণিজ্যবান্ধব নেতা হিসেবে সুপরিচিত। বাংলাদেশের সাথে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ থাকবে। দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক শক্তিশালী হলে ভূরাজনৈতিক সম্পর্কেও তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে, এটিও তিনি নিশ্চয়ই জানেন। উভয় দেশই শান্তিপূর্ণ ও সহযোগিতার পরিবেশে উন্নয়নে আগ্রহী। আমরা ভারতের সাথে এমন দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক চাই যাতে উভয় দেশ লাভবান হতে পারে। নরেন্দ্র মোদির এবারের বাংলাদেশ সফর এ লক্ষ্য অর্জনে মাইলফলক হয়ে থাকবে, এটিই আমাদের প্রত্যাশা।

ভারত আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে অবস্থান সুসংহত করছে, বিশ্ব অর্থনীতিতেও তার গুরুত্ব আগামীতে বাড়বে। বাংলাদেশ ভারতের এ অগ্রযাত্রার সুফল গ্রহণ করতে পারে। ভারতের সাথে চীনেরও ব্যাপক বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে; আবার প্রতিযোগিতাও রয়েছে। স্বার্থের ক্ষেত্রে ভিন্নতা ও বিরোধ থাকলেও এ কারণে বর্তমান বিশ্বে উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষায় সব দেশ অর্থনৈতিক সম্পর্ককেই প্রাধান্য দিচ্ছে। এটিই প্রবণতা, এটিই আগামীর পথ। ভারত ও চীনের সম্পর্ক সে পথ ধরেই অগ্রসর হচ্ছে। ভারত ও চীন, দু'দেশের সঙ্গেই রয়েছে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান ও চীন-ভারতের সাথে সুসম্পর্ক বাংলাদেশের বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি সুযোগের জানালা এনে দিয়েছে। বাংলাদেশ এ দুই দেশের আড়াইশ' কোটিরও বেশি মানুষের বিশাল আভ্যন্তরীণ বাজারের সুবিধা নিতে পারে নিজস্ব শিল্পায়ন ও উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে। এ দু'দেশের বিনিয়োগ আকর্ষণ তাই বাংলাদেশের জন্য বড় একটি সুযোগের সৃষ্টি করতে পারে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর তাই বাংলাদেশের জন্য একটি সুযোগ হিসেবে দেখতে হবে, যে সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ একবিংশ শতাব্দীতে তার উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়ন করতে পারবে।

সমকাল
৬ জুন ২০১৫

দু'দেশের সম্পর্ক নতুন সোপানে নিয়ে যাবে

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফর নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক ঘটনা। এটি দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের জন্য একটি নতুন সোপান। আমাদের দীর্ঘ চার দশকের বেশি সময় ধরে আটকে থাকা স্থলসীমা নির্ধারণের চুক্তিটি সুসম্পন্ন হওয়ার প্রেক্ষিতে এ সফর সুবাতাস নিয়ে আসবে। এটি হওয়ার ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং ভারতের সব দল একত্রে এটিতে সহমত দিয়েছে। এতে বাংলাদেশের প্রতি ভারতের জনগণের সদিচ্ছারও প্রকাশ ঘটেছে। তবে মনোকষ্টের জায়গাটি হল, তিস্তা চুক্তি এই যাত্রায় হচ্ছে না। আমাদের প্রত্যাশা ছিল নরেন্দ্র মোদি ডাবল সেঞ্চুরি করবেন। কিন্তু দ্বিতীয় সেঞ্চুরিটি করার মত ওভার আর বাকি নেই। সেহেতু নরেন্দ্র মোদিকে এক সেঞ্চুরি করেই ফিরে যেতে হবে। কিন্তু, তিস্তা চুক্তি দ্রুততম সময়ের মধ্যে না হলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের এই সাম্প্রতিক উচ্ছ্বাস ধরে রাখা কষ্টকর হবে। যেহেতু সফরে মমতা ব্যানার্জিও আসছেন, সেহেতু আমাদের প্রত্যাশা থাকবে তিনি বাংলাদেশের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা আরও গভীরভাবে অনুধাবন করে এ ব্যাপারে তার মনোভঙ্গি পরিবর্তন করবেন।

যেটি আরও লক্ষণীয়, সফরকে কেন্দ্র করে এটি মোটামুটিভাবে পরিষ্কার হয়েছে যে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের বিষয়টি (ফ্যাক্টরটি) আগে যেরকম ছিল, এখন আর সেরকম নেই। ভারত অনুরক্ততা ও ভারত বিরোধিতা বাংলাদেশের মূলধারার রাজনীতির অনুষঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। ভারতের সঙ্গে সম্পর্কটা রাজনীতির বাইরে নিয়ে গিয়ে আমাদের জাতীয় স্বার্থের আলোকে নির্ধারণ করা খুবই প্রয়োজনীয়। মনে হচ্ছে, আমরা সেরকম একটি পরিপক্ক জায়গাতে এগিয়ে যাচ্ছি। বিশেষ করে, সাম্প্রতিককালে প্রধান বিরোধীদল বিএনপির পক্ষ থেকে নরেন্দ্র মোদির সফরকে কেন্দ্র করে যেরকম বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে

তাতে মনে হয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি নতুন দ্বিদলীয় উপলব্ধি আসছে। ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আরও বিস্তৃত করতে হবে এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু সেটি অর্থনৈতিক তথা জাতীয় স্বার্থের আলোকেই করতে হবে। তবে এটি অবশ্যই সমতা এবং দক্ষতার ভিত্তিতে হতে হবে।

আরও লক্ষ্য করছি যে, দু'দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক সাম্প্রতিককালে যত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, ততখানি দ্রুততার সাথে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি, নীতিকাঠামো ও মানবদক্ষতা সব ক্ষেত্রে প্রদর্শন করতে পারছি না। এই ঘাটতি বাংলাদেশের পক্ষে পূর্ণ সুফল আনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারে। নরেন্দ্র মোদির আসন্ন সফরের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে যোগাযোগ সম্পর্ক। ভারতের সঙ্গে আমাদের একটি নৌ চুক্তি রয়েছে। এই চুক্তির অধীনে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ভারতের পণ্য যায়। এটি হয় মূলত বাংলাদেশের জাহাজ ব্যবহার করে এবং এতে বাংলাদেশের কিছু আয় হয়। তবে এখন তৃতীয় দেশে পণ্য রফতানির সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। তবে বাংলাদেশের নৌপথ দিয়ে ভারতের যে সব পণ্য যাচ্ছে তার ওপর প্রচলিত ফি ও চার্টের বাইরে কোন বাড়তি মাসুল ধরা হচ্ছে না – যা সঠিক বলে মনে করি না।

স্থল যোগাযোগ চুক্তির বিষয়ে ভারতের সব সময়ই আগ্রহ বেশি ছিল। বিশেষ করে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে উত্তর পূর্ব দিকের সাতটি অঙ্গরাজ্যে পণ্য আনা নেওয়া এবং মানুষ যাতায়াতের প্রয়োজনে তারা চুক্তিটিতে আগ্রহী। এখন ঢাকা-কলকাতা থেকে ঢাকা হয়ে শিলং-গৌহাটি বাস চলাচল শুরু হয়েছে। এখানেও বাংলাদেশ তার ভূ-অর্থনৈতিক অবস্থান ব্যবহার করে কোন বিশেষ আয় করছে না। এ ছাড়া সমুদ্রবন্দর চুক্তি হচ্ছে বলেও শোনা যাচ্ছে। এটি একটি ইতিবাচক দিক। এখন তো আমাদের দেশে মালপত্র আনতে হলে সিঙ্গাপুর ব্যবহার করে বড় জাহাজে এনে সেগুলোকে ফিডার ভেসেলে তুলে নিয়ে আসতে হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা যদি একে অন্যের সীমানায় সোজাসুজি পণ্য আনা-নেওয়া করতে পারি এটি একটি ভাল দিক। এতে আমদানি-রফতানির খরচ কমবে।

শোনা যাচ্ছে, একটি ট্রানজিট চুক্তিও হবে। সেখানে মাশুল নেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। এটির বিষয়ে কিছুটা অস্পষ্টতা রয়েছে। বলা হচ্ছে, এর আওতায় তৃতীয় দেশে পণ্য আনা-নেওয়ায় মাশুল দিতে হবে। এর অর্থ কি এই যে, ভারতের উপর দিয়ে বাংলাদেশ, নেপাল কিংবা ভুটানে পণ্য পাঠালে বাংলাদেশ মাশুল দিবে। অন্যদিকে, ভারত বাংলাদেশের উপর দিয়ে তাদের অন্য অংশে পণ্য পরিবহনে মাশুল দেবে না? নাকি ভারত তৃতীয় কোন দেশে পণ্য পাঠালেই কেবল মাশুল দেবে? এই জায়গাতে স্বচ্ছতার দরকার আছে। এর পাশাপাশি চতুর্দেশীয় উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার কাঠামোতে বাংলাদেশ-ভারত-

নেপাল-ভুটান মোটরযান চলাচল চুক্তি হচ্ছে। এটিও একটি আশাব্যঞ্জক দিক। এ ছাড়া ভারত বাংলাদেশের পায়রায় একটি গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণে অর্থায়ন করতে চাইছে। তবে আমাদের শঙ্কার জায়গা হল যোগাযোগের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন – নৌ, স্থল, সমুদ্র এগুলোর চুক্তি সব বিচ্ছিন্নভাবে হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে সমন্বয়ের সমস্যা, প্রাতিষ্ঠানিক যৌক্তিক কাঠামো গড়ে তোলায় সমস্যা হবে, এ ক্ষেত্রে একটি অভিন্ন নীতিকাঠামো গড়ে তোলা বড় চ্যালেঞ্জ হবে। দরকষাকষিতেও বাংলাদেশ পিছিয়ে যাবে। সবচেয়ে বড় বিষয় হল বিকাশমান দ্বিপাক্ষিক বা উপ-আঞ্চলিক যোগাযোগ কাঠামোর সুফল বাংলাদেশকে পেতে হলে বড় ধরনের বিনিয়োগ দরকার।

আমরা এর আগে মূল্যায়ন করেছিলাম, অন্তত ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ দরকার পড়বে। কিন্তু সেই বিনিয়োগ নিয়ে কোন আলোচনা এখন দেখছি না। অথচ যোগাযোগ চুক্তি কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিনিয়োগের এ দিকটি অত্যন্ত আবশ্যকীয় বিষয়। এই বিনিয়োগ কোথা থেকে আসবে, ভারত কতখানি বিনিয়োগ করবে, আঞ্চলিক ব্যাংকগুলো থেকে কতখানি নেওয়া যাবে, বিশ্বব্যাংক থেকে কতখানি নেওয়া হবে, ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগের সুযোগ থাকবে কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলো পরিষ্কার হওয়া দরকার। এ ক্ষেত্রে, বারবার যে বিষয়টি আলোচনায় আসছে সেটি হল ভারতের পক্ষ থেকে যে এক বিলিয়ন ডলার লাইন অফ ক্রেডিট (এলওসি) দেওয়া হয়েছিল তার কথা। এটির বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতাটি খুবই বিবেচনাযোগ্য। সেই ঋণ থেকে ২০০ মিলিন ডলার ভারত সদিচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ অনুদানে রূপান্তর করে পদ্মা সেতুর অর্থায়নে দিয়েছে। এ ছাড়া, আর দুই থেকে তিনশ মিলিয়ন আমরা ব্যয় করতে পেরেছি এবং সেগুলো হয়েছে মূলত ভারত থেকে বাস এবং রেলের বগি আনার ক্ষেত্রে। যে সব অবকাঠামো নির্মাণে ব্যয়ের কথা বলা হয়েছিল তার কোন অগ্রগতি হয়নি। আমাদের আশুগঞ্জ থেকে আখাউড়া রাস্তা হওয়ার কথা ছিল, রূপসা ব্রিজ থেকে খুলনা পর্যন্ত রাস্তা বা ডাবল গেজের রেল – এসব প্রকল্পের বেশি অগ্রগতি হয়নি।

এ ছাড়া, এই ঋণের বিভিন্ন শর্তের কারণে শুধু যে ব্যয় বেড়েছে এবং সময়ক্ষেপণ হয়েছে তাই নয়, বিভিন্ন সময় দরপত্র আহ্বান এবং এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন শর্ত থাকার কারণে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। কারণ এগুলো একমাত্র ভারত থেকেই কিনতে হবে এমন শর্ত ছিল সেখানে। সেই জন্য এখন যখন আরও এক বিলিয়ন বা দুই বিলিয়ন ডলারের ঋণ চুক্তি হতে যাচ্ছে তখন আগের বারের অভিজ্ঞতাগুলো কাজে লাগানো হয়েছে কিনা সেটি দেখতে হবে। কারণ টাকা প্রতিশ্রুত হওয়া মানেই অবমুক্ত হওয়া না, আর অবমুক্ত হলেই এটি সর্বোচ্চ ব্যবহার হবে বিষয়টি এমন না। তবে এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হল এটি বাস্তবায়নে যে ধরনের প্রস্তুতি দরকার, যেমন অবকাঠামোর কথা আগেই বলেছি।

এ ছাড়া 'মোটর ভেহিক্যালস অ্যাক্ট' বিষয়ক একটি আইনী কাঠামো দরকার, রাস্তাঘাটে কী সংকেত হবে, গাড়িগুলো রক্ষণাবেক্ষণ, আরও অন্য কোন অর্থের সংশ্লেষ থাকবে কিনা এসব বিষয়ে প্রস্তুতি কতখানি কী আছে আমাদের জানা নেই।

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি বড় সেটি হল, ভারত আমাদের রফতানির ক্ষেত্রে শুল্ক সুবিধা দিয়েছে। এর ফলে আমাদের রফতানি কিছুটা বেড়েছে। আধা বিলিয়ন ডলারের মত হয়েছে। তবে বাণিজ্য ঘাটতি রয়ে গিয়েছে সাড়ে পাঁচ বিলিয়ন ডলার। চীনের সঙ্গেও আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি এই মাত্রার। অনেকে এই দ্বিপাক্ষিক ঘাটতির উপর জোর দেন। তবে অর্থনীতির ছাত্র হিসেবে আমার কাছে দ্বিপাক্ষিক ঘাটতির চেয়ে বৈদেশিক লেনদেনের সার্বিক ঘাটতিটাই বড় বিষয়। কারণ দ্বিপাক্ষিক ঘাটতির মূল কারণ হল সেখান থেকে আমরা সস্তায় জিনিস পাচ্ছি বলে আমদানি করছি। তা প্রায় অধিকাংশই মধ্যবর্তী পণ্য কিংবা পুঁজিপণ্য যা ব্যবহার করে আমরা রফতানি পণ্য তৈরি করি। তবে ভারতের বাজারে রফতানি বাড়ার ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধকতা হল অশুল্ক বাধা। অনেক সময় মান নিয়ন্ত্রণ নিয়ে যার উদ্ভব হয়। এ ক্ষেত্রে, দুই দেশের মান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান দু'টির মধ্যে একটি চুক্তি হওয়ার কথা, যার ফলে সমস্যা কিছুটা সুরাহা হতে পারে। ভারতের উপর চাপ বাড়াতে হবে অশুল্ক বাধা দূর করার জন্য।

তবে আমাদের জন্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে জিনিসটি প্রয়োজন হবে সেটি হল চতুর্দেশীয় যোগাযোগ চুক্তি। যদি এই চুক্তির অধীনে তৃতীয় দেশে পণ্য আনা-নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া যায় তবে বাণিজ্য আমদানি-রফতানি বাড়বে। এ ছাড়া যদি ভারত বাংলাদেশে বিনিয়োগ করে এবং পরে তার উৎপাদিত পণ্য আবার ভারতে রফতানি করে তাহলেও তার সুযোগ আমাদের নেওয়া উচিত বলে মনে করি। ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের আরেকটি বিষয় হল বিদ্যুৎ। ভারতের কাছ থেকে বিদ্যুৎ কিনছি আমরা। অর্থাৎ এখানে সেবা পণ্যের বাণিজ্য হচ্ছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ক্ষেত্রে আমরা দ্বিপাক্ষিক থেকে একটি উপ-আঞ্চলিক বিদ্যুৎ গ্রিডের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত হতে যাচ্ছি। দু'দেশের ভেতর বিদ্যুৎ কেনার দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি জটিলতা ছিল তা নিরসন করতে পেরেছি। ভারতের সঙ্গে আমাদের আরও একটি বিদ্যুৎ প্রকল্প রয়েছে। তা হল রামপাল প্রকল্প। এটি সুন্দরবনের কাছে হওয়ায় পরিবেশবাদীরা এবং সচেতন নাগরিকরা এটি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। এ প্রকল্পটি নিয়ে আরও স্বচ্ছতা ও পর্যালোচনা দরকার। ভারত এমন একটি বিতর্কিত প্রকল্পে গ্রহণ করলে, তবে আরও যেসব যৌথ প্রকল্প রয়েছে তাতে এর প্রভাব পড়বে। ফলে রামপাল প্রকল্পকে নিয়ে আমাদের আরও গভীরভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে।

আর যেটি আছে তা হল ভারত পায়রাতে সমুদ্রবন্দর বানাতে চাইছে। এর আগে চীন সোনাদিয়ার কথা বলেছিল। সেখানে চীনসহ আরও কিছু বড় বড় দেশ অর্থায়ন করতে চেয়েছিল। তবে এখন মনে হচ্ছে পায়রাতে ভারতের অর্থায়নের বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে। আসলে বাংলাদেশের যে ভূ-অর্থনৈতিক সুবিধাজনক অবস্থান রয়েছে সেটির পুনর্ব্যবহার বা সুযোগ নিতে চাইলে গভীর সমুদ্রবন্দর আমাদের অবশ্যই দরকার। তবে পায়রাতে বিনিয়োগে যদি ভারত অগ্রাধিকার পায় তবে চীনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে কোন প্রভাব পড়বে কিনা তা বিবেচনায় রাখতে হবে। এ ছাড়া ভারত স্পেশাল অর্থনৈতিক জোন করার জন্য জমি চাচ্ছে। এখানে বড় বিনিয়োগ হবে এটি আমরা আশা করতে চাই।

এসব অর্থনৈতিক বিষয়াবলী ছাড়াও রয়েছে ভারতে নারী ও শিশু পাচার রোধে সহযোগিতার লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষর। ভারতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য দিক মিলিয়ে একটি বড় ধরনের উত্থান আমরা লক্ষ্য করছি। আমাদের মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান এবং ভূ-অর্থনৈতিক অবস্থান কৌশলগতভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভারত এবং চীনের মধ্যে বাংলাদেশ এবং মায়ানমার দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফলে, বাংলাদেশকে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে যোগাযোগের সিংহদ্বার হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ এসেছে। এই সুবর্ণ সুযোগটি খুবই দক্ষতার সঙ্গে এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে এবং পূর্বপ্রস্তুতির সঙ্গে আমরা কাজে লাগাতে পারি কিনা সেটিই আগামী দিনের দেখার বিষয়।

সংবাদ
৬ জুন ২০১৫

অনুলিখন: রোকন মাহমুদ

বাণিজ্য বৃদ্ধিতে উন্নত দেশগুলো থেকে বেশি প্রতিশ্রুতি নিতে হবে

মোস্তাফিজুর রহমান

কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে আজ থেকে শুরু হচ্ছে তিন দিনব্যাপী ডব্লিউটিও মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন। এবারের সম্মেলনে বাংলাদেশের কোন কোন বিষয়ে জোর দেওয়া দরকার, সে বিষয়ে কথা বলেছেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান। তার সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ নিচে দেওয়া হল। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সকালের খবরের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক এসএম আলমগীর।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, এবারের ডব্লিউটিও সম্মেলনে বাংলাদেশের তরফ থেকে বেশ কয়েকটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সবার আগে যে বিষয়টি উঠবে সেটি হল, শূন্য শুল্কের সুবিধা আদায়। আমরা আগে থেকেই যেসব দেশে এসব সুবিধা পাই সেসব দেশ যেন সুবিধাজনক রুলস অব অরিজিনের মাধ্যমে তা অব্যাহত রাখে এবং যেসব দেশ আমাদের শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয় না সেসব দেশ থেকে কীভাবে এ সুবিধা আদায় করে নেওয়া যায়, সে চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু বাণিজ্য সংস্থার হংকং মন্ত্রীপর্যায়ের বৈঠকের সিদ্ধান্তের আলোকে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ যেন সব উন্নত দেশ থেকে এ বাজার সুবিধা পেতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। আর যুক্তরাষ্ট্রসহ যেসব দেশ আমাদের শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয় না তারা যদি শেষ পর্যন্ত এবারের সম্মেলনেও সে বিষয়ে কোন অঙ্গীকার না করে, তাহলে অন্তত যেন এ ব্যাপারে একটি টাইমলাইন দেয় সে বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আগামী এক বা দুই বছরের মধ্যে কিছু বাজার সুবিধা

বৃদ্ধি করা এবং পর্যায়ক্রমে এ সুবিধা পুরোপুরি দেবার জন্য তাদের উপর চাপ অব্যাহত রাখতে হবে। ইতিমধ্যে অবশ্য চীন, ব্রাজিল, ভারতসহ বেশ কয়েকটি দেশ শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাপের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তাদের কাছ থেকে সুস্পষ্ট বাস্তবায়ন পথ রেখা জেনে নেওয়া এবং যারা প্রতিশ্রুতি দেয়নি তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এলডিসি হিসেবে সেবাখাতের ক্ষেত্রে যে ছাড় দেওয়া হয়েছে সেটি বাস্তবায়িত হলে তার থেকে কীভাবে সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়া যায় সে জন্য বাংলাদেশকে প্রস্তুতি নিতে হবে। এ বিষয়ে উন্নত দেশগুলো স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে অফার লিস্টও দিয়েছে, সেগুলো যাচাই-বাছাই করতে হবে। স্বল্পোন্নত দেশগুলো যে ‘রিকোয়েস্ট লিষ্ট’ দিয়েছে তার সাথে এ অফার লিস্টের একটা পার্থক্য রয়ে গিয়েছে। এসব বিষয়ে চাপ অব্যাহত রাখতে হবে।

তিনি বলেন, তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বিগত বালি সম্মেলনে ‘ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন’ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এই ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের যেসব ক্ষেত্রে সহায়তা প্রয়োজন সেগুলো আদায়ে চেষ্টা চালাতে হবে। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ সহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহের বাণিজ্য বৃদ্ধিতে যাতে উন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে আরও বেশি প্রতিশ্রুতি আদায় করা যায় সে বিষয়ে জোর দিতে হবে। গত বালি সম্মেলনে অন্য যেসব সিদ্ধান্ত হয়েছিল, যেমন উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশসমূহের বাণিজ্য সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উন্নত দেশগুলো যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেগুলো আদায়ের লক্ষ্যে, সমধর্মী সব দেশকে সাথে নিয়ে বাংলাদেশকে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা নিতে হবে।

মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, এবারের সম্মেলনে বাণিজ্য বিষয়ক রুলস অব অরিজিন যাতে আরও সহজ করা হয় সেটি নিয়ে আলোচনা হবে। স্বল্পোন্নত দেশসমূহের পক্ষে যেসব বিশেষ সুবিধা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় আছে সেগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য এর আগের মন্ত্রীপর্যায়ের সম্মেলনের সময় বালিতে যে ‘মনিটরিং ম্যাকানিজম’ করা হয়েছিল সেটিকে কীভাবে আরও শক্তিশালী করা যায় তার উপরও গুরুত্ব দিতে হবে।

সর্বশেষ বিষয়টি হচ্ছে, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি-কে কীভাবে স্বল্পোন্নত দেশের বাণিজ্য সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজে লাগানো যায়। এসডিজি-তে ঘোষণা করা হয়েছে গ্লোবাল পার্টনারশিপের মাধ্যমে বাংলাদেশের মত দেশগুলোকে এসডিজি বাস্তবায়নে

সাহায্য করা হবে। স্পষ্ট বলা হয়েছে এলডিসি-র রফতানি অংশ বিশ্ব বাজারে ২০২০ সালের মধ্যে দ্বিগুণ করা হবে। নাইরোবিতে উপস্থিত মন্ত্রীদেরকে মনে করিয়ে দিতে হবে তাঁদের সরকার প্রধানের এসডিজি-তে কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আর মন্ত্রীরা তার বাস্তবায়নের পথে কতটুকু অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

সকালের খবর
১৫ ডিসেম্বর ২০১৫

সিপিডির আরও কিছু কথা

মোস্তাফিজুর রহমান

সম্প্রতি নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ের দশম সম্মেলনের একটি মূল্যায়ন সিপিডির পক্ষ থেকে ২৩ ডিসেম্বর সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছিল। বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ইস্যুতে সিপিডি তার গবেষণালব্ধ বক্তব্য এ ধরনের সংবাদ সম্মেলনে নিয়মিত উপস্থাপন করে থাকে। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত সিপিডির মূল্যায়নের ভিত্তি ছিল নাইরোবিতে সিপিডির গবেষকদের সরকারি প্রক্রিয়ার সমান্তরালে অনুষ্ঠিত সিভিল সোসাইটি ও থিংক ট্যাংকসমূহের বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যাপক অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা, সম্মেলনের প্রাতিষ্ঠানিক সরকারি প্রক্রিয়ার সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে নিয়মিত মতবিনিময় এবং সম্মেলনের ফলাফলসহ নাইরোবি ঘোষণার বিচার-বিশ্লেষণ। সরকারি প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত না হলেও বাংলাদেশ ও অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মত একটি প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া ও ঘোষণা দলিলের পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করার দায়িত্ব ও অধিকার সিপিডির আছে।

সিপিডির সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ ও স্বল্পোন্নত দেশসমূহের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি নিয়ে যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, সে সম্পর্কে কিছু সমালোচনামূলক বক্তব্য বিভিন্ন মিডিয়ায় এসেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন বলে মনে করি। সিপিডি তার গঠনমূলক সমালোচনার জবাবে বিভিন্ন সরকারের কাছ থেকে বিরূপ মন্তব্য শুনে অভ্যস্ত। আর বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য সিপিডির গবেষণাধর্মী পরামর্শ ও যে কোন উন্নয়ন ইস্যুতে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াসের প্রমাণ তার দুই দশকের কর্মকাণ্ড। তাই, এ

নিবন্ধে শুধু বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নাইরোবি প্রক্রিয়া ও ঘোষণায় বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ইস্যুগুলোর ওপর আলোচনা সীমিত রাখা হল।

সিপিডি স্বল্পোন্নত দেশসমূহের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ইস্যুসমূহ তুলে ধরার উদ্দেশ্যে নাইরোবিতে পাঁচটি আলোচনা অনুষ্ঠান করে এবং আরও বেশ কয়েকটি আলোচনায় অংশগ্রহণ করে, যেখানে বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যমন্ত্রী ও রাষ্ট্রদূত, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কর্মকর্তা ও আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহের প্রতিনিধিরা চলমান বাণিজ্য আলোচনা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেন। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত সিপিডির মূল্যায়ন ছিল নাইরোবির অভিজ্ঞতার আলোকে। সিপিডির মূল্যায়নে বাংলাদেশ ও স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অর্জনের বিষয়গুলো চিহ্নিত করা হয়, নাইরোবি ঘোষণার আলোকে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর দাবি ও অর্জনের পার্থক্য শনাক্ত করা হয়, আগামীর সম্ভাব্য কৌশল নিয়ে মতামত উপস্থাপন করা হয়। সিপিডির মূল্যায়নে বলা হয়, স্বল্পোন্নত দেশ-সম্পর্কিত ইস্তাম্বুল ঘোষণা (২০১১) ও সর্বসম্প্রতি গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) আলোকে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের যে প্রত্যাশা ছিল, তার সঙ্গে নাইরোবিতে যে ফলাফল এসেছে, তা যথোপযুক্ত হয়নি।

নাইরোবি সম্মেলনে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের কিছু অর্জনের অন্যতম ছিল স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে বিশেষ সুবিধা প্রদানকারী রফতানির উৎসবিধির (রুলস অব অরিজিন) সহজীকরণের সিদ্ধান্ত। সিপিডি তার সংবাদ সম্মেলনে এ সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছে। তবে লক্ষণীয়, এ আলোচনা জেনেভাতে একটি পরিপক্ক অবস্থাতেই আসে, যা পরবর্তী সময়ে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে নাইরোবি ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত হয়। অপরদিকে, নাইরোবি সম্মেলনের আগেই জেনেভায় অনুষ্ঠিত ট্রিপস্ কাউন্সিলে ফার্মাসিউটিক্যালস পণ্যের ব্যাপারে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বিশেষ সুবিধা ২০৩৩ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত (৬ নভেম্বর ২০১৫) গৃহীত হয়। নিঃসন্দেহে, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন, বিশেষত বাংলাদেশের জন্য। তবে এটিও জেনেভাতেই চূড়ান্ত হয় এবং এ কারণেই নাইরোবি ঘোষণার ২২ নম্বর ধারায় সিদ্ধান্তটিকে ‘স্বাগত’ জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশের অন্যতম স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় হিসেবে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে প্রদত্ত সেবা খাতের ছাড় বিষয়ক নাইরোবি ঘোষণা সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য যখন ২০০৭ সালে জেনেভায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন, তখন তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বেশ কিছু দেশের সহযোগিতায় ও নরওয়ের মধ্যস্থতায় সেবা খাতের ছাড়-এর আলোচনার সূত্রপাত করেন, যার ফলে পরবর্তী সময়ে ২০১১ সালে এ

বিষয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নাইরোবিতে কেবল ছাড়ের সময়সীমা ২০২৬ থেকে ২০৩১ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, যদিও এ ছাড় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ও চাহিদা ছিল, যা অপূর্ণ থেকে গিয়েছে।

সিপিডি বাংলাদেশের শুল্কমুক্ত-কোটামুক্ত বাজারসুবিধা লাভের লক্ষ্যে গবেষণা ও বিশ্লেষণধর্মী কর্মকাল ধারাবাহিকভাবে করে এসেছে, যা নীতিনির্ধারক ও ব্যবসায়ী নেতারা বিভিন্ন বাণিজ্য আলোচনায় ব্যবহার করেছেন। শুল্কমুক্ত-কোটামুক্ত বাজারসুবিধা যেন বাণিজ্যিকভাবে অর্থপূর্ণ হয়, সে বিষয়ে ঘোষণাপত্রে 'প্রতিশ্রুতি' ব্যক্ত করা হয়েছে। অনুরূপ ভাষার ব্যবহার বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার হংকং (২০০৫) ও বালি (২০১৩) ঘোষণায়ও আমরা লক্ষ্য করেছিলাম। ঘোষণার ২৪ নম্বর ধারা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের শুল্কমুক্ত প্রবেশ এ সিদ্ধান্তের আলোকে দুরূহ হবে; বরং ঘোষণায় শুল্কমুক্ত-কোটামুক্ত বাজার প্রবেশের সিদ্ধান্তহীনতায় আফ্রিকান দেশগুলো প্রকাশ্যে উল্লাস প্রকাশ করেছে। উল্লেখ্য যে, ২০০৮ সালের জুলাই মাসে জেনেভায় অনুষ্ঠিত মন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনায় বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট পণ্যতালিকা ধরে আফ্রিকার স্বল্পোন্নত দেশসমূহ ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি সমঝোতার কাছাকাছি উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছিল। যদিও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সেই সভা ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মতভিন্নতার কারণে ভেঙে যাওয়ায় এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি।

নাইরোবির আগে ২০১৩ সালে বালিতে গৃহীত 'এলডিসি প্যাকেজ'-এ অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ইস্যুর ওপর পরবর্তী সময়ে জেনেভায় অনুষ্ঠিত আলোচনার মাধ্যমে তেমন কোন দৃশ্যমান অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়নি। যেমন, শুল্কমুক্ত-কোটামুক্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দর-কষাকষি এবং এ সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ ও রোডম্যাপ; সেবা খাতের ক্ষেত্রে ছাড়-এর সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নের পক্ষে উন্নত দেশসমূহে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতাগুলোর অপসারণ বা স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য বিশেষ ও বিভাজিত সুবিধার (স্পেশাল অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়াল ট্রিটমেন্ট) বাস্তবায়ন নিরীক্ষার জন্য যে 'মনিটরিং মেকানিজম' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তাকে কার্যকর করার লক্ষ্যে স্বল্পোন্নত দেশের সুনির্দিষ্ট দাবি। নাইরোবিতে এ পরিপ্রেক্ষিতে নতুন নির্দেশনা আছে যৎসামান্যই। আমাদের প্রত্যাশা ছিল, জেনেভায় যেসব আলোচনা অসম্পূর্ণ রয়ে যায় এবং বিভিন্ন দেশের ট্রেড-নেগোশিয়েটররা যে বিষয়গুলোতে সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি, মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সম্মিলিত চাপে সেসব বিষয়ে হয়ত কিছু ইতিবাচক ফল আসবে। মূলত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার উন্নত সদস্য দেশসমূহের বিরোধিতার কারণে তা সম্ভব হয়নি।

মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের পাশাপাশি মন্ত্রীরা দ্বিপক্ষীয়, আঞ্চলিক ও গ্রুপভিত্তিক আলোচনা করে থাকেন। তবে মূল আলোচনা হয় ঘোষণাপত্রের খসড়া নিয়ে। অভূতপূর্বভাবে এ আলোচনা এবার ছিল বিশেষ কয়েকটি দেশের (যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চীন, ব্রাজিল ও ভারত) কুক্ষিগত। সেসব আলোচনায় এলডিসির সমন্বয়ক হিসেবে বাংলাদেশকে এলডিসি-সংক্রান্ত প্যারা ২৪-এর বাইরে আর কোন আলোচনায় আমন্ত্রণ জানানো হয়নি, স্বাগতিক দেশ কেনিয়া বা আফ্রিকার দেশগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এর ফলে, স্বল্পোন্নত দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ইস্যুসমূহ জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াগত বাধার সৃষ্টি হয়, যার ফলে দোহা উন্নয়ন এজেন্ডার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের সম্ভাবনা বহুলাংশে অনিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। উপরন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, সর্বজনীন মতৈক্যের বিপরীতে সীমিত সমঝোতার (প্লুরিল্যাটারেল) পদ্ধতিটি ভবিষ্যতে প্রাধান্য পাবে বলে মনে হয়, যা বাস্তবে রূপ নিলে স্বল্পোন্নত দেশগুলো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় আরও চাপে পড়বে। এসব বাস্তবতার নিরিখে ভবিষ্যতে বাণিজ্য আলোচনায় কী কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে, সে বিষয়ে সিপিডির সংবাদ সম্মেলনে বিকল্প পরামর্শ ও কৌশল তুলে ধরা হয়।

নাইরোবি আলোচনা ও তার কার্যকারিতা সম্পর্কে যে সংযত সমালোচনা সিপিডি করেছে, সংশ্লিষ্ট সেসব ইস্যুর সব দায়দায়িত্ব বাংলাদেশের সরকারি প্রতিনিধিদলকে কেন নিতে হবে, তা আমাদের বোধগম্য নয়। এটি ছিল একটি বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে শক্তির ভারসাম্যের প্রকাশ। উল্লেখ্য, যেসব দেশ তুলনামূলকভাবে নাইরোবিতে বেশি অর্জন করেছে, তারাও নাইরোবি ঘোষণা নিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে, যেমন ভারত। উপরন্তু সীমিত প্রাপ্তিতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ ভবিষ্যতে আমাদের অবস্থানকে কৌশলগতভাবে দুর্বল করে দেবে। আমরা যদি সবই পেয়ে থাকি, তাহলে ভবিষ্যতে দাবি করার কিছু থাকে না এবং এটি বাস্তব পরিস্থিতিরও প্রতিফলন নয়।

প্রথম আলো
৩০ ডিসেম্বর ২০১৫

বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান দৃঢ় হচ্ছে

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বাংলাদেশের অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনা সাধারণত আমাদের নিজস্ব আভ্যন্তরীণ শক্তি ও দুর্বলতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির তুলনামূলক বিচার আমরা কমই করে থাকি। গত দেড় দশকের (২০০০-২০১৫) তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত সূচকগুলোর মধ্যে, প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, বিশ্বের মোট উৎপাদন ও আয়ে বাংলাদেশ কীভাবে তার হিস্যা বাড়িয়ে চলেছে। যেমন, ২০০০ সালে বৈশ্বিক জিডিপিতে বাংলাদেশের অংশ ছিল প্রায় ০.১৬ শতাংশ, সেটি ২০১৪ সালে এসে দাঁড়ায় ০.২২ শতাংশে। একই রকমভাবে, বৈশ্বিক আয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবদান ২০০০ সালে ০.১৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৪ সালে ০.২৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। লক্ষণীয়, উৎপাদনের তুলনায় আয়ের অংশে বাংলাদেশের অবদান বেশি; মনে রাখতে হবে সেটি সম্ভব হয়েছে প্রবাসী আয় যুক্ত হওয়ার কারণে। আমদানি-রফতানির বৈশ্বিক তথ্য বিশ্লেষণ করলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অনুরূপ ঊর্ধ্বমুখী চিত্র পাওয়া যায়। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, মোট বৈশ্বিক রফতানিতে বাংলাদেশের অবদান ২০০০ সালের ০.০৮ শতাংশ থেকে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪ সালে দাঁড়িয়েছে ০.১৪ শতাংশে। এমনকি ২০০৮-০৯ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটও এই ধারাবাহিকতায় ছেদ ঘটাতে পারেনি।

একই সময়ে, বৈশ্বিক আমদানিতে বাংলাদেশের অবদান ০.১১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ০.১৯ শতাংশ হয়েছে। এই আমদানি বৃদ্ধি অবশ্য কিছুটা কাঁচামাল সরবরাহের মাধ্যমে রফতানি বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত। পণ্য রফতানির পাশাপাশি সেবা রফতানিতেও বাংলাদেশ তার অবস্থান কিছুটা সংহত করেছে। যেমন, বিশ্বের মোট প্রবাসী আয়ের

ক্ষেত্রে ২০০০ সালে বাংলাদেশ যদি পেয়ে থাকে ১.৬ শতাংশ, ২০১৫ সালে এসে তা দাঁড়িয়েছে ২.৬ শতাংশে। প্রবাসী আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশী কর্মজীবী প্রবেশের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০ সালে বিশ্বে মোট প্রবাসী কর্মজীবীর ২.৫ শতাংশের মত যেত বাংলাদেশ থেকে; সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, ২০১৩ সালে এসে এই অংশ দাঁড়িয়েছে ৩.০৬ শতাংশে। পণ্য ও সেবা রফতানি খাতের এই বিকাশের পাশাপাশি বৈশ্বিক মোট প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের, অল্প অল্প করে হলেও, একটি ক্রমবর্ধমান অংশ বাংলাদেশে আসছে। যেমন, ২০০০ সালে যদি এর পরিমাণ ০.২ শতাংশ হয়ে থাকে, ২০১৪ সালে এই তুলনীয় সংখ্যা হয়েছে ০.১৬ শতাংশ।

শিল্পোৎপাদন বা সেবা খাতের অবদান বৃদ্ধি পেলেও বাংলাদেশের কৃষি খাতের গুরুত্ব কখনও হ্রাস পায়নি। এ ক্ষেত্রে, চাল উৎপাদনে বাংলাদেশের অর্জন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ২০০০ সালে যদি পৃথিবীর মোট চাল উৎপাদনের ৬.৩ শতাংশ বাংলাদেশ উৎপাদন করে থাকে, সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, ২০১৩ সালে এই উৎপাদন ছিল ৬.৯ শতাংশ। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও ক্রমহ্রাসমান কৃষিজ ভূমির প্রেক্ষিতে এ অর্জন বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। উৎপাদন ও বাণিজ্যের পাশাপাশি বাংলাদেশ সামাজিক খাতেও, বিশেষ করে সম্ভাব্য গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, মাতৃ-মৃত্যুহার রোধ, শিশু-মৃত্যুহার রোধ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে অগ্রগতি সাধন করেছে। ২০০০ সালে পৃথিবীর সম্ভাব্য গড় আয়ুষ্কাল ৬৭.৩ বছর, এর বিপরীতে বাংলাদেশের ছিল ৬৫.৩ বছর। ২০১৪ সালে এসে দেখছি, বাংলাদেশের মানুষের সম্ভাব্য গড় আয়ুষ্কাল (৭১.৬ বছর) বৈশ্বিক গড় আয়ুষ্কালের (৭১.৫) সঙ্গে সমান হয়ে গিয়েছে। ২০০০ সালে বাংলাদেশের মাতৃ-মৃত্যুহার ছিল বৈশ্বিক মাতৃ-মৃত্যুহারের তুলনায় ১৭ শতাংশ বেশি। এর বিপরীতে ২০১৫ সালে এই হার বিশ্ব হারের চেয়ে ১৮.৫ শতাংশ কম। শিশু-মৃত্যুর ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করি অনুরূপ প্রবণতা। ২০০০ সালে বৈশ্বিক গড়ের তুলনায় বাংলাদেশে শিশু-মৃত্যুর হার ছিল ২১ শতাংশ বেশি। অপরদিকে, ২০১৫ সালে বিশ্বের গড় শিশু-মৃত্যুহারের তুলনায়, বাংলাদেশের শিশু-মৃত্যুহার ৩.২ শতাংশ কম।

তবে দুঃখের সঙ্গে লক্ষণীয় যে, স্বাস্থ্য খাতে বিশ্বের বুকে তুলনামূলকভাবে আমরা যতখানি সাফল্য দেখাতে পেরেছি, শিক্ষা খাতে ততখানি নয়। পৃথিবীতে গড় সাক্ষরতার হার যখন ৯০ শতাংশের কাছাকাছি, তখন বাংলাদেশে তা মাত্র ৬০ শতাংশ। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের সাফল্যের এই বৈপরীত্য নিঃসন্দেহে আমাদের চিন্তিত করে তোলে। উদ্বেগের আরেকটি দিক হল অর্থনীতি ও সামাজিক খাতে বাংলাদেশ যেমন তুলনামূলক সাফল্য লাভ করছে, বিশ্বের সুশাসন সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের মাপকাঠিতে কিন্তু তেমনভাবে উন্নতি করতে পারছে না। যেমন, ২০০১-০৫ সালে আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত

দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়েছি। সর্বশেষ, ২০১৫-তে এসে ১৬৮টি দেশের মধ্যে আমরা ছিলাম ১৩৯তম অবস্থানে। অর্থাৎ বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর মাঝে ১৩তম অবস্থান। বাংলাদেশে ব্যবসার অনুকূল পরিবেশ আছে কি না সে মাপকাঠিতে ২০১০ সালে আমরা যদি ১৮৯টি দেশের ভেতর থেকে থাকি ১১৮তম অবস্থানে, ২০১৫ সালে সে অবস্থানের পতন ঘটে হয়েছে ১৭৪তম। পাশাপাশি, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচকে ১৭৮টি দেশের ভেতর ১৩৭তম, ২০১৫ সালে যা কি না ছিল ১৩১তম। অর্থাৎ এই সূচকে বাংলাদেশের অর্থনীতি 'কার্যত স্বাধীন নয়' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই সূচকে থাকা পাঁচটি স্তরের মধ্যে নিচের দিক থেকে বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্তরে অবস্থান করছে, যার সর্বশেষ স্তরে রয়েছে 'অবদমিত' অর্থনীতির দেশগুলো।

তবে সবচেয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তোলার মত ব্যাপারটি হল, ভঙ্গুর দেশের সূচকে বাংলাদেশের তুলনামূলক অবস্থান। এই সূচকে থাকা নয়টি ধাপের মধ্যে নিচের দিক থেকে বাংলাদেশ চতুর্থ ধাপে অবস্থান করছে। উপরের তথ্যের এই সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা থেকে এটি পরিষ্কার যে, আর্থ-সামাজিক খাতসমূহে গত দেড় দশকে বাংলাদেশের অর্জিত সাফল্য বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু একটি দক্ষ ও স্থিতিশীল রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তোলা ও একটি বাণিজ্য-বিনিয়োগ অনুকূল নীতি পরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ তাৎপর্যপূর্ণভাবে পিছিয়ে আছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আরও পিছিয়ে যাচ্ছে। যদি শেষোক্ত ক্ষেত্রে আমরা আরও পারদর্শিতার পরিচয় দিতে পারি তাহলে নিশ্চিতভাবেই বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে আরও গৌরব নিয়ে এগিয়ে যাবে।

সমকাল

৩১ মে ২০১৬

কানেকটিভিটি ও বাংলাদেশের সম্ভাবনা

মোস্তাফিজুর রহমান

বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে সচেষ্ট রয়েছে এবং এক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে চলেছে। এখন বাংলাদেশের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে অর্জিত অবস্থান সংহত করা, এবং উন্নয়নের নতুন পর্যায়ে উন্নীত হওয়া। এ জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করা। যোগাযোগ বা কানেকটিভিটি এ কৌশলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। এটি বহুমাত্রিক: মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট, বিনিয়োগ, বাণিজ্য, মানুষে মানুষে যোগাযোগের উপর নির্ভর করছে। এভাবে অগ্রসর হতে পারলে ব্যবসায়ের ব্যয় বা কস্ট অব ডুয়িং বিজনেস কমবে, উৎপাদন সক্ষমতা বাড়বে, এবং বিশ্ববাজারে একই সঙ্গে আভ্যন্তরীণ বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়বে। এক সময়ে আমাদের উদ্যোক্তাদের বিশ্ববাজারে অন্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতার কথা ভাবতে হত। কিন্তু মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে দেশের বাজারেও নিজ দেশের উৎপাদকের পাশাপাশি অন্য দেশের উৎপাদকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়। কানেকটিভিটি গভীরতর ও কার্যকর করলে তা এর প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। আমরা পণ্য উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন দেশের কাঁচামাল ও মেশিনের ওপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন দেশের সাথে যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করলে সাশ্রয়ীভাবে আমদানি করতে পারব, প্রতিযোগিতা সক্ষমতার সাথে রফতানি করতে পারব।

প্রতিবেশী ভারত এখন বড় অর্থনীতির দেশ। চীনও কাছের দেশ। দু'টি দেশ থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় পণ্যের একটা বড় অংশ আমরা আমদানি করি – চীন থেকে বছরে প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার এবং ভারত থেকে ছয় বিলিয়ন ডলার। আবার জনবহুল এ দেশ দু'টির আভ্যন্তরীণ বাজার ব্যাপক ও বিশাল। বাংলাদেশকে সেসব বাজারে পণ্য

রফতানির সুযোগ সম্প্রসারিত করতে হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত দু'টি দেশ থেকে আমদানির তুলনায় রফতানি অনেক কম। এর কারণ বহুবিধ। শুল্ক বাধার চাইতে অশুল্ক বাধাই অনেক বড় বাধা। সেটি দূর করার পথে বড় চ্যালেঞ্জ হল যোগাযোগ ব্যবস্থার দূর্বলতা। চীনের বর্তমান নেতৃত্বের ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড বা ওবিওআর-এর যৌক্তিকতাকে এই প্রেক্ষাপটেই আমাদের বিচার করতে হবে। এ উদ্যোগ শুধু দক্ষিণ এশীয় নয় ইউরেশিয়ান বাজারেও প্রবেশে আমাদের জন্য নতুন সুযোগ এনে দিতে পারে।

ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড বা ওবিওআর ধারণা প্রথমে সামনে আসে ২০১৩ সালে। সঙ্গত কারণেই অনেক দেশ এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে। এটি স্বীকৃত হয়েছে যে, যদি এশিয়া ও বিশ্বের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বাড়াতে হয়, তাহলে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও মানুষে মানুষে যোগাযোগ গভীরতর করতে হবে। সহজ যোগাযোগ এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এশিয়া ও ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতা বাড়াতে পারলে সব দেশের অর্থনীতিতে, এবং উদ্যোক্তা, ভোক্তা, উৎপাদক সব পর্যায়েই তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে সিল্ক রোড ইকোনমিক বেল্টের ঘোষণা দেন, যা পরবর্তীতে 'ওয়ান বেল্ট, ওয়ান রোড' (ওবর) ও তৎপরবর্তীতে বেল্ট এন্ড রোড নামে পরিচিতি লাভ করে। একবিংশ শতাব্দীর মেরিটাইম সিল্ক রোডের বিষয়টিও সামনে চলে আসে। এসব ধারণা ও প্রস্তাবকে ফলপ্রসূ করার জন্য এরপর কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর গড়ে তোলা হচ্ছে, যেখানে রয়েছে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি প্রকল্প, যেখানে যোগাযোগ, জ্বালানী, বিদ্যুৎসহ বেশ ক'টি প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত। এসবের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে চীনের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সফর করেন। এ সময়ে সরকারের সঙ্গে সরকারের (জিটুজি) এবং ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের (বিটুবি) সহযোগিতায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে সমঝোতা হয়, যাতে সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে ২৫ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমার (বিসিআইএম) অর্থনৈতিক করিডোরের আওতায় (চীনের কুনমিং থেকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত) কী কী প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে, সেটি নিয়ে যৌথ স্টাডি গ্রুপের সমীক্ষা চলছে। এর ধারাবাহিকতায় আরও কয়েকটি উদ্যোগ বিভিন্ন দেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে। অবকাঠামো খাতে আগামীতে চাই উল্লেখযোগ্য অংকের বিনিয়োগ। এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে এসব খাতের অর্থের যোগানদান। এ ব্যাংক স্থাপনে চীনের উদ্যোগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাংলাদেশসহ অর্ধশতাধিক দেশ এর সদস্য হয়েছে। এই ব্যাংক থেকে প্রথম দিকে ঋণ

গ্রহণকারী দেশের তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশ। বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন স্থাপনের জন্য এ ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে। সনাতনী বিভিন্ন সূত্রের সাথে সাথে অর্থায়নের জন্য নতুন সূত্র খুঁজতে হবে, নতুন প্রতিষ্ঠান দরকার হবে, অর্থায়নের জন্য নতুন বিভিন্ন ইন্সট্রুমেন্টের প্রয়োজন হবে।

কুনমিং থেকে কলকাতা পর্যন্ত অর্থনৈতিক করিডোর কেবল যোগাযোগ করিডোর হলে হবে না। অর্থনৈতিক করিডোরে উন্নীত হতে হলে বিনিয়োগ করিডোর, লজিস্টিকস করিডোর ও সহজ যাতায়াতের করিডোর গড়ে তুলতে হবে। এই প্রস্তাবিত 'কে টু কে অর্থনৈতিক করিডোর' - এর বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এর আওতায় বিনিয়োগ বাড়বে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড জোরদার হবে। পরিবহন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যয় কমিয়ে আনার জন্য নেওয়া হবে বিভিন্ন পদক্ষেপ। উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি, চীন হচ্ছে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান আমদানি উৎস। বাংলাদেশ বিশ্ববাজার থেকে যত পণ্য আমদানি করে তার এক-চতুর্থাংশের বেশি করে চীন থেকে। অন্যদিকে, চীনে বাংলাদেশের রফতানি ধারাবাহিকভাবে বাড়লেও এখন পর্যন্ত চীনের মোট আমদানির তুলনায় তার পরিমাণ অতি সামান্য। সাম্প্রতিক সময়ে চীন ভারতের অন্যতম প্রধান বাণিজ্য অংশীদার হয়ে উঠেছে। দু'টি দেশের মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ৬০ বিলিয়ন ডলারের বেশি। কুনমিং থেকে কলকাতার যোগাযোগ সহজ হলে পরিবহন ব্যয় কমবে এবং ভারত ও চীন উভয় দেশই তা থেকে বিপুলভাবে উপকৃত হবে। বিনিয়োগের মাধ্যমে অনেক লোকের জন্য কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে এবং তাদের জীবন-যাত্রার মানোন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ইউনান ও বাংলাদেশের মধ্যে সংযোগের বিষয়ে বিসিআইএম অর্থনৈতিক করিডোরের একটি সাব-কমিটি কাজ করছে। ইতিমধ্যে, ঢাকা ও কুনমিংয়ের মধ্যে প্রতিদিন বিমান চলাচল করায় ভাল কানেকটিভিটি গড়ে উঠেছে। চীন ও মিয়ানমারের মধ্যে পরিবহন সহযোগিতা রয়েছে। এই নেটওয়ার্ক ইউনান অঞ্চলকে বাংলাদেশের কাছে নিয়ে আসছে। তবে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে পরিবহন যোগাযোগে সমস্যা রয়ে গিয়েছে। এ থেকে উত্তরণের জন্য দু'টি দেশের কিছু সড়কপথ আন্তর্জাতিক মানের করতে হবে। দক্ষিণ চীন বিশেষ করে ইউনান, মিয়ানমার, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলো এবং বাংলাদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানোর বিপুল সুযোগ রয়েছে বলে আমি মনে করি। এ জন্য পরিপূরক বাণিজ্য সুবিধা কাজে লাগাতে হবে। ভ্যালু চেইন গড়ে তুলতে হবে। পর্যটনের সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে। এর প্রতিটি খাতেই চাই বিনিয়োগ। আমরা বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন। বাংলাদেশটি বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের গেটওয়ে এবং এর পশ্চাৎভূমি বিশাল। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা হলে ইউনানসহ চীনের দক্ষিণাঞ্চল ও বাংলাদেশ উভয়েই উপকৃত

হতে পারে। এখন পরিবহন ও লজিস্টিক ব্যয় বেশি হওয়ায় বাণিজ্য ব্যয় বেশি পড়ে, প্রতিযোগিতা সক্ষমতার ওপর তার বিরূপ প্রভাব পড়ে। চীন বাংলাদেশকে বাণিজ্যে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত দেশের সুবিধা দিয়েছে। কিন্তু পরিবহন ব্যয়ের কারণে বাংলাদেশ তার তুলনামূলক সুবিধা কাজে লাগাতে পারছে না। এ সমস্যা সমাধান হলে বাংলাদেশের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে। সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ এ বিবেচনাতে যুক্তিযুক্ত।

চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির অনেক সম্ভাব্য ক্ষেত্র ও সুযোগ রয়েছে। চীনের প্রেসিডেন্ট ঢাকা সফরকালে যে ২৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছেন, তা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের অবকাঠামো জোরদার হবে, আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্র ও সুযোগ সম্প্রসারিত হবে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে চীনকে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করেছে, যেখানে কেবল চীনের বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করবেন। এ অঞ্চলের ভেতরে এবং এর বাইরে চীনের বিনিয়োগ বাংলাদেশী উদ্যোক্তাদের জন্যও ব্যবসায়ের সুযোগ সৃষ্টি করবে। চীনের সানসেট হিসেবে চিহ্নিত কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে স্থানান্তর করার প্রস্তাব আছে। যাচাই বাছাই করে এগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে। চীন বাংলাদেশের কৌশলগত খাতগুলোতে প্রযুক্তি স্থানান্তরের উদ্যোগও নিতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিবেচনা করা যায় পাট (জুট টেক্সটাইল), পোশাক (ফ্যাশন ও ডিজাইন অংশ) এবং কৃষি (কৃষি প্রযুক্তিভিত্তিক) শিল্প। বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী ও টেকনিক্যাল কর্মীদের পারস্পরিক যাতায়াত বৃদ্ধিও এখন প্রাসঙ্গিক। চীন বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দিচ্ছে। এর সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে। আমি মনে করি, বর্তমানে সড়ক ও রেলপথে যোগাযোগ বাড়ানোর প্রতি দু'টি দেশকে বিশেষভাবে মনোযোগী হতে হবে।

সাম্প্রতিক সময়ে, চীন ছাড়াও ভারত ও জাপান বাংলাদেশকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আর্থিক সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছে। বিশ্বব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকও তাদের সহায়তা অব্যাহত রাখবে। বাংলাদেশের জন্য জরুরি হচ্ছে এসব বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা, অগ্রাধিকার নির্ধারণে কৌশলী হওয়া, সাশ্রয়ীভাবে বাস্তবায়ন করা এবং এ লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা। এটি করতে পারলে আমরা চীন, ভারত, জাপান ও অন্যান্য প্রতিটি দেশের দ্বিপাক্ষিক ও বহুমাত্রিক সহযোগিতা আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজে লাগাতে সক্ষম হব। বঙ্গোপসাগরের কৌশলগত অবস্থানও তখন হয়ে উঠবে আমাদের দ্রুত প্রবৃদ্ধির চাবিকাঠি। তবে কেবল অবকাঠামো সুবিধা বাড়ালেই চলবে না, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, ব্যবসা সহায়ক আইন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতিও মনোযোগ দিতে হবে। বাংলাদেশের জন্য অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমাদের

অর্থনীতির প্রায় অর্ধেক এখন বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত। উন্নয়ন খাতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা যত বাড়বে, আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তা কার্যকরভাবে কাজে লাগানোর প্রয়োজনীয়তাও সমান্তরালভাবে বাড়বে, আর এজন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। তা করতে সক্ষম হলে শক্তিশালী অবস্থান নিয়েই বাংলাদেশ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবে, তার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে।

সমকাল
২৭ মে ২০১৭

ভারত-চীন উভয়ের সঙ্গেই সুসম্পর্ক রাখতে হবে

মোস্তাফিজুর রহমান

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আসন্ন বাংলাদেশ সফর নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা হচ্ছে। তার এ সফরে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে কতটা লাভবান হতে পারে সে দিকটিও বিশ্লেষণ করছেন অর্থনীতিবিদরা। এ বিষয়ে সকালের খবরের সঙ্গে একান্তে কথা বলেছেন গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান। তার সাক্ষাৎকারের বিশেষ অংশ নিচে দেওয়া হল। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সকালের খবরের সিনিয়র প্রতিবেদক এসএম আলমগীর।

সকালের খবর: ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বৈশ্বিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের গুরুত্ব অনেক। দুই বৃহৎ প্রতিবেশী ভারত ও চীনের সঙ্গে রয়েছে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। কিন্তু দু'দেশই চায় বাংলাদেশের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কী কৌশল হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি হল সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব কারো সাথে বৈরিতা নয়। বাংলাদেশকে ভারত বা চীন, যেকোন একটিকে বেছে নেওয়া ঠিক হবে না। আমরা যে দেশ থেকে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে আমদানি করলে আমাদের সাশ্রয় হবে সে দেশ থেকেই আমরা আমদানি করব। ভারত-চীন দু'টিই অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী দেশ, একবিংশ শতাব্দীর অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। দু'টি দেশের সঙ্গেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হবে বাংলাদেশকে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা, রফতানির সুযোগ, প্রতিযোগিতা সক্ষমতা সৃষ্টির সুযোগ,

বিনিয়োগ আকর্ষণের সম্ভাবনা – এসব বিষয়ে যে দেশের সাথে তুলনামূলক সুবিধা বেশি পাওয়া যাবে, সে দেশকেই ক্ষেত্রবিশেষে বাংলাদেশ অগ্রাধিকার দেবে। উপ-আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি হলে দু'দেশকে সাথে নিয়ে বাংলাদেশ সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করবে। দুই দেশের সঙ্গেই সুসম্পর্ক রেখে বাংলাদেশকে অগ্রসর হতে হবে বলে আমি মনে করি।

সকালের খবর: বাংলাদেশের অধিকাংশ মেগা প্রজেক্টে চীনের আধিপত্য রয়েছে। আবার ভারত মহাসাগরের গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও মিয়ানমারের কাজও করছে চীন। বাংলাদেশের গভীর সমুদ্র বন্দরের কাজ পেতে চাইছে ভারত-চীন উভয় দেশই। এ ধরনের বড় প্রকল্পে ভারত আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছে কি না?

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: চীনের প্রাধান্য থাকাটা এক অর্থে স্বাভাবিক কারণ। চীনের অর্থনৈতিক শক্তিমত্তা, বিনিয়োগের জন্য উদ্বৃত্ত অর্থ, কারিগরি উৎকর্ষতা অনেক ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে ভাল। বিশেষত অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে এটি দৃশ্যমান। এ অঞ্চলে ভারতের স্বার্থ শুধু অর্থনৈতিক নয়, তা রাজনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক। সে ক্ষেত্রে ভারত একটি কৌশলগত অবস্থান নিয়ে অগ্রসর হবে – সেটিই স্বাভাবিক। বাংলাদেশকে একটা ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে হবে এবং এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্বার্থই প্রাধান্য পাওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়, ভারতও ক্রমান্বয়ে অর্থনৈতিক শক্তি সঞ্চয় করছে। বাংলাদেশে বিনিয়োগের ভারতেরও প্রচুর আগ্রহ আছে। যেখানে সম্ভব, যৌথতার ভিত্তিতে বাংলাদেশকে অগ্রসর হতে হবে। গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ যদি অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হয়, তবে ত্রিদেশীয় সহযোগিতার মাধ্যমেও তা হতে পারে। বাংলাদেশ তার ভৌগোলিক অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে চীন ও ভারতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাণিজ্য সহজীকরণ - এগুলোকে যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে তাহলে তা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক ফলাফল আনবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বাংলাদেশের আমদানি পণ্যের জন্য চীন হচ্ছে প্রধান বাজার। এর পরেই আছে ভারত। এই দু'টি দেশে আমরা অনেক পণ্য প্রতিযোগিতা-সক্ষমতার ভিত্তিতে সরবরাহ করতে সক্ষম। অনেক কাঁচামাল আমরা এ দু'টি দেশ থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে আমদানি করতে পারি। ভোগ্যপণ্য যদি আমরা কম মূল্যে এই দুই দেশ থেকে আমদানি করতে পারি তাহলে সাধারণ ভোক্তারা উপকৃত হোন, কাঁচামাল আনলে উৎপাদক ও রফতানিমুখী উদ্যোক্তারা উপকৃত হোন। এ দু'দেশের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা সক্ষম হলে বিশ্ববাজারে আমরা প্রতিযোগিতা-সক্ষমতা বাড়াতে পারব।

বাংলাদেশ-ভারত ও চীনের সঙ্গে নেপাল ও ভুটানকে নিয়ে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা করতে পারলে সেটি হবে একটি সম্ভাবনাময় উদ্যোগ। এখন আমরা বাংলাদেশ-চীন-

ভারত-মিয়ানমার অর্থনৈতিক করিডোরের (বিসিআইএম) কথা বলছি। এই বিসিআইএম উদ্যোগ আমাদের জন্য সফল হবে কি না তা অনেকটা নির্ভর করবে চীনের ইউনান প্রদেশসহ দক্ষিণাঞ্চল, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং মিয়ানমারের সঙ্গে কতটা নিবিড় অর্থনৈতিক সম্পর্ক আমরা গড়ে তুলতে পারছি তার ওপর। এ ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'ড্রাইভার'।

সকালের খবর: ভারত-বাংলাদেশ-নেপাল-ভুটানের সঙ্গে উপ-আঞ্চলিক করিডোর করতে হলে বাংলাদেশকে কী ধরনের কাজ করতে হবে?

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: ভারত-বাংলাদেশ-নেপাল-ভুটানের সঙ্গে উপ-আঞ্চলিক করিডোরের জন্য অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নতি করতে হবে। ভারত বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে পণ্য সরবরাহের সুযোগ চাইছে, সে ক্ষেত্রে কী ধরনের বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে, অপারেটিং প্রটোকল ও ট্রেড ফেসিলিটেশন কী হবে, কী ধরনের সার্ভিস চার্জ হবে এগুলো সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা চাই। সেক্ষেত্রে ভারত কীভাবে সহায়তা করতে পারে সেটি দেখতে হবে। ভারতে আমরা যেসব পণ্য রফতানি করি তা অশুল্ক বাধার সম্মুখীন হয়। এ ক্ষেত্রে, পারস্পরিক স্ট্যান্ডার্ড গ্রহণ করার জন্য আমরা দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করতে পারি। আর তার জন্য বিএসটিআই এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে, ভারত প্রযুক্তিগত ও কারিগরি সহায়তা দিতেও সম্মত হয়েছে। এসব মিলিয়ে আমার মনে হয় আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা, বিসিআইএম ইকোনমিক করিডোর, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক নিকট সম্পর্ক, চীনের সাথে দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ বাণিজ্য সম্পর্ক – এই যে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ককে নিবিড় করার একটা সুযোগ এসেছে তা কাজে লাগাতে হবে। সেসব সম্ভাবনাকে বাংলাদেশ যদি তার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বিত করে বাস্তবে রূপ দিতে পারে, তাহলে তা হবে সকল অংশী-দেশের জন্যই লাভজনক।

সকালের খবর: ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আসন্ন বাংলাদেশ সফরে তিস্তা চুক্তি নাকি হচ্ছে না। এ বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: তিস্তা চুক্তির ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই চাপ অব্যাহত রাখতে হবে। ইতিমধ্যেই জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর এবারের বাংলাদেশ সফরে তিস্তা চুক্তি হচ্ছে না। তবে আমাদের জাতীয় একটি আকাঙ্ক্ষা এবং দাবি থাকবে তিস্তা চুক্তির সম্পাদন এবং সেটি এমনভাবে হতে হবে যাতে ন্যায্যতার ভিত্তিতে পানি বণ্টন হয়। ভারতের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বিচার-বিবেচনা থাকতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বোঝাপড়ারও বিষয় থাকতে পারে। বাংলাদেশ তো আলাপ-

আলোচনা করবে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে; ভারত সরকারের দায়িত্ব তার আভ্যন্তরীণ বিরোধের নিষ্পত্তি করা। অন্য যেসব ক্ষেত্রে আমাদের আলোচনা হবে, তার আলোকে সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে যদি ইতিবাচক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তবে সেটিকে কাজে লাগিয়ে পরবর্তীতে হলেও তিস্তা চুক্তি করা সম্ভব বলে আমার মনে হয়।

সকালের খবর: ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। এই বাণিজ্য ঘাটতি দূর করার জন্য কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান: দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ঘাটতিকে বিশ্লেষণ করতে হবে বৈশ্বিক বাণিজ্যের প্রেক্ষাপটে। বর্তমানে, বৈশ্বিক বাণিজ্যের নিরীখে বাণিজ্য ঘাটতি বড় কোন দুশ্চিন্তার কারণ হওয়া উচিত নয়। বৈশ্বিক বাণিজ্য ঘাটতি কীভাবে কমানো যায় সেদিকেই বেশি নজর দিতে হবে। কোন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি বেশি হবে, আবার কোন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত হবে। আমেরিকার সঙ্গে আমাদের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে অনেক উদ্বৃত্ত আছে, আর এর পেছনে ভারত ও চীনের সাথে যে বড় বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে তার একটি উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। যেমন, ভারত থেকে তৈরি পোশাকের কাঁচামাল এনে বাংলাদেশের রফতানিমুখী শিল্প তা ব্যবহার করে মার্কিন বাজারে বিক্রয় করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দ্বিপাক্ষিক ইতিবাচক ও উদ্বৃত্ত ভারসাম্য সৃষ্টি করে। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি থাকাটা তাই দুশ্চিন্তার বিষয় নয়। চিন্তার বিষয় হল, ভারতের যে ৪৫০ বিলিয়ন ডলারের আমদানি বাজার রয়েছে, সে বাজারে আমরা কেন শক্ত অবস্থান নিতে পারছি না, প্রতিযোগিতা সক্ষমতার সাথে রফতানি বৃদ্ধি করতে পারছি না। ভারতের এই বিশাল বাজারে চীন ৫০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রফতানি করে। সেখানে আমরা মাত্র ৫০০ মিলিয়ন ডলারের মত পণ্য রফতানি করছি। ভারতে (ও চীনের সাথে) অর্থনৈতিক সম্পর্ক নিবিড় করে, বিনিয়োগ আকর্ষণ করে, সরবরাহ ও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি করে রফতানি বৃদ্ধি সম্ভব। আর এটি ভারত ও চীনের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাসেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

সকালের খবর
৬ জুন ২০১৫

শ্রমবাজার ৩% খুললে এলডিসি ১৫ হাজার কোটি ডলারের বাজার পাবে

মোস্তাফিজুর রহমান

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ফখরুল ইসলাম

বাংলাদেশ সম্প্রতি ডব্লিউটিওতে স্বল্পোন্নত দেশের সমন্বয়ক নির্বাচিত হয়েছে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ কীভাবে লাভবান হতে পারে এবং বিশ্ব বাণিজ্যে অবস্থান শক্ত করতে বাংলাদেশ কী কী পদক্ষেপ নিতে পারে – সে ব্যাপারে প্রথম আলোর সঙ্গে কথা বলেছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান।

প্রথম আলো: বাংলাদেশ পঞ্চমবারের মত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (ডব্লিউটিও) স্বল্পোন্নত দেশ বা এলডিসির সমন্বয়ক হল। এতে লাভ কী হল?

মোস্তাফিজুর রহমান: বিশ্বে বর্তমানে ৪৮টি স্বল্পোন্নত দেশ রয়েছে, এর মধ্যে ৩৪টি ডব্লিউটিওর সদস্য। আরও ৮টি দেশ ডব্লিউটিওর সদস্য হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। সমন্বয়ক হওয়ার বড় লাভ হচ্ছে উন্নত দেশগুলোর কাছে এলডিসির দাবি ও অধিকার আদায়ে নেতৃত্ব দেবে বাংলাদেশ। সব স্বল্পোন্নত দেশের সে সক্ষমতা নেই। এ জায়গায় যেতে পারে না। সমন্বয়ক হলে ডব্লিউটিওর অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশ নিতে পারবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের স্বার্থের বাইরে চলে যেতে পারে – এ রকম কোন বিষয় কোন বৈঠকে উপস্থাপিত হলে, বাংলাদেশ তখন তা নিয়ে কথা বলতে পারবে; একই সাথে অন্যান্য এলডিসি-র ইস্যুগুলিকেও বাংলাদেশ তুলে ধরতে পারবে। সব মিলিয়ে গোটা

বিষয়টিকে আমি বাংলাদেশের অর্জন ও স্বীকৃতি হিসেবেই বিবেচনা করব। স্মর্তব্য যে, এ ভূমিকা বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো পালন করছেনা।

প্রথম আলো: বলা হয়, অনেকেই সমন্বয়ক হতে চায় না, তাই ঘুরেফিরে দায়িত্বটি বাংলাদেশের ঘাড়ে আসে। তাহলে অর্জনটা কীভাবে হল?

মোস্তাফিজুর রহমান: ডব্লিউটিওতে এলডিসির সমন্বয়ক নির্বাচিত হয় যদিও দেশের নামের আদ্যক্ষরের ক্রম অনুযায়ী (অ্যালফাবেটিক্যালি), তবে এটিও ঠিক যে সব এলডিসিরই ৩৪টি দেশের সমন্বয়ক হওয়ার সক্ষমতা নেই। ডব্লিউটিওতে ১২টি স্বল্পোন্নত দেশের কোন অফিসই নেই। জেনেভাতে বাংলাদেশের যেমন একটি স্থায়ী মিশন রয়েছে, দেশেও রয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি ডব্লিউটিও সেল। মোটকথা, এলডিসির মধ্যে বাংলাদেশের একটা শক্ত অবস্থান রয়েছে। তা ছাড়া শুরু থেকেই বাংলাদেশ ডব্লিউটিওকে গুরুত্ব দিয়ে আসছে। ১৯৯৫ সালে ১২২টি সদস্য নিয়ে সংস্থাটি যখন গঠিত হয়, তখন থেকেই বাংলাদেশ সদস্য। বহুপক্ষীয় বাণিজ্য ব্যবস্থার মধ্যে নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে সীমিত সাধ্যের মধ্যেও চেষ্টা করছে বাংলাদেশ। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার আলোচনায়ও ধারাবাহিকভাবে ভূমিকা রেখে চলেছে।

প্রথম আলো: সব এলডিসির স্বার্থের জায়গাটি তো একরকম নয়। এশিয়ার এলডিসি ও আফ্রিকার এলডিসির স্বার্থের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ দুইয়ের সমন্বয় ঘটিয়ে সমন্বয়কের দায়িত্ব কীভাবে পালন করবে বাংলাদেশ?

মোস্তাফিজুর রহমান: বাংলাদেশের ওপর স্বল্পোন্নত অন্যান্য দেশের আস্থা রয়েছে। এর কারণ নানাবিধ রফতানি আয়, প্রবাসী আয় (রেমিট্যান্স) এবং মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) বাণিজ্যের অংশ ইত্যাদি সব নিয়ে বাণিজ্য বিষয়ে বাংলাদেশের বড় আগ্রহ আছে, এ সম্বন্ধে সব স্বল্পোন্নত দেশগুলি সম্যকভাবে অবগত। ডব্লিউটিওতে আলোচনা করার সক্ষমতা তত্ত্ব-উপাত্ত-যুক্তি দিয়ে বক্তব্য তুলে ধরার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের মিশনের সক্ষমতা আছে। আর এলডিসি সমন্বয়ক দেশ অন্য 'এলডিসি অব লেবার'-এর মাধ্যমেই কাজ করে থাকে। সুতরাং সব মিলিয়ে উন্নত দেশগুলোর কাছে বাংলাদেশ ও এশীয় এলডিসির প্রধান দাবি হচ্ছে পণ্য বাণিজ্যে বিশেষ করে তৈরি পোশাক রফতানিতে শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার। আর আফ্রিকার এলডিসির অন্যতম চাওয়া হচ্ছে কৃষি। তুলা খাতে ভর্তুকির অপসারণ এই দুই দাবির মধ্যে কিছুটা সাংঘর্ষিক দিক যে নেই তা বলা যাবে না। বাংলাদেশের প্রতি সবার এ রকম একটি আস্থা রয়েছে যে, বাংলাদেশ

দুইয়ের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম এখানে পারস্পরিক গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে একটি অভিন্ন অবস্থানে আসা অবশ্য বেশ কঠিন বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

প্রথম আলো: শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার তো বাংলাদেশ এখনো পেল না।

মোস্তাফিজুর রহমান: এটি নিয়ে আলোচনা প্রথম থেকেই হচ্ছে। ২০০৫ সালে হংকংয়ে অনুষ্ঠিত ডব্লিউটিওর মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে একটি সিদ্ধান্তও হয়েছিল যে, উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো শুল্ক ও কোটামুক্ত বাজার প্রবেশাধিকার দেবে। সব দেশ মেনে নিলেও বাদ সাধে তখন যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্র তখনই তার অপারগতা জানিয়েছিল এবং ৯৭ শতাংশ পণ্য রফতানিতে শুল্ক ও কোটামুক্ত বাজার প্রবেশাধিকারের বিষয়টি নিয়ে এসেছিল। ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ (ইইউ ইবিত্র) বেশ কিছু দেশে রফতানিতে বর্তমানেও আমরা শুল্কমুক্ত সুবিধা পাই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে তৈরী পোষাক জিএসপি স্কীমে অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু জিএসপি স্কীম দেওয়া হয় স্বতঃপ্রণোদিতভাবে; তার দীর্ঘ মেয়াদী স্থায়িত্বও নেই। ডব্লিউটিওতে শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা পেতে তা স্থায়ী ভিত্তিতে এবং একটি গ্যারান্টিসহ পাবার পরিস্থিতি হবে। এজন্য ডব্লিউটিও-র আওতায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহ সুবিধা পেতে আগ্রহী।

প্রথম আলো: হংকং বৈঠক শেষে তো তখনকার বাণিজ্যমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী দেশে ফিরে ঘোষণা দিয়েছিলেন, ব্যাঙের পা থেকে উড়োজাহাজ পর্যন্ত শূন্য শুল্কে রফতানি করা যাবে।

মোস্তাফিজুর রহমান: হ্যাঁ। কিন্তু যে ৩ শতাংশ বাইরে থেকে গেল, এর মধ্যেই থেকে যেতে পারে আমাদের তৈরি পোশাক। ফলে হংকং বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাণিজ্যিক ও অর্থপূর্ণভাবে কার্যকর হবার ক্ষেত্রে সংশয় থেকে গেল। বাংলাদেশও শুল্ক ও কোটামুক্ত বাজার সুবিধাসহ তৈরি পোশাক যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি করতে পারবে না, যদি হংকং সিদ্ধান্ত কখনো বাস্তবায়িত হয়। তবে এ ব্যাপারে একটি চাপ কিন্তু সব সময়ই দিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। সব সময়ই এটি নিয়ে কথা বলছে, এজেন্ডায় রেখেছে। সেবা খাতের বাণিজ্য নিয়েও কথা বলছে। এলডিসির জন্য একটি বড় সম্ভাবনা হচ্ছে সেবা খাতের বাণিজ্যে ছাড় (সার্ভিস ওয়েভার)। অর্থাৎ এলডিসি থেকে উন্নত দেশগুলোতে দ্রুততার সাথে ও শিথিল শর্তে সেবা খাতের বাজার উন্মুক্ত করার আলোচনা শুরু হয়েছে। আগামী জুলাইয়ের মধ্যে উন্নত দেশগুলো এ বিষয়ে তাদের অফারের কথা ডব্লিউটিওকে জানাবে। একটি হিসাবে এসেছে, উন্নত দেশগুলো তাদের ৩ শতাংশ শ্রমবাজার উন্মুক্ত করলে এলডিসির জন্য তা ১৫ হাজার কোটি ডলারের বাজারের সুযোগ তৈরি করতে

পারে। সেবাখাতের চারটি মোডেই বাংলাদেশের আগ্রহ আছে; তবে মোড-৪ এর ক্ষেত্রে আমাদের আগ্রহ সবচেয়ে বেশী। সেজন্যই সক্ষমতা বৃদ্ধি, অফার ও রিকোয়েস্ট লিস্টের ভিত্তিতে বাজার সুবিধার সুযোগগুলো বের করা ও সে ভিত্তিতে সক্ষমতার বিষয়গুলো নির্দিষ্ট করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী।

প্রথম আলো: সেবা খাতের বাণিজ্যে ছাড় উন্নত দেশগুলো ১, ২ বা ৫ বছর পরেও যদি দেয়, সেই সুযোগটি কাজে লাগানোর জন্য আমরা প্রস্তুত কি না।

মোস্তাফিজুর রহমান: প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অনেক দুর্বলতা আছে। আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে, বাজার উন্মুক্ত হলে যাতে সুযোগ নেওয়া যায়। এ ব্যাপারে ব্যাপক বিশ্লেষণ ও গবেষণার দরকার রয়েছে। কয়েকটি খাতকে অবশ্য এর মধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। কেয়ারিং ইন্ডাষ্ট্রি, মেডিকেয়ার, নার্সিং, মেডিক্যাল টেকনিশিয়ান – এসব খাতে চাহিদা উন্নত বিশ্বে বাড়বে। এসব ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টি – এসব কাজ আমাদের শুরু করতে হবে ব্যাপকভাবে ও বৃহত্তর পরিসরে। প্রশিক্ষণের গুণগতমান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেখা গেল, একজন নার্সিং পাস করলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর সনদ উন্নত দেশগুলো গ্রহণ করল না। সে জন্য এখন থেকেই সুষ্ঠু পরিকল্পনা করে এগোতে হবে, যাতে শিক্ষার মান ভাল হয়, ডিগ্রী ইকুইভেলেন্স নেওয়া যায়, 'ইকনোমিক লিড টেস্ট' পার হওয়া যায়।

প্রথম আলো: শুধু বাংলাদেশ নয়, সব এলডিসির স্বার্থে বাংলাদেশ আর কী ভূমিকা পালন করতে পারে?

মোস্তাফিজুর রহমান: উন্নত দেশগুলো তাদের জাতীয় আয়ের শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ সহায়তা (এইড) হিসেবে দরিদ্র দেশগুলোকে দেওয়ার কথা। জাতিসংঘের কাছে তাদের এ অঙ্গীকার ছিল। আমরা বলছি, এ থেকে শূন্য দশমিক ২ শতাংশ যাতে এলডিসিগুলো পায়। নরওয়েসহ কোন কোন দেশ অবশ্য এ অঙ্গীকার অনুযায়ী সাহায্য দিচ্ছে; অনেকেই নয় যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়া কারিগরি সহায়তা, বিশেষ ও বিভাজিত উদ্যোগের আওতায় সাহায্য, দোহা রাউন্ডের অঙ্গীকার রক্ষা এসব বিষয়ে আমাদেরকে আরও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে। এই বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ তার কণ্ঠস্বর আরও জোরালো করতে পারে।

প্রথম আলো: এলডিসির সমন্বয়ক হিসেবে বাংলাদেশের সক্ষমতার কথা বললেন, কিন্তু এ কথা তো প্রায়ই বলা হয় যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের দর-কষাকষিতে বাংলাদেশ বরং দুর্বল।

মোস্তাফিজুর রহমান: এখানে গ্রুপ হিসাবে আমাদের তুলনামূলকভাবে দুর্বল অবস্থানের কথা ভুললে চলবে না। আর অবশ্যই আমাদের দরকষাকষির সক্ষমতাও বৃদ্ধি করতে হবে। বিশ্লেষণ সক্ষমতা যুক্তি তুলে ধরার ক্ষমতা বাড়াতে হবে। ডব্লিউটিওতে এখন অনেক আইনী বিষয় চলে আসছে। আমাদের বাণিজ্য বিষয়ক আইনী সক্ষমতা নেই বলা চলে। এসব জায়গায় সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। হংকং মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে যোগ দেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫০ জনের দলে আইনজীবীই ছিলেন ২৫০ জন। আমাদের কজন ছিলেন? একজনও নয়। বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থা চলেই এখন আইনী বাচনে।

প্রথম আলো: আমাদের করণীয় কী তাহলে?

মোস্তাফিজুর রহমান: বাংলাদেশের অর্থনীতি উত্তরোত্তর বৈশ্বিক অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে। এতে পণ্য বাণিজ্য, সেবা বাণিজ্য, বিনিয়োগ, ব্যবসা, ই-কমার্স, বৈদেশিক এসব প্রত্যেকটি খাতে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে যাতে আমরা বিশ্ব অর্থনীতির সাথে শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে সম্পৃক্ত হতে পারি। হোম-ওয়ার্ক করতে হবে। বিনিয়োগ প্রণোদনা সহায়তা বাজার সুবিধা প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, সরবরাহ সক্ষমতা সৃষ্টির জন্য কৌশলপত্র করে বাস্তবায়ন করতে হবে। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে দক্ষ জনশক্তি বের করতে হলে যুগোপোযোগী কারিকুলাম চালু করতে হবে। মানসম্মত শিক্ষার নিশ্চয়তা দিতে হবে। বাণিজ্য আইন (ট্রেডল) বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ডব্লিউটিও সেল, বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই) এসব সংস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে।

বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ে বাণিজ্য ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হওয়া দরকার। ডব্লিউটিও-র অন্যতম শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ডিসপিউট সেটেলম্যান্ট বডি (ডিএসবি)। এর সুবিধা নিতে হলে এটি খুবই জরুরী।

প্রথম আলো
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

জিএসপি ফেরতের প্ল্যাটফর্ম হতে পারে 'টিকফা'

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। দীর্ঘ দিন ধরে বাণিজ্য নিয়ে গবেষণা করছেন তিনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের স্থগিত হওয়া জিএসপি এবং দেশটির সামগ্রিক জিএসপি কর্মসূচি নিয়ে সমকালের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আবু হেনা মুহিব।

সমকাল: সম্প্রতি জিএসপি কর্মসূচি নবায়ন করেছে যুক্তরাষ্ট্র; কিন্তু বাংলাদেশের জিএসপি ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে না। এতে কি বাংলাদেশকে বঞ্চিত করা হল, নাকি বাংলাদেশের বিষয়টি ভিন্ন?

গোলাম মোয়াজ্জেম: জিএসপি নবায়নের সঙ্গে বাংলাদেশের জিএসপি ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি সম্পর্কযুক্ত নয়। কারণ, জিএসপির মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পর পুনরায় নবায়ন হয়েছে। আর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে জিএসপি স্থগিত করা হয়। এরপর যুক্তরাষ্ট্রে শ্রম প্রতিনিধির কার্যালয়ের (ইউএসটিআর) দেওয়া ১৬ শর্তের অগ্রগতি নিয়ে এরই মধ্যে তিন দফা পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা হয়েছে। অগ্রগতিও সন্তোষজনক। তবে বেশ কিছু শর্তের কিছু অংশ এখনও বাকি রয়েছে। পরবর্তী মূল্যায়নে, ইউএসটিআর বাংলাদেশের অগ্রগতি সন্তোষজনক মনে করলে জিএসপি ফিরিয়ে দিতে পারে। তবে এজন্য আবার পর্যালোচনায় বসতে হবে। শুধু বাংলাদেশ নয়, অভিযোগ পাওয়া অনেক দেশের বেলায়ই এটি হচ্ছে।

সমকাল: বাংলাদেশ ছাড়া আর কোন দেশের জিএসপি স্থগিত রয়েছে?

গোলাম মোয়াজ্জেম: এখন শুধু বাংলাদেশ এবং রাশিয়ার জিএসপি স্থগিত রয়েছে। তবে বিভিন্ন অভিযোগে আরও ১১টি দেশের জিএসপি পর্যালোচনা চলছে। যদিও এসব দেশের জিএসপি স্থগিত নেই। যেমন, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়েছে ২০০৭ সালে। তখন জিএসপি স্থগিত করা হয়নি। ২০১৩ সালে রানা প্লাজা ধসের মত বড় দুর্ঘটনার পর পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, জিএসপি স্থগিত করতে হয়েছে। বিভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তিতে পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে নিজের মত করে সিদ্ধান্ত নেয় যুক্তরাষ্ট্র।

সমকাল: আর কোন দেশের বিরুদ্ধে এ-সংক্রান্ত আর কী অভিযোগ রয়েছে?

গোলাম মোয়াজ্জেম: বাংলাদেশের শ্রম অধিকার নিয়ে মার্কিন শ্রমিক সংগঠন এএফএল-সিআইও যেমন অভিযোগ করেছে, সংগঠনটি একই অভিযোগ করেছে ইরাক, জর্জিয়া ও ফিজির বিরুদ্ধে। ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে শেভরন করপোরেশন। ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে করেছে ইন্টারন্যাশনাল ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি অ্যালায়েন্স। এ রকম অভিযোগ রয়েছে ফিলিপাইন, ইউক্রেন, উজবেকিস্তান ও নাইজারের বিরুদ্ধে।

সমকাল: অভিযুক্ত এসব দেশের জিএসপি তো স্থগিত করা হয়নি?

গোলাম মোয়াজ্জেম: আপাতত স্থগিত করা হয়নি। পর্যালোচনা চলছে। বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্র নিজের মত করেই সিদ্ধান্ত নেয়। কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হলে এসব দেশের জিএসপি অব্যাহত থাকতে পারে। আবার সন্তোষজনক মনে না করলে স্থগিতও হয়ে যেতে পারে। এটি নিতান্তই মার্কিন কর্তৃপক্ষের নিজেদের বিষয়।

সমকাল: বাংলাদেশের জিএসপি স্থগিত করা এবং দুই বছরের মাথায়ও পুনর্বহাল না করার পেছনে রাজনৈতিক কোন কারণ আছে?

গোলাম মোয়াজ্জেম: এটিকে এক বাক্যে রাজনীতি না বলাই ভাল। কারণ, বাংলাদেশ যদি যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া ১৬ শর্তের সব বাস্তবায়নের কাজ শেষ করত এবং তার পরও জিএসপি ফিরিয়ে দেওয়া না হত, তাহলে এ ধরনের অভিযোগের কথা আসতে পারত। আমি মনে করি, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এ অভিযোগের ভিন্ন একটি তাৎপর্য আছে। সেটি হচ্ছে, এক ধরনের রাজনৈতিক চাপ তৈরি করা। এটিরও প্রয়োজন রয়েছে।

সমকাল: সরকারের এবং শিল্প উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, ১৬ শর্তের প্রায় সবক'টিই বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

গোলাম মোয়াজ্জেম: শর্তগুলোর মধ্যে অন্তত ১২টি পূরণ করা হয়েছে বেশ ভালভাবেই। তবে সংশোধিত শ্রম আইনের বিধিমালা হয়নি। কারখানার একটি তথ্য ভাণ্ডার হয়েছে; কিন্তু শ্রমিকদের তথ্য ভাণ্ডার হয়নি। রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল বা ইপিজেডে শ্রমিক ইউনিয়ন নিয়ে জটিলতা কাটেনি, চিংড়ি শিল্পে দু'টি কমপ্লায়েন্স শর্তের বাস্তবায়ন নিয়ে কিছুই জানা যাচ্ছে না। অর্থাৎ এ শর্তগুলো আংশিক পূরণ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে যত রকম সংস্কার হয়েছে, সেগুলোর ধারাবাহিকতা প্রয়োজন।

সমকাল: প্রধান রফতানি পণ্য তৈরি পোশাক তো কখনোই মার্কিন জিএসপি সুবিধার আওতায় ছিল না। আবার যেসব পণ্য এ সুবিধা পেত স্থগিত হওয়ার পরও সেসব পণ্যের রফতানি কমেনি। এ পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন জিএসপি বাংলাদেশের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

গোলাম মোয়াজ্জেম: শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের কোন দেশেরই তৈরি পোশাক যুক্তরাষ্ট্রে শতভাগ শুল্কমুক্ত সুবিধা পায় না। তবে বাংলাদেশের সঙ্গে যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা কাঠামো চুক্তি (টিকফা) রয়েছে, সে হিসেবে প্রধান পণ্যকে জিএসপিভুক্ত করার বিষয়ে বাংলাদেশ জোরালো দাবি তুলতেই পারে। আর স্থগিত হওয়ার পরও গত দুই বছরে জিএসপিভুক্ত পণ্যের রফতানি আয় না কমার কারণটি একেবারেই কাকতালীয়। ২০১৩ সালের জুলাই মাসে, ১২২ দেশের জিএসপির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে। এর মাত্র দুই মাস পর সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের এ সুবিধা স্থগিত করা হয়। ফলে সব দেশের পণ্যকেই শুল্ক দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে হয়েছে। এ সুযোগে বাংলাদেশের জিএসপি স্থগিত হলেও আগে এ সুবিধা পাওয়া পণ্যগুলো প্রতিযোগিতার মুখে পড়েনি। এ কারণে এসব পণ্যের রফতানি গত দুই বছরে খুব একটি কমেনি। তবে ১২২ দেশের জিএসপি আবার নবায়ন হওয়ায় এবার বাংলাদেশের এসব পণ্য কঠিন প্রতিযোগিতার মুখে পড়বে।

সমকাল: জিএসপি ফিরে পেতে বাংলাদেশ এখন কীভাবে এগোতে পারে?

গোলাম মোয়াজ্জেম: আমি মনে করি, এখন দুই ভাবে তৎপরতা চালাতে পারে বাংলাদেশ। প্রথমত, স্থগিত হওয়া জিএসপি পুনর্বহালের চেষ্টা করা এবং পোশাক শিল্পকে এ সুবিধার আওতায় আনার লবিং করা। এ ক্ষেত্রে, অনেক বড় প্ল্যাটফর্ম হতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে

টিকফা চুক্তি। এখানে বাংলাদেশ তার দাবি এবং যুক্তি তুলে ধরে দর কষাকষি করতে পারে। যদিও টিকফার মাধ্যমে সরাসরি এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে না। তবে এর মাধ্যমে বাংলাদেশের এ-সংক্রান্ত দাবিটি জোরালো হতে পারে। টিকফার মাধ্যমেই যুক্তরাষ্ট্র আমাদের পোশাক খাতে অগ্নিনিরাপত্তায় ব্যবহৃত ফায়ার ডোর আমদানিতে শুল্ক প্রত্যাহার করিয়ে নিয়েছে। এ সুবাদে এখন তাদের ফায়ার ডোরের বড় রফতানির বাজার বাংলাদেশ।

সমকাল

১৬ আগস্ট ২০১৫

বাংলাদেশের লাভের জায়গা চারটি

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত ও নেপালের (বিবিআইএন) মধ্যে পারস্পরিক ভূখণ্ড ব্যবহার করে যাত্রী ও পণ্যবাহী যান চলাচলের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই ট্রানজিট-ব্যবস্থা নিয়ে প্রথম আলোর সঙ্গে কথা বলেছেন বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম।

প্রথম আলো: বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত ও নেপালের (বিবিআইএন) মধ্যে পারস্পরিক ভূখণ্ড ব্যবহার করে যাত্রী ও পণ্যবাহী যান চলাচলের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে, পরীক্ষামূলকভাবে কলকাতা-ঢাকা-আগরতলা পথে পণ্যবাহী ট্রাক গিয়েছে। এ থেকে বাংলাদেশ লাভবান হতে পারে?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: এ চুক্তির ফলে বাংলাদেশের বাড়তি লাভের জায়গা হতে পারে চারটি। প্রথমত, আমদানি-রফতানির ক্ষেত্রে; বিশেষত নেপাল ও ভুটানে সহজতর যোগাযোগের জন্য রফতানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। নেপাল ও ভুটানের কাছে সমজাতীয় পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ভারতের পাশাপাশি বাংলাদেশও নতুন আমদানির উৎস হতে পারে। বর্তমানে, নেপাল ও ভুটানে বাংলাদেশের রফতানি যথাক্রমে ২১ দশমিক ৭ মিলিয়ন এবং ৫ মিলিয়ন ডলার, অন্যদিকে ভারতের রফতানি যথাক্রমে ৩ দশমিক ৯ বিলিয়ন এবং ৭৮১ মিলিয়ন ডলার। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করে এ তিনটি দেশের পণ্য বাণিজ্য হলে বিভিন্ন শুল্ক, মাশুল ইত্যাদির মাধ্যমে বাড়তি রাজস্ব আদায় হতে পারে। তৃতীয়ত, উপ-আঞ্চলিক যোগাযোগ বৃদ্ধির কারণে স্থানীয় পরিবহন অপারেটর ও লজিস্টিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি

হবে। চতুর্থত, এ চুক্তির ফলে আঞ্চলিক পর্যায়ে উৎপাদন নেটওয়ার্ক গড়ে উঠলে বিভিন্ন সম্ভাবনাময় খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রথম আলো: এ ধরনের উদ্যোগ পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে আসিয়ানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। সেটি অর্থনীতির জন্য কতটা উপকারে আসবে?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: বিবিআইএন মোটর চলাচল চুক্তির আওতায় বর্তমানে সীমিতসংখ্যক পথে পণ্য ও যাত্রী চলাচলের সুযোগ হলেও ভবিষ্যতে তা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ করে দেবে। এসব দেশের সঙ্গে বাংলাদেশ সংযুক্ত হলে দ্বিপক্ষীয় পর্যায়ে বাণিজ্য ব্যয় কমে বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাংলাদেশের মোট বাণিজ্য প্রায় ৭ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে ভারত, চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো এ পথে বাণিজ্য করলে বাংলাদশের ভূখণ্ড ব্যবহারের কারণে বাড়তি রাজস্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে, ভারতের সঙ্গে আসিয়ান দেশগুলোর বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ৭২ বিলিয়ন ডলার এবং চীনের সঙ্গে এর পরিমাণ প্রায় ৬৩ মিলিয়ন ডলার। ভবিষ্যতে ভারত ও বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে সড়কপথে যুক্ত হলে একটি আঞ্চলিক উৎপাদন নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে, যা বাণিজ্য ও বিনিয়োগে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

আঞ্চলিক যোগাযোগ

- সহজতর যোগাযোগের সুবাদে আমদানি-রফতানি বাড়তে পারে
- ভূখণ্ড ব্যবহারের সুযোগ দিলে বাড়তি রাজস্ব আদায়
- পরিবহন ও লজিস্টিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগের সুযোগ পাবে
- বিভিন্ন সম্ভাবনাময় খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা

প্রথম আলো: ট্রানজিট-ব্যবস্থা চালু করতে বাংলাদেশে অবকাঠামো উন্নয়নে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ দরকার। এই বিনিয়োগ কীভাবে আসতে পারে?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: বিবিআইএন মোটরযান চলাচল চুক্তিভুক্ত সড়কপথ, স্থলবন্দর এবং নৌ ও সমুদ্রবন্দর-সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য অবকাঠামো বর্তমানে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রস্তুত নয়। এ সমস্যা চুক্তিভুক্ত প্রতিটি দেশের ক্ষেত্রেই কম-বেশি রয়েছে। তবে

ভারতের দিক থেকে পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে ভাল। যেহেতু বাংলাদেশই মূলত ট্রানজিট পথ হিসেবে বেশি ব্যবহৃত হবে, তাই বাংলাদেশ অংশে বেশি বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে। সামগ্রিকভাবে, বাংলাদেশে বিবিআইএনের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রায় ২ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হবে। এর মধ্যে বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ট্রানজিট করিডর উন্নয়নে, বন্দরের দক্ষতা বৃদ্ধিতে এবং স্থলবন্দরের উন্নয়নে অর্থ-সহায়তা দিতে সম্মত হয়েছে। জাপান সরকারের প্রতিষ্ঠান জাইকা অর্থ-সহায়তা দিতে আগ্রহী। তবে এই বিপুল বিনিয়োগের সুফল অনেকাংশে নির্ভর করবে অন্য দেশ তাদের সংশ্লিষ্ট অংশের অবকাঠামো উন্নয়ন একই সময়ে সমভাবে বিনিয়োগ করে সড়কযোগাযোগ পথকে আঞ্চলিক বাণিজ্যের জন্য প্রস্তুত করছে কি না, তার ওপর।

প্রথম আলো: বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করলে মাশুল নির্ধারণ করার সময় কোন কোন বিষয় আসতে পারে?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: বাংলাদেশের ওপর দিয়ে পণ্য চলাচলের ক্ষেত্রে কয়েক প্রকারের মাশুল বা চার্জ বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহারের কারণে যানবাহনের ওপর ট্রানজিট মাশুল আরোপ করা। দ্বিতীয়ত, আভ্যন্তরীণ সড়ক বা অবকাঠামো ব্যবহারের কারণে বাড়তি ব্যয়, ক্ষতি বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন মাশুল ঠিক করা। এ ক্ষেত্রে, সড়কের বিনিয়োগজনিত ব্যয় (নতুন সড়ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে), সড়ক নিয়মিত পরিচর্যা, পরিবেশ দূষণ-ক্ষতি, সড়কে বাড়তি চাপজনিত ক্ষতি, ইত্যাদি বিবেচনার সুযোগ রয়েছে। অন্যদিকে, স্থলবন্দর, নৌবন্দর, সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সেবার জন্য বিভিন্ন শুল্ক-মাশুল ধার্য করা হতে পারে। সামগ্রিকভাবে, শুল্ক আরোপের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ধার্যকৃত শুল্কের ফলে আন্ত-আঞ্চলিক পরিবহন ব্যয় যাতে এমন পর্যায়ে থাকে, যাতে পণ্য পরিবহনকারী দেশগুলো ট্রানজিট হিসেবে বিবিআইএন পথকে ব্যবহারে উৎসাহিত হয়; একই সঙ্গে এ পরিবহনসেবা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের পক্ষে তার সামগ্রিক ব্যয় মেটানো এবং বাড়তি রাজস্ব আদায় যাতে সম্ভব হয়।

প্রথম আলো: বাংলাদেশের ওপর দিয়ে পণ্য নেওয়ার সুবিধা ভারতকে দিলে পণ্যের বর্তমান বাজারে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে কি?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলাদেশের পণ্যের বাজারটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৩ সালে উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলাদেশের মোট রফতানি ছিল ৬৬ মিলিয়ন ডলার। ২০০৫ সালে মোট রফতানি ছিল মাত্র ৫ মিলিয়ন ডলার এবং ২০০৯

সালে ছিল ৩৪ মিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশের মূল রফতানি পণ্যের মধ্যে রয়েছে সিমেন্ট, পাথর, মাছ, সাবান, কাপড়, ইলেকট্রনিক পণ্য, খাদ্যপণ্য, কাচ, ইত্যাদি। এসব পণ্য ভারতের অন্যান্য অংশেও উৎপাদিত হয় এবং তা সীমিত আকারে উত্তর-পূর্ব ভারতে আভ্যন্তরীণ রফতানি হয়। নতুন চুক্তির ফলে পণ্য পরিবহনে সময় ও ব্যয় লক্ষণীয়ভাবে কমে এলে উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলাদেশী রফতানি পণ্যকে ভারতীয় রফতানি পণ্যের সঙ্গে বাড়তি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে পড়তে হবে। তবে বাংলাদেশের রফতানিকারকেরা উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে পণ্য বিপণন করলে এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাদের খুব বড় সমস্যায় ফেলবে না।

প্রথম আলো
৭ নভেম্বর ২০১৫

টিকফায় বাংলাদেশের ওপর যাতে কিছু চাপিয়ে দিতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে

মোস্তাফিজুর রহমান

গতকাল ওয়াশিংটনে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোঅপারেশন ফ্রেমওয়ার্ক অ্যাগ্রিমেন্ট বা টিকফার দ্বিতীয় বৈঠক। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন। টিকফায় বাংলাদেশ কতটা লাভবান হবে বা কোন কোন বিষয় তুলে ধরা দরকার সে বিষয়ে সকালের খবরের সঙ্গে কথা বলেছেন গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি বলেন, টিকফা চুক্তিতে বাংলাদেশের ওপর যাতে যুক্তরাষ্ট্র জোর করে কিছু চাপিয়ে দিতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। তবে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় সফল হওয়া গেলে টিকফা উভয় দেশের জন্য ভাল কিছু বয়ে আনতে পারে। এ বিষয়ে তিনি অনেক কথা বলেছেন। তার সাক্ষাৎকারের বিশেষ অংশ নিচে দেওয়া হল। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সকালের খবরের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক এসএম আলমগীর।

সকালের খবর: টিকফার দ্বিতীয় বৈঠক শুরু হয়েছে ওয়াশিংটনে। এবারের টিকফা বৈঠককে সার্বিকভাবে আপনি কীভাবে দেখছেন? বৈঠকে বাংলাদেশকে কোন বিষয়গুলোর ওপর জোর দেওয়া দরকার?

মোস্তাফিজুর রহমান: দীর্ঘ ১৭ মাস পর টিকফার দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে ওয়াশিংটনে। প্রথম বৈঠক ঢাকায় হয়েছিল গত বছরের এপ্রিলে। এই সময়ের মধ্যে আগের এজেন্ডার পাশাপাশি নতুন কিছু বিষয়ের অবতারণা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও নতুন কিছু বিষয়ে

আলোচনা করতে চায়, ইতিমধ্যে সে বিষয়ে তারা বলেছে। পাবলিক টেন্ডার, আমদানির ক্ষেত্রে ইন্স্যুরেন্স, বাংলাদেশে তুলা রফতানির বিষয়, সার্ভিসিং, মেধাস্বত্ব এসব বিষয় নিয়ে তাদের কিছু দুশ্চিন্তা রয়েছে। এ ছাড়া, নতুন আঞ্চলিক ম্যাকানিজম, নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, শ্রমমান উন্নয়নের বিষয়গুলোও তারা জোরের সঙ্গে এ বৈঠকে তুলে ধরতে চায়। অর্থাৎ বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ে তাদের যেসব স্বার্থ রয়েছে তারা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবে।

অন্যদিকে, বাংলাদেশেরও বেশ কিছু নিজস্ব বক্তব্য থাকবে। বাংলাদেশের তরফ থেকে মূলত তিন ধরনের বিষয় তুলে ধরা হবে। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে যেসব বিষয়ে বাংলাদেশকে উন্নতি ঘটানোর কথা বলা হয়েছিল সেগুলোর অগ্রগতি তুলে ধরবে। কতটুকু বাংলাদেশ করতে পেরেছে, কতটা পারেনি তা জানাবে। দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশের নিজস্ব কিছু দাবি-দাওয়া রয়েছে। বিশেষত, এই প্ল্যাটফর্মকে ব্যবহার করে বাংলাদেশ যাতে আবার যুক্তরাষ্ট্রে অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা বা জিএসপি ফিরে পায় সে বিষয়টি নিশ্চিত করা। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের শূন্য শুল্কে প্রবেশাধিকারের দীর্ঘদিনের দাবি, সে দাবিটি এবার জোরালোভাবে তুলে ধরা দরকার এবং আমি আশা করব বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্যরা সেটি করবে। আগামী মাসে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের (ডব্লিউটিও) দশম সভা বসছে কেনিয়াতে। এখানেও শূন্য শুল্কের বিষয়টি খুবই গুরুত্ব পাবে। হংকংয়ে ডব্লিউটিও'র যে বৈঠক হয়েছিল সেখানে যুক্তরাষ্ট্র আশ্বাস দিয়েছিল, বাংলাদেশের ৯১ শতাংশ পণ্যের শুল্কমুক্ত সুবিধা দেবে। সুতরাং, এবারকার টিকফা বৈঠকে শূন্য শুল্কের বিষয়টিই অন্যতম প্রধান এজেন্ডা হওয়া দরকার। শূন্য শুল্কের বিষয়টি মার্কিন কংগ্রেসে তোলার জন্য অথবা ডব্লিউটিও সম্মেলনে মার্কিন সমর্থন পাওয়া যায় কি না সে বিষয়ে জোর দিয়ে বলা দরকার। সেইসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি ১২টি দেশের সঙ্গে যে ট্রান্স প্যাসিফিক পার্টনারশিপ বা টিপিপি চুক্তি করেছে তার জন্য বাংলাদেশ ভিয়েতনামসহ কয়েকটি দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মুখে পড়বে, সে বিষয়ে বাংলাদেশের দুশ্চিন্তার দিকটি তুলে ধরা দরকার। শুধু তাই নয়, টিপিপির বিপরীতে বাংলাদেশকে যেন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শূন্য শুল্ক সুবিধা দেওয়া হয় সেটি বলতে হবে।

একটি কথা বলা হচ্ছিল যে, এবারের বৈঠকে বাংলাদেশ টিপিপিতে যুক্ত হওয়ার বিষয়ে কথা বলবে কি না। তবে, আমি মনে করি, বাংলাদেশ এখনও টিপিপিতে যুক্ত হওয়ার মত অবস্থায় যায়নি। কারণ, টিপিপিতে যেতে হলে মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ শ্রমমান উন্নয়নসহ অনেক বিষয়ে বাংলাদেশকে উন্নতি ঘটাতে হবে। এসব এখনই নিশ্চিত করতে পারবে না বাংলাদেশ। সুতরাং, এই মুহূর্তে মনে হয় টিপিপিতে যুক্ত হওয়ার বিষয়ে আলোচনা

করার প্রয়োজন নেই। কেননা টিপিপি নিয়ে বাংলাদেশে এখনও পর্যন্ত কোন গবেষণা বা বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়নি। সুতরাং আমি মনে করি, এখন টিপিপিতে যুক্ত না হয়ে টিপিপি চুক্তির ফলে প্রতিযোগী দেশের সঙ্গে যে প্রতিযোগিতার মুখে পড়বে বাংলাদেশকে তা পুষিয়ে নেওয়ার জন্য শুল্কমুক্ত সুবিধাটা আদায় করে নিতে হবে।

আরেকটি বিষয় হল – টিকফার বৈঠকগুলো আরও নিয়মিতভাবে হওয়া দরকার। এভাবে যদি ১৭ মাস পর টিকফার বৈঠক হয় তাহলে চলবে না। নিয়মিত বৈঠক হলে বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো জোরালোভাবে তুলে ধরা যেত। বাংলাদেশে কীভাবে মার্কিন বিনিয়োগ আরও বেশি আকৃষ্ট করা যায় সেগুলোও ঘন ঘন আলোচনা হত।

সকালের খবর: টিকফা বাংলাদেশের জন্য কতটা লাভজনক হবে বলে আপনি মনে করেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: টিকফা হচ্ছে একটি প্ল্যাটফর্ম। যেখানে উভয় দেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা হবে। এর সুবিধা-অসুবিধা নির্ভর করবে আমরা আমাদের বিষয়গুলো কীভাবে তাদের সামনে তুলে ধরতে পারি তার ওপর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চেষ্টা করবে তাদের স্বার্থের বিষয়গুলো কীভাবে আদায় করে নেওয়া যায় সে ব্যাপারে সোচ্চার থাকার। অপরদিকে, আমরা আমাদের সমস্যাগুলো এবং দাবি-দাওয়াগুলো কীভাবে আদায় করতে পারি সে ব্যাপারে বেশি করে জোর দিতে হবে। বাংলাদেশ কিন্তু প্রথম দিকে টিকফা চুক্তি করতে চায়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে চাইছিল। সুতরাং বাস্তবতাটা মেনে নিতে হবে, তবে আমাদের চেষ্টা করা উচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেসব যুক্তি উপস্থাপন করে ভালভাবে প্রস্তুতি নিয়ে সেগুলো খণ্ডন করা বা আমাদের তরফ থেকে জোরালোভাবে উপস্থাপন করা। তবে মনে রাখতে হবে – এ ধরনের প্ল্যাটফর্মে হয়ত কোন কিছু চাপিয়ে দিতে পারে বাংলাদেশের ওপর, সে ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কেননা বৈশ্বিক অনেক বিষয় থাকে যেগুলো হয়ত আইএলও, ডব্লিউটিও বা এ রকম কোন প্ল্যাটফর্মে আলোচনা হতে পারে, সেসব জায়গায় আলোচনার পথ যেন বন্ধ না হয়ে যায় সে ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কেননা, আইএলও বা ডব্লিউটিওর মত প্ল্যাটফর্মে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে অনেক বাড়তি সুবিধা পেয়ে থাকে। সেসব সুবিধা যেন হাতছাড়া হওয়ার মত কোন পরিস্থিতি দ্বিপাক্ষিক এ প্ল্যাটফর্মে না হয় সে ব্যাপারেও আমাদের সজাগ থাকতে হবে।

সকালের খবর: টিকফা আলোচনা শুরুর দিকে এটি নিয়ে বেশ সমালোচনাও ছিল। তখন অনেকেই বলেছেন, টিকফা চুক্তির বিষয়গুলো সঠিকভাবে জানানো হয়নি। এ অভিযোগ সম্পর্কে আপনি কী বলবেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: যারা টিকফা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন তাদের কাছে অবশ্যই বিষয়গুলো পরিষ্কার ছিল। এটি ঠিক, প্রথম দিকে সবাই বুঝতে পারছিল না টিকফায় কী আলোচনা হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র কী চাইছে, না চাইছে – সেগুলো পরিষ্কারভাবে জানা যায়নি। তবে পরের দিকে এর অনেক বিষয় সরকারের তরফ থেকে পরিষ্কার করা হয়েছে। কিছু কিছু বিষয়ে বাংলাদেশের আপত্তি ছিল, সেগুলো সমাধান করা হয়েছে। সুতরাং আমি মনে করি, পরে টিকফার বিষয়বস্তু কিছুটা খোলসা করা হয়েছে এবং এখন আমরা চুক্তির অনেক কিছুই জানি। তবে শুরু থেকেই টিকফা নিয়ে খোলামেলা ও ব্যাপক আলাপ-আলোচনা হলে এসব সন্দেহ-সংশয় থাকত না। টিকফার আলোচনা যখন টিফা পর্যায়ে ছিল তখন আলাপ-আলোচনা একটি গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যেটিও এর একটি কারণ।

সকালের খবর: টিকফার বৈঠকে জিএসপি ফিরে পাওয়ার বিষয়ে আলোচনা হতে পারে কি না, জিএসপি বাংলাদেশের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: যদিও আমাদের প্রধান রফতানি পণ্য গার্মেন্ট যুক্তরাষ্ট্রে জিএসপি সুবিধা পায় না। আর এখন সে সুবিধাও বাতিল। তারপরও আমি মনে করি, যুক্তরাষ্ট্রের উচিত বাংলাদেশকে জিএসপি সুবিধার আওতায় আবার নিয়ে আসা। কেননা, গার্মেন্ট ছাড়া অন্যান্য পণ্য কিন্তু সে দেশে জিএসপি সুবিধা পেত। সেসব পণ্য রফতানিকারকরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এসব পণ্যেরও রফতানি বৃদ্ধির বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। তার চেয়ে বড় কথা, মার্কিন বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে এ জিএসপি সহায়ক ভূমিকা রেখে থাকে। কেবল মার্কিন বিনিয়োগকারীদের নয়, অন্য দেশের বিনিয়োগকারীদেরও আকৃষ্ট করার ব্যাপার এর ভূমিকা রয়েছে। এটি একটি ইমেজের বিষয়ও বটে। তৃতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি জিএসপি না দেয় তাহলে তা অন্যান্য দেশের উপরেও একটি নেতিবাচক প্রভাব রাখবে। সুতরাং, আমি মনে করি টিকফার বৈঠকে জিএসপি ইস্যুটা বাংলাদেশে। খুবই জোরালোভাবে তুলে ধরা উচিত। বিশেষ করে, তারা যে ১৬টি শর্ত দিয়েছিল জিএসপি ফিরে পেতে সেসব শর্ত কতটা পূরণ করা হয়েছে সেগুলো সেখানে যুক্তিসঙ্গতভাবে উপস্থাপন করা দরকার, ও আমাদের প্রত্যাশাও খোলামেলাভাবে বলা উচিত।

সকালের খবর: আপনি জানেন ওষুধ শিল্পের মেধাস্বত্ব সুবিধা ২০৩৩ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ শিল্পের জন্য যুক্তরাষ্ট্র বড় বাজার। টিকফার মাধ্যমে ওষুধ শিল্প কতটা উপকৃত হতে পারে?

মোস্তাফিজুর রহমান: ওষুধ শিল্পের জন্য এ সুবিধা ডব্লিউটিও বাংলাদেশকে দিয়েছে এলডিসির দেশ হিসেবে। ২০২৪ সালের দিকে যদি বাংলাদেশ এলডিসি থেকে বের হয়ে যায়, তাহলে আমাদের সামনে আর মাত্র দশ বছর সময় আছে এটিকে ব্যবহার করার। এ বিষয়ে টিকফাতে সরাসরি তেমন কোন যোগাযোগ আমি দেখি না। কিন্তু যদি আমরা এ শিল্পে মার্কিন বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে পারি, তাহলে লাভবান হবে ওষুধ শিল্প। আর এ ব্যাপারে টিকফার বৈঠকে আলোচনা হতে পারে। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে ডব্লিউটিও আমাদের যে সুবিধা দিয়েছে তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে যদি ব্যত্যয় ঘটে, আমাদের সে বিষয়গুলো টিকফায় উত্থাপন করা উচিত। দ্বিতীয়ত, মার্কিনসহ অন্যান্য দেশের বিনিয়োগ কীভাবে এ খাতে বাড়ানো যায় সে ব্যাপারে আমাদের সচেষ্ট থাকতে হবে। আমি মনে করি, ওষুধ শিল্পের জন্য মেধাস্বত্বের বিষয়ে ছাড় আমাদের জন্য বিরাট সুযোগ। এ খাতের সব বাধা যদি দূর করা যায়, তাহলে রফতানি প্রচুর বাড়বে। এখন আমরা ১০০টির বেশি দেশে ওষুধ রফতানি করছি, কিন্তু তা খুবই কম। গত বছরে, আমাদের ওষুধ রফতানি ছিল মাত্র ৮০ মিলিয়ন ডলারের। অথচ বৈশ্বিক বাজার ছিল ৫৪০ বিলিয়ন ডলারের। সুতরাং, বোঝা যাচ্ছে ওষুধের বিশ্ববাজার কত বড়। এই বিশাল বাজার ধরতে রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং, মেইল বক্সসহ এ শিল্পের স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে ভাবতে হবে, উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। মার্কিন বাজারে ওষুধ রফতানির ক্ষেত্রে যদি প্রতিবন্ধকতা থাকে সে বিষয়েও টিকফায় আলোচনা করা যেতে পারে।

সকালের খবর

২৪ নভেম্বর ২০১৫

বাণিজ্য সম্পর্ক সম্প্রসারণে সুযোগের জানালা সৃষ্টি হয়েছে

মোস্তাফিজুর রহমান

সম্প্রতি বাংলাদেশ ঘুরে গিয়েছেন চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ও বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম। কাছাকাছি সময়ে তাঁদের এ সফর ছিল বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চীন এবং বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টের সফরের তাৎপর্য নিয়ে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান কথা বলেছেন প্রথম আলোর সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন জাহাঙ্গীর শাহ ও সুজয় মহাজন।

প্রথম আলো: চীনের প্রেসিডেন্টের সফরে দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক নতুন মাত্রায় পৌঁছাল বলে বিভিন্ন মহল থেকে বলা হচ্ছে।

মোস্তাফিজুর রহমান: চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সফর দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একটি সুযোগের জানালা সৃষ্টি করেছে। বর্তমান বিশ্বের দুই অর্থনৈতিক পরাশক্তি চীন ও ভারতের উন্নয়ন কৌশলের সঙ্গে আমাদের অর্থনীতির চাহিদার পরিপূরকতা সৃষ্টি হয়েছে। এ সুযোগ পুরো কাজে লাগাতে পারলে আমরা যে উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা করছি, তা বাস্তবায়নের পথ সুগম হবে।

প্রথম আলো: বাংলাদেশে বিশাল বিনিয়োগের পক্ষে যাচ্ছে চীন। এটি কীভাবে দেখছেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: চীনের প্রেসিডেন্টের সফরে সরকারি ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে প্রায় ৪০ বিলিয়ন ডলারের প্রাথমিক বিনিয়োগ চুক্তি হয়েছে। বিষয়টি উভয় পক্ষের দিক থেকে

দেখা যায়। বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান চাহিদায় চীনের আগ্রহ আছে — এটি ভাল দিক। এটি বড় সুযোগ সৃষ্টি করবে। অবকাঠামো দুর্বলতার কারণে বাংলাদেশে স্থানীয় বিনিয়োগ অনুৎসাহিত হচ্ছে; বিদেশি বিনিয়োগ খুব বেশি আসছে না। চীনের বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্য হল, অবকাঠামো খাতে বড় ধরনের বিনিয়োগ প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। চীনের বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত অর্থ আছে। 'ওয়ান বেল্ট, ওয়ান রোড' ও 'সাউদার্ন সিল্ক রোড' — এসব যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করে চীন নিজের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে চাইছে। অন্যদিকে, অবকাঠামো ঘাটতি কাটিয়ে আমাদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন আছে। তাই চীনের আগ্রহ ও আমাদের প্রয়োজনীয়তার সামঞ্জস্য দেখতে পাচ্ছি।

আমরা যদি সড়ক, বন্দর ও বিদ্যুতের মত বড় অবকাঠামোতে চীনের সাহায্যে ভালভাবে কাজে লাগাতে পারি, নির্মাণে তাহলে আমাদের বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ও সরবরাহ সক্ষমতা বাড়াতে পারব। এতে স্থানীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগও আকৃষ্ট করতে পারব।

প্রথম আলো: চীনের অর্থায়নে বড় বড় অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতা বাংলাদেশের কতটা আছে?

মোস্তাফিজুর রহমান: বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার প্রশ্ন সব সময়ই থাকে। যেসব মন্ত্রণালয় এসব প্রকল্প (চীনের অর্থায়নে) বাস্তবায়ন করবে, তাদের এত কম সময়ে এত বড় বিনিয়োগ বাস্তবায়ন করার সক্ষমতা লাগবে। দেশের স্বার্থে ঋণের সুদের হার, ঋণ পরিশোধের সময়সীমা, প্রকল্পের কাঁচামাল কোথা থেকে আসবে, প্রযুক্তি হস্তান্তর কীভাবে হবে — এসব বিষয়ে যদি দর-কষাকষি ঠিকমত করতে পারি, তবে যে ইতিবাচক ফল চাইছি, তা আরও বেশি পাব।

সাশ্রয়ীভাবে, সময়মত ও সুশাসনের মাধ্যমে এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। এসব বড় অবকাঠামো হলে যেমন প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বাড়বে, অর্থনীতির সক্ষমতাও বাড়বে। এ ধরনের বড় ঋণের জন্য দায়ভার বাড়লেও তা পরিশোধে সমস্যা হবে না।

প্রথম আলো: দুই দেশের বাণিজ্য ঘাটতি ক্রমশ বাড়ছে। এ ঘাটতি কমানোর কী উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে?

মোস্তাফিজুর রহমান: চীনে বাংলাদেশী পণ্যের রফতানি বাড়াতে হলে কয়েকটি উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করে সরবরাহ সক্ষমতা

সৃষ্টি করে, বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি করে, চীনের বাজারে পণ্য রফতানির সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, নিজেদের অতিরিক্ত সক্ষমতার কারণে কিছু কিছু খাতের বিনিয়োগ বিদেশে নিতে চাইছে চীন। সেই বিনিয়োগ বাংলাদেশে আনার আলাপ-আলোচনা চলছে। ওই বিনিয়োগের পণ্যও চীনে রফতানির সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। তৃতীয়ত, চীন, ভারতসহ অনেক দেশেই শুল্কমুক্ত বাজারসুবিধা পায় বাংলাদেশ। চীন বাংলাদেশে বিনিয়োগ করে পণ্য উৎপাদন করে বিনা শুল্কে ওই সব দেশে রফতানি করতে পারবে, যা বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে ইতিবাচকভাবে প্রভাব ফেলবে। চতুর্থত, চীন বঙ্গোপসাগরে একটি দক্ষিণমুখী গেটওয়ে চাইছে। চীনে ইউনান, গুয়াংজুর মত প্রদেশগুলো মূলত স্থলপরিবেষ্টিত। এসব প্রদেশ যদি ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে উন্নয়ন করতে চায়, তাহলে তাদের দক্ষিণ দিকে একটি গেটওয়ে লাগবে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, মংলা ও পায়রা বন্দরের প্রতি চীনের আগ্রহ আছে। এসব অবকাঠামো কাজে লাগিয়ে যদি বাংলাদেশ, চীন, ভারত, মিয়ানমার (বিসিআইএম) করিডর কিংবা দক্ষিণের দিকে আরেকটি রুট করা হয়, তবে এর সুফল পাবে বাংলাদেশ। যদি আমরা প্রয়োজনীয় হোম-ওয়ার্ক করতে সক্ষম হই। সামগ্রিকভাবে, ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই চীনের সঙ্গে নিবিড় অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হবে বাংলাদেশ।

প্রথম আলো
২২ *অক্টোবর* ২০১৬

অধ্যায় ৫

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক প্রতিবেদনে, বাংলাদেশের চরম দারিদ্র্য পরিস্থিতির হিসাব তুলে ধরেছে। এতে বলা হয়েছে, অতি দারিদ্র্যের হার ১২.৯ শতাংশে নেমে এসেছে, ২০০৯-১০ অর্থবছরে ছিল সাড়ে ১৮ শতাংশ। সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশের অতি দারিদ্র্য পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। সংখ্যার হিসাবে ধরলে বলা যায়, সাত বছরের ব্যবধানে প্রায় ৮০ লাখ হতদরিদ্র লোক অতি দারিদ্র্যসীমার ওপরে উঠেছে। এটি আপনাআপনি ঘটেনি। সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতির পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অবদান রয়েছে এর পেছনে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ তাদের আয় কিছু পরিমাণে হলেও বাড়াতে পেরেছে। আগের চেয়ে ক্রয়ক্ষমতার উন্নতির সাক্ষ্য দেয় বিশ্বব্যাংকের এ পরিসংখ্যান।

বাংলাদেশে চরম দরিদ্র জনসংখ্যা কমছে — এ বিশ্লেষণ ও প্রাপ্তিটি বাংলাদেশের জন্য খুবই ইতিবাচক। নতুন হিসাব অনুযায়ী, কোন ব্যক্তি যদি প্রতি মাসে এক হাজার ২৯৭ টাকার বেশি আয় করেন, তবে তিনি হতদরিদ্র নন। বিষয়টিকে কয়েকটি দিক থেকে বিশ্লেষণ করা দরকার।

প্রথমত, বিশ্বব্যাংক হিসাবে বলা হয়েছে, জিডিপি ১ শতাংশ পয়েন্ট বাড়লে দারিদ্র্য ১.৫ শতাংশ পয়েন্ট কমে আসে। অর্থাৎ জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির উচ্চধারা ব্যক্তি আয় বাড়িয়ে দারিদ্র্য কমাতে সহায়তা করে। বিশ্বব্যাংকের হিসাবটি খুবই গুরুত্বহ হলেও হিসাব করার ক্ষেত্রে সম্ভবত ২০১০ সালের খানা জরিপে আয়-ব্যয়ের অন্য উপাত্তকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি অর্থনীতির

চলকগুলোকে একইভাবে প্রভাবিত করছে – এ অনুমিতি থেকে সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দারিদ্র্যের হারটি পাওয়া গিয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

প্রকৃতার্থে, দেশে দারিদ্র্য পরিস্থিতির উপযুক্ত হিসাবটি পাওয়া যেতে পারে সর্বশেষ আয়-ব্যয় খানা জরিপ থেকে। তখন মিলিয়ে দেখা যেতে পারে, সংখ্যাগতভাবে প্রাপ্য হিসাব প্রকৃত পরিস্থিতির কতটুকু কাছে বা দূরে। আপাতভাবে অনুমান করা যায়, দেশে দারিদ্র্য পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হলেও উন্নতির মাপকাঠিটি এতটা সরলরৈখিক নাও হতে পারে, যা সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশ করা হচ্ছে।

দারিদ্র্য পরিস্থিতির উন্নতি হলেও উন্নতির মাপটি ক্রমশ শ্লথ হচ্ছে বলে মনে হয়। অর্থাৎ আমরা এগিয়ে চলেছি; কিন্তু মাঝে মধ্যে থমকে থাকতে হচ্ছে। এর যৌক্তিক কারণও রয়েছে। খানা জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০০০ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্য কমেছে প্রায় ৯.২ শতাংশ, যা ২০০৫ থেকে ২০১০-এর সময় ছিল ৭.৫ শতাংশ। সর্বশেষ হিসাবে ২০১০ থেকে ২০১৬ সময়কালে হতদরিদ্র কমেছে ৪.৭ শতাংশ। অর্থাৎ দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে সমস্যার উন্নয়ন আর সরলরৈখিক থাকছে না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল – চরম দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের সংখ্যা অধিক পরিমাণে থাকার সময় বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ইতিবাচক অভিঘাত যত দ্রুত তাদের ওপর পড়ে, সংখ্যা কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে প্রভাব নিশ্চিতের ক্ষেত্রে আরও সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের দরকার পড়ে। মনে রাখা দরকার, দেশে এখনও দুই কোটির ওপর লোক চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে, যাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম দরকার।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য পরিস্থিতির বহুমাত্রিকতা রয়েছে। এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা যায় – সর্বশেষ ২০১০-এর খানা জরিপ মতে, দেশে গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য পরিস্থিতি শহরাঞ্চলের চেয়ে বেশ খারাপ। দেখা যাচ্ছে, শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য পরিস্থিতি দ্রুত উন্নতি হলেও গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে তা নয়। দারিদ্র্যের মাত্রা কৃষিকাজে নিয়োজিত বিভিন্ন ধরনের সেবা, যেমন পরিবহন শ্রমিক – মূলত অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজে যুক্ত মানুষের জন্য বেশি। অশিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিতের মধ্যে দারিদ্র্যের প্রকোপ বেশি।

যেসব পরিবারে সদস্য সংখ্যা বেশি, সেখানে দারিদ্র্যের প্রকোপ বেশি। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডবহুল অঞ্চলের তুলনায় চর, কিন্তু প্রত্যন্ত এলাকায় দারিদ্র্য বেশি। যেখানে শিল্পের বিকাশ ঘটছে না কিংবা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘন ঘন ঘটে সেখানে দরিদ্র মানুষ বেশি। কর্মসংস্থানের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। হয় নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে কিংবা অন্যের প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ থাকতে হবে। কেবল কাজের সুযোগ থাকলে

হবে না, কাজের জন্য চলার মত আয়ও হতে হবে। অন্যথায়, হতদরিদ্রের সারিতে হবে অবস্থান। দেখা গিয়েছে, বরিশাল এবং রংপুর বিভাগে দারিদ্র্যের মাত্রা বেশি। সুতরাং সাম্প্রতিক দারিদ্র্য পরিস্থিতির উন্নতির জন্য, অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সুনির্দিষ্ট সামাজিক কর্মসূচি প্রসারের পাশাপাশি কৃষিকাজের সুযোগ ও মজুরি বৃদ্ধি, কৃষি সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো নির্মাণ, ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিপণ্য উৎপাদন বাড়ল; কিন্তু তা সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা না থাকলে কাঙ্ক্ষিত সুফল মেলে না। এ প্রসঙ্গে আমরা ইলিশ মাছের কথা বলতে পারি। গত কয়েকদিনে নদী-সমুদ্রে ইলিশ মাছ বেশি ধরা পড়ছে। বাজারে দাম কমে এসেছে; কিন্তু পাশাপাশি এ চিত্রও সংবাদপত্রে দেখছি – ক্রেতা না পেয়ে জেলেরা মাছ ফেলে দিয়েছে খোলা স্থানে।

এটি লক্ষণীয় যে, চরম দরিদ্র মানুষ এখনও বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট পকেটে আটকে আছে। উপার্জন করতে না পারা বয়স্ক নারী-পুরুষ, প্রতিবন্ধী, বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্ত নারীর পরিবার, বানভাসি, উপার্জনহীন বা স্বল্প উপার্জনক্ষম ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল – এসব ক্ষেত্রে দারিদ্র্য বেশি। এ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন অপরিহার্য; কিন্তু একই সঙ্গে জরুরি হচ্ছে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ।

মনে রাখা দরকার, বিশ্বব্যাংক প্রতিবেদন চরম দারিদ্র্যের কথা বলেছে। আমাদের রাজধানী ঢাকা এবং অন্যান্য শহরেও দারিদ্র্য রয়েছে। হতদরিদ্র মানুষ রয়েছে দুই কোটি। এর বাইরেও অন্তত দুই কোটি লোক রয়েছে, যাদের প্রতিদিনের জীবন তেমন ভাল কাটছে না। অর্থাৎ দেশের এক-চতুর্থাংশ লোক দরিদ্র (চার কোটি) রয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনটি এমন সময় প্রকাশ পেল, যখন বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সফরে আসছেন। প্রতি বছর দারিদ্র্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনকারী একটি দেশে সফর করার অংশ হিসেবে এ পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সফলতার চিত্র ফুটে উঠবে। এর মাত্রা যথেষ্ট কি না সেটি নিয়ে একাডেমিক মহলে বিতর্ক চলতে পারে। কিন্তু উন্নতি হচ্ছে এবং বিশ্ব সম্প্রদায় সেটি উপলব্ধি করতে পারছে।

একই সঙ্গে, ভবিষ্যতে দারিদ্র্য বিমোচনে কোন ধরনের কার্যক্রম নেওয়া যাবে তারও যৌক্তিক ভিত্তি এ থেকে পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যেই, বিশ্বব্যাংক ২০১৬-২০ সময়ে তাদের জন্য তার পার্টনারশিপ ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুত করেছে, যা তৈরি হয়েছে মূলত সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আলোকে। এখানে বিশ্বব্যাংক আগামী পাঁচ বছরের সহযোগিতার জন্য দারিদ্র্য বিমোচনকে মুখ্য উপজীব্য করেছে।

আগামী দিনে, যদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখা যায়, অবকাঠামো পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানো যায় এবং এ লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়, উন্নয়ন সহযোগীদের কার্যক্রম দেশের চাহিদার নিরিখে অব্যাহত থাকে, তবে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে এসডিজি-২০৩০ (টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য)-এর যে লক্ষ্য, তা বাংলাদেশ অর্জনের কাছাকাছি যেতে পারবে — এটি আশা করা যায়। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে যোগাযোগ ও জ্বালানি খাতের পরিস্থিতির উন্নতির জন্য বিশেষভাবে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে বলা হয়েছে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির কথা। হতদরিদ্রের সংখ্যা কমে আসার চিত্র উৎসাহব্যঞ্জক। উন্নতির নতুন ধাপে পৌঁছাতে হলে এখন নজর দিতে হবে। এ জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকেও আরও বেশি সহায়তা আমরা প্রত্যাশা করি। বাংলাদেশ যদি 'উন্নতির মডেল' হিসেবে গণ্য হয়, তাহলে এ ধারা অব্যাহত রাখতে চাই সর্বোচ্চ সহায়তা। তবে এর অপরিহার্য শর্তও কিন্তু সুশাসন। দুর্নীতি-অনিয়ম এখনও সমস্যা হিসেবে বিরাজ করছে এবং তা থেকে নিষ্কৃতি পেতেই হবে।

সমকাল
৬ *অক্টোবর* ২০১৬

এসডিজি বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়গুলোকে আরও সচেতন ও সক্রিয় হতে হবে

ফাহমিদা খাতুন

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের গবেষণা পরিচালক। এর আগে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ইউএনডিপি ও ইউএসএআইডিতে কাজ করেছেন। খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করেছেন যুক্তরাজ্যের কিংস কলেজ এবং গ্রিনিচ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফুলব্রাইট ফেলোশিপ পেয়ে এ বছর যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থ ইনস্টিটিউটে ভিজিটিং স্কলার হিসেবে গবেষণা করছেন অধ্যাপক জেফ্রি স্যাক্সের সঙ্গে। তা ছাড়া, নরওয়ের ক্রিশ্চিয়ান মিকেলসেন ইনস্টিটিউট এবং দক্ষিণ কোরিয়ার কোরিয়া ইনস্টিটিউট ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিকস অ্যান্ড ট্রেড নামক গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ভিজিটিং ফেলো ছিলেন। গবেষণার পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে সরকারের নীতিনির্ধারণী কর্মকাণ্ডেও জড়িত হয়েছেন। রাষ্ট্রায়ত্ত জনতা ব্যাংকে এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সামষ্টিক অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, পরিবেশ ও স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতি বিষয়ে দেশে ও বিদেশে তার অনেক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি ভারতের সেন্টার ফর স্টাডি অব সায়েন্স, টেকনোলজি অ্যান্ড পলিসি নামক প্রতিষ্ঠানে একজন ভিজিটিং স্কলার। তার সঙ্গে এসডিজি সম্পর্কিত নানা বিষয়ে কথা বলেছেন বণিক বার্তার এমএম মুসা।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ মোটামুটি ভাল করেছে – সবাই বলছে এটি। এখন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রথমে জানতে চাইব, আমরা এমডিজির কোন কোন লক্ষ্যে ভাল করেছি?

এমডিজিতে যে আটটি লক্ষ্য ছিল, তার মধ্যে দারিদ্র্য দূরীকরণসহ অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন ভাল। যেমন – দারিদ্র্য দূরীকরণ, প্রাথমিক শিক্ষা, মেয়েদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় অগ্রগতি, শিশুমৃত্যুর হার কমানো, খাদ্যনিরাপত্তা, প্রভৃতিতে বাংলাদেশ এগিয়ে আছে। শুধু তা-ই নয়, নির্দিষ্ট সময়ের আগেই অনেক লক্ষ্য পূরণ হয়ে গিয়েছে। যেখানে সমস্যা ছিল, ৮ নম্বর লক্ষ্য অর্থাৎ বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব। সেখানে বলা ছিল, দরিদ্র দেশগুলোর উন্নয়নে উন্নত দেশগুলো অর্থ, বাণিজ্য, প্রযুক্তি, প্রভৃতির মাধ্যমে সহযোগিতা করবে। কিন্তু সেটি পূরণ হয়নি। কথা ছিল, উন্নত দেশগুলো তাদের জাতীয় আয়ের শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ বৈদেশিক সাহায্য হিসেবে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে দেবে। তা হয়নি। ধনী দেশগুলো স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে বিনা শুল্কে বাজার সুবিধা দেবে, সেটিও অর্জিত হয়নি। এগুলোয় বাংলাদেশের ভূমিকা গ্রহীতার। তাই আমি বলব, এমডিজির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন উল্লেখযোগ্য ছিল।

এ অর্জনের পেছনে কোন বিষয়গুলো কাজ করেছে?

বাংলাদেশের জন্য এসডিজির লক্ষ্যগুলো অর্জন খুব একটি কঠিন হয়নি এজন্য যে, আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলোয় দারিদ্র্য বিমোচনসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য সবসময়ই ছিল। এসব লক্ষ্য নির্ধারণে বৈশ্বিক পর্যায়ে কোন উদ্যোগের ওপর আমরা নির্ভর করিনি। আমরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন, সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেওয়া, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, শিক্ষার হার বাড়ানো এবং নারীর ক্ষমতায়নের মত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করেছি। তারপর সেগুলো অর্জনের জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন করেছি। একদিকে সরকারের পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ড, অন্যদিকে এনজিওগুলোর কার্যক্রম ও ব্যক্তি খাতের উদ্যোগ – সবার কাজের সমন্বয়ে আমরা সফল হতে পেরেছি।

এবার এসডিজি প্রসঙ্গে আসা যাক। বলা হচ্ছে, এক্ষেত্রে গুণের দিকে বেশি জোর দেওয়া হবে। আপনার দৃষ্টিতে, বাংলাদেশের কোথায় জোর দেওয়া উচিত?

এসডিজির লক্ষ্যমাত্রাগুলোর পরিধি অনেক বড়। এসডিজিতে ১৭টি লক্ষ্য, যার অধীনে আরও ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। নিঃসন্দেহে, এসডিজি অর্জন এমডিজির

চেয়ে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং হবে। যেমন – ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য, সবার জন্য শিক্ষা, সবার জন্য জ্বালানি ও বিদ্যুৎ, ইত্যাদি নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে এসডিজিতে। এমডিজিতে এ রকম 'সবার জন্য' বিষয়টি ছিল না। যেমন – এমডিজিতে দারিদ্র্যসীমা ১৯৯০ সাল থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এসডিজিতে ২০৩০ সালের মধ্যে সব দেশে, সবার অতি দারিদ্র্য দূর করতে হবে। অর্থাৎ বর্তমানে যারা দিনে ১ দশমিক ২৫ ডলারের নিচে আয় করছে, তাদের সবার দারিদ্র্য দূর করতে হবে। এসডিজির মূল ভাব হল, কাউকেই পেছনে ফেলে রাখা যাবে না, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এগোতে হবে। বিশ্বনেতারা মনে করছেন, সবার প্রচেষ্টা দিয়ে এসব লক্ষ্য অর্জন করা যাবে। তা ছাড়া, এসডিজিতে টেকসই উন্নয়নের বিভিন্ন দিক বিবেচনায় আনা হয়েছে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে এসডিজি প্রণয়ন করা হয়েছে। কেননা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হওয়ার পরেও অন্য দু'টি ক্ষেত্রে দুর্বলতা থাকলে সেই উন্নয়ন টেকসই হয় না। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হল, কিন্তু এর সুফল সবাই পেল না, বৈষম্য রয়ে গেল; তাহলে সামাজিক অন্তর্ভুক্তকরণ নিশ্চিত হবে না। পরিবেশের অবক্ষয় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেও উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়, এমনকি পিছিয়েও পড়ে। এ বিষয়গুলো এসডিজিতে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সেদিক থেকে এসডিজিকে বেশ প্রাগ্রসর, অনেক সুদূরপ্রসারী বলা যায়। একদিকে এটি উচ্চাভিলাসী বটে, কিন্তু এ পরিকল্পনায় মানব উন্নয়নের সামগ্রিক দিকগুলো বিবেচনা করা হয়েছে। কেননা, অনেক দেশে দারিদ্র্য কমার পরও আয় বৈষম্য ও সামাজিক বৈষম্য কমেনি। তাই এবার উন্নয়নের গুণগত দিকগুলোর ওপরও নজর দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের কী করার আছে এতে?

এসডিজির উদ্দেশ্যগুলো বৈশ্বিক পর্যায়ে নির্ধারণ করা হয়েছে। এখন জাতীয় পর্যায়ে সেগুলো বাস্তবায়ন করাটা আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হবে। এখানে কয়েকটি বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া দরকার। আমরা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলো করে আসছি। আগেই বলেছি, সেখানে দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, ইত্যাদি ছিল। এখন সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করেছে। সেখানেও এসব লক্ষ্যমাত্রার প্রতিফলন রয়েছে। এসব ভাল দিক। কিন্তু সমস্যা হল, কীভাবে এসডিজি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কয়েকটি চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এক. এজন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ লাগবে, সেটি কোথা থেকে পাওয়া যাবে। একটি হিসাব করা হয়েছে, বিশ্বব্যাপী এগুলো বাস্তবায়নের জন্য আগামী ১৫ বছরে ১৭২ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন ডলার লাগবে। এ বছরের জুলাইয়ে, ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবায় অনুষ্ঠিত "উন্নয়নের জন্য

অর্থায়ন" শীর্ষক সম্মেলনে উন্নয়ন সহযোগীরা কে কত অর্থ দেবে তা বলেছে। কিন্তু সব অর্থ এখনো জোগাড় হয়নি। উন্নয়ন সহযোগীরা ছাড়াও বিভিন্ন সূত্র থেকে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করা হচ্ছে। তা ছাড়া বিশেষ করে, প্রতিটি দেশের আভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে সম্পদ আহরণেও জোর দেওয়া হচ্ছে। এজন্য আভ্যন্তরীণ কর আহরণ বাড়ানোর ওপর নজর রাখতে বলা হচ্ছে। স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে কর আহরণ বড় সমস্যা। কর ফাঁকি, কর জালের আওতায় সবাইকে না আনা, ইত্যাদি সমস্যা দূর করার কথা বলা হচ্ছে। দেশ থেকে অবৈধভাবে অর্থ বাইরে চলে যাওয়া বন্ধ করার কথাও আলোচিত হচ্ছে। অর্থায়নের সমস্যাটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমাদেরকে বৈশ্বিক সূত্র ও দেশের ভেতর থেকে সম্পদ আহরণ করতে হবে।

অর্থায়ন ছাড়াও আরেকটি সমস্যা হচ্ছে সমন্বয়ের অভাব। এসডিজি অর্জনের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, যেমন – অর্থ, পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মহিলা ও শিশু, কৃষি, জ্বালানি, পরিবেশসহ আরও অনেক মন্ত্রণালয়কে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। এমডিজি বাস্তবায়নের সময় সব মন্ত্রণালয় একই রকম সচেতন ছিল না। কিন্তু এখন তাদের আগের চেয়ে অধিক সচেতন ও সক্রিয় হতে হবে।

এমডিজিতে শুধু লক্ষ্যমাত্রা ছিল, কিন্তু কীভাবে তা বাস্তবায়ন করা হবে, সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু ছিল না। কিন্তু এসডিজির ১৭ নম্বর লক্ষ্যমাত্রায় এটি বাস্তবায়নের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে বলা আছে। যেমন – অর্থায়ন, প্রযুক্তি, সক্ষমতা বাড়ানো, বাণিজ্য সুবিধা, নীতিমালা ও প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়গুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা, ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য বৈশ্বিক সহযোগিতা এবং সরকার, ব্যক্তি খাত ও সুশীল সমাজের অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আরেকটি বিষয় হল, এসডিজির অগ্রগতি জানার জন্য মানসম্পন্ন ও সময়োপযোগী পরিসংখ্যান পাওয়া খুবই জরুরি। কোন দেশের আয়, নারী উন্নয়ন, বয়স, অভিবাসন, ভৌগোলিক অবস্থান, ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক তথ্য না থাকলে এসডিজি বাস্তবায়ন কতখানি হল, তা বোঝা কঠিন। তাই পরিসংখ্যান ও স্বচ্ছতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, তথ্য বিপ্লবের কথা বলা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশকেও এ বিষয়গুলো বিচেনায় রেখে কাজ করতে হবে।

বাংলাদেশ সরকার পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কার্যক্রম এ ক্ষেত্রে কী ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে?

প্রথম কথা হচ্ছে, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কার্যক্রম বন্ধ করা যাবে না। উন্নত দেশেও এসব কার্যক্রম থাকে বিভিন্নভাবে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আমরা

যাদের আনছি, তারা অতিদরিদ্র। অনেকের উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার মত সক্ষমতা থাকে না। যে কোন কল্যাণমুখী প্রগতিশীল সরকারের অন্যতম ভূমিকা থাকে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষকে দেখাশোনা করা। আমাদের দেশে সামাজিক সুরক্ষা খাতে জিডিপির মাত্র ২ শতাংশ ব্যয় হয়। আমরা এটিকে বাড়িয়ে অন্তত জিডিপির ৪ শতাংশ করার কথা বলছি। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এটি ৩ শতাংশ করার লক্ষ্য ছিল। সেটি আমরা পূরণ করতে পারিনি। উন্নত দেশে এ খাতে জিডিপির ৮ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়। এসডিজিতে জোর দেওয়া হচ্ছে, উৎপাদনশীল সক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের ওপর। সমাজের নাজুক জনসংখ্যাকে সামাজিক সুরক্ষাবেষ্টনীর মধ্যে আনার পাশাপাশি কর্মক্ষম জনসংখ্যাকে যদি উৎপাদনশীল কাজে না লাগানো যায়; তাহলে উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈষম্য দূরীকরণ কোনটাই সম্ভব হবে না।

সাম্প্রতিক সময়ে, বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি একই স্থানে আটকে আছে। এ পরিস্থিতিতে এসডিজি বাস্তবায়ন আমাদের জন্য কতখানি চ্যালেঞ্জের হবে?

নিঃসন্দেহে, এটি চ্যালেঞ্জিং হবে। তবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় প্রেক্ষিতই দেখতে হবে। আন্তর্জাতিকভাবে ২০০৮ সালে, আর্থিক মন্দার পর বড় বড় অর্থনীতি এখনো স্থবিরতা কাটাতে পারেনি। বৈদেশিক সাহায্য এবং বিশেষ করে রফতানির জন্য ওই সব দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর আমরা অনেকটা নির্ভরশীল। অন্যদিকে, আমাদের দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য রাজনৈতিক পরিবেশ একটি বড় বিষয়। কারণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না থাকলে বিনিয়োগ বাড়ানোর মাধ্যমে কর্মসংস্থান বাড়াতে পারব না, অবকাঠামো উন্নয়ন করতে পারব না, স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারব না, তখন আমরা এসডিজির লক্ষ্য পূরণে পিছিয়ে পড়ব। কারণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি না হলে মানুষের আয় বাড়বে না, আয় না বাড়লে দারিদ্র্য বিমোচন হবে না, আয় না বাড়লে তারা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করতে পারবে না। দেশের ভেতরে আমি বলব কয়েকটা চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এক. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। দুই. ভৌত অবকাঠামো ও সামাজিক উভয় খাতেই বিনিয়োগ বৃদ্ধি। এগুলো করতে না পারলে এসডিজি বাস্তবায়ন কষ্টকর হবে। এসডিজি পূরণের ক্ষেত্রে, আমাদের আরেকটা বড় চ্যালেঞ্জ হল, জলবায়ু পরিবর্তন। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত বাংলাদেশের ওপর অনেক বেশি মাত্রায় পড়ার শঙ্কা রয়েছে। এটি প্রশমনে অর্থ ও প্রযুক্তি দু'টোরই প্রয়োজন রয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে, আমরা কতখানি এ ব্যাপারে সহযোগিতা পাব, তার ওপরও নির্ভর করছে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত কতটা মোকাবেলা করতে পারব।

আমরা তো সম্প্রতি নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি। ফলে বাংলাদেশের জন্য আরও চ্যালেঞ্জ বাড়বে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নীতি কেমন হওয়া উচিত?

নিম্ন আয় থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ে উন্নীত হওয়াটা ভাল অর্জন। এখানে আমাদের ভাবমূর্তির ব্যাপার আছে। তার ওপর ২০২১ সালের মধ্যে আমাদের মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার যে স্বপ্ন রয়েছে, সেক্ষেত্রে কিছুটা এগোলাম। কিন্তু নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ হওয়া মানে স্বল্পোন্নত দেশ বা এলডিসি থেকে বেরিয়ে আসা নয়। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হতে হলে শুধু মাথাপিছু আয় বাড়ালে চলবে না। পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচক এবং ভঙ্গুরতা সূচকেও অগ্রগতি অর্জন করতে হবে। তাই স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে যে সুবিধাগুলো আমরা পাচ্ছি, তা এখনো বহাল থাকবে। তবে হ্যাঁ, নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ায় এখন আমাদের অনেকে স্বল্প সুদে ঋণ দেবে না। তবে, অন্যদিকে আমাদের সুযোগও বাড়বে। আমাদের ক্রেডিট রেটিং উন্নত হবে। ফলে, বাইরে থেকে বাণিজ্যিক ঋণ নিতে পারব। একটু বেশি সুদেই নিতে হবে। কিন্তু আমি মনে করি, আমাদের দেশে অনেক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যাদের বিশ্ববাজার থেকে বাণিজ্যিক সুদের হারে ঋণ নেওয়ার সক্ষমতা রয়েছে। পাশাপাশি আমাদের প্রবৃদ্ধির হার বাড়াতে হবে এবং দ্রুত মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে হবে। এজন্য দরকার বিনিয়োগ এবং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বাড়ানো। এখন যে প্রবৃদ্ধির মধ্যে আটকে রয়েছি, সেটি ভাঙতে হবে।

এটি কীভাবে ভাঙা সম্ভব?

এটি ভাঙতে হলে আমাদের অর্থনীতির সক্ষমতা বাড়াতে হবে। বিনিয়োগ ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার কথা আগেই বলেছি। পাশাপাশি রফতানি বৈচিত্র্যকরণ, প্রতিযোগিতা সক্ষমতা, মানবসম্পদের দক্ষতা বাড়ানো, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, অবকাঠামোতে বিনিয়োগ, ইত্যাদি প্রয়োজন। কর্মসংস্থান বাড়ানোও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শুধু তা-ই নয়, কোন ধরনের কর্মসংস্থান করব সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। তবে সবকিছুর আগে প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা। আমাদের সামনে এখন দু'টি চ্যালেঞ্জ। একটি হল, মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়া। অন্যটি, এসডিজি বাস্তবায়ন। রাজনৈতিক অঙ্গীকার অব্যাহত থাকলে এসডিজির বেলায়ও আমরা সফল হব।

বণিক বার্তা
৭ অক্টোবর ২০১৫

উন্নয়ন চিন্তা করতে হবে এসডিজিকে ঘিরেই

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

জাতিসংঘ প্রণীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) একটি বৈশ্বিক বৈপ্লবিক কর্মসূচি। একে এড়িয়ে এখন উন্নয়ন পরিকল্পনা করার সুযোগ কম। ২০৩০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৫ বছরের সার্বিক উন্নয়নের চিন্তা করতে হবে এসডিজিকে ঘিরেই।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য গতকাল বুধবার প্রথম আলোর কার্যালয়ে এসব কথা বলেছেন। প্রথম আলোর সংবাদকর্মীদের সঙ্গে এসডিজির ওপর আলোচনায় অতিথি ছিলেন তিনি। দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) থেকে এসডিজিতে রূপান্তরের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, এমডিজিতে কিছু সূচকের উন্নতির কথা বলা হয়েছিল। মূল দর্শনটি ছিল মানবসম্পদের উন্নয়ন। অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের চিন্তাটা ছিল না এখানে। এমডিজির পথ ধরেই এসেছে এসডিজি। এমডিজির যত দোষই থাকুক না কেন, নিঃসন্দেহে এর সাফল্য পাওয়া গিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ২০১০ সাল থেকেই বলা হচ্ছিল যে এমডিজির তো উত্তরসূরি থাকা দরকার। সেই উত্তরসূরিই হচ্ছে এসডিজি। চেয়েছিলাম 'এমডিজি প্লাস' বলে কিছু হোক। শেষ পর্যন্ত এসডিজি হল এবং ভালই হল। অবশ্য এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্যও খুঁজে পান দেবপ্রিয়। তিনি বলেন, এমডিজি বাস্তবায়নে সরকারের দায়িত্বই ছিল প্রধান। কিন্তু, এসডিজি সরকার একা করতে পারবে না। এর জন্য বেসরকারি খাতকেও যুক্ত রাখতে হবে।

দেবপ্রিয় বলেন, এসডিজিতে বলা হচ্ছে, শুধু নিজ দেশের উন্নয়ন করলেই হবে না; এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের আয়-বৈষম্যের যে ফারাক রয়েছে, সেটিও কমিয়ে আনতে হবে। চোখের সামনে এখন যে এসডিজি আছে, তা বাংলাদেশের মত দেশের জন্য বড় এক সুযোগ। তিনি মনে করেন, একটি মানবিক জীবন গড়ে তোলার জন্য সুযোগটি কাজে লাগানো দরকার। শুধু সুযোগ নয়, বৈশ্বিক ও দেশীয় – দুই দিক থেকেই এসডিজি নতুন একটি হাতিয়ার। এই হাতিয়ার নিয়েই এখন যুদ্ধ শুরু করতে হবে।

টাকা কোথা থেকে আসবে, সেই চিন্তা থেকেই বেসরকারি খাতের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি এসেছে বলে জানান ড. দেবপ্রিয়। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, "সবাই বুঝে গিয়েছে যে ধনী দেশগুলো বর্তমানে দরিদ্র ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে যে সাহায্য করে, আগামী দিনে তার পরিমাণ খুব একটি বাড়বে না।"

সন্ত্রাস দূর, মানব পাচার রোধ ও নারী-শিশুর প্রতি অত্যাচার বন্ধ, আইনের শাসন কায়েম, পাচার বা চুরি হওয়া সম্পদ উদ্ধার এবং দুর্নীতি কমানো – এই পাঁচটি হল এসডিজির লক্ষ্য। আর অভীষ্ট হচ্ছে ১৬টি। অভীষ্টের মধ্যে স্বাস্থ্যকর, সমৃদ্ধ, সবুজ পৃথিবীময়, অংশীদারিমূলক, ন্যায়বিচারভিত্তিক ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন – ছয়টি হচ্ছে মূল। এর বাইরেও লক্ষ্য আছে ১৭টি।

দেবপ্রিয় বলেন, ন্যায়বিচার না থাকলে উন্নয়ন গ্রহণযোগ্য নয়। আবার ন্যায়বিচার পেলেই হবে না, মানুষকে মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার সুযোগও দিতে হবে। এসডিজিতে গুরুত্বের সঙ্গে এই বিষয়টি আনা হয়েছে, যা এমডিজিতে ছিল না।

আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতার মধ্যে ফারাক কমাতে না পারলে এসডিজি শুধু নামেই থাকবে উল্লেখ করে এসডিজি বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জগুলোও তুলে ধরেন সিপিডির এই বিশেষ ফেলো। দেবপ্রিয়র মতে, এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে অর্থায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা যাবে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি, টাকা পাচার বন্ধ করা, বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এবং পাইপলাইনে থাকা বিদেশি সহায়তা ব্যবহার করতে পারার মাধ্যমে।

এমডিজির ৭০-৮০ শতাংশ অর্থায়ন সমস্যা নিজেদের উৎস থেকেই মেটানো হয়েছে বলে তথ্য দেন বিশিষ্ট এই অর্থনীতিবিদ। তিনি বলেন, এমডিজির একটি বিষয় নিয়ে কেউই কথা বলছেন না। গণমাধ্যমে কোন প্রতিবেদনও হয়নি। সেটি হচ্ছে, মোট

ভূমির কত অংশ বনভূমি থাকতে হবে এ বিষয়ে এমডিজিতে যে লক্ষ্য ছিল, তা থেকে বাংলাদেশ পিছিয়েছে।

এসডিজির ব্যাপক সম্ভাবনা ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেও এর একটি জায়গা নিয়ে হতাশ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। এর লক্ষ্য অর্জনে কোন দেশ কতটুকু এগোল, সে বিষয়ে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা নেই, সময়সীমাও নেই। দেবপ্রিয় বলেন, প্রথমে বলা হয়েছিল যে, চার বছর পর পর সবাই প্রতিবেদন জমা দেবে। পরে '৪' সংখ্যাটি তুলে দেওয়া হয়েছে। এভাবে অনেক কিছুই শিথিল করা হয়েছে।

প্রথম আলো
১২ নভেম্বর ২০১৫

অধ্যায় ৬

নারী অধিকার

নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

ফাহমিদা খাতুন

নিজেকে যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য, নিজের স্বপ্নকে ছোঁয়ার জন্য অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া জরুরি। আমরা নারীর সমতার কথা বলি, অধিকারের কথা বলি, সামনে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলি, এ সবকিছুর মূলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অনেক বড় ভূমিকা পালন করে। গত দুই দশক ধরে নারীর জীবনযাত্রার মান এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিমালার প্রভাব ক্রমান্বয়ে বেশি করে অনুভূত হচ্ছে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিমালা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নারীর মধ্যকার জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বা কমাতে এবং আয়, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যকার ফারাক বৃদ্ধিতে বা সংকোচনে সহায়তা করে। তাই সামষ্টিক অর্থনীতির নীতিমালায় জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন থাকলে তা নীতিমালায় সমতা এবং দক্ষতা বাড়াতে সহায়তা করে; ফলে একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়নের পথ প্রশস্ত হয়।

নারীর প্রতি বৈষম্যের আর একটি কারণ নিহিত রয়েছে খোদ অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলোর মধ্যে। প্রচলিত অর্থনৈতিক হিসাব-নিকাশের মধ্যে, নারীর কাজকে অর্থপূর্ণ ও উৎপাদনশীল ধরা হয়নি। অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলোতে নারীর অ-আর্থিক কাজগুলোকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাইরে ধরা হয়। গতানুগতিক নয়া-ক্ল্যাসিকাল ব্যাষ্টিক অর্থনীতির তত্ত্ব অনুযায়ী একজন ব্যক্তি যদি এমন কোন পণ্য বা সেবা উৎপাদন বা ভোগের সঙ্গে জড়িত থাকে যার বিনিময়মূল্য আছে অর্থাৎ বাজারে যা অর্থের বিনিময়ে কেনাবেচা করা যাবে শুধু সেসব পণ্যই হিসাবের মধ্যে থাকবে। নারী এবং পুরুষের কর্ম পরিধির ভিন্নতার কারণে অর্থনীতিতে নারীর ভূমিকা ভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়। মূলত পুরুষের

প্রধান ভূমিকা হচ্ছে পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণের জন্য ঘরের বাইরে কাজ করা। আর এই কাজের বিনিময়ে সে অর্থ উপার্জন করে। অন্যদিকে, বেশিরভাগ নারী ঘরের কাজকর্ম করে থাকে যার কোন আর্থিক বিনিময় মূল্য নেই। পুরুষ বাজারে যা উৎপাদন করছে, কিনছে বা ভোগ করছে তা হয়ে যাচ্ছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড; আর নারী ঘরে পরিবারের জন্য যে পণ্য বা সেবা উৎপাদন করছে এবং ভোগ করছে তা হচ্ছে অ-অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। এই ধরনের অর্থনৈতিক তত্ত্ব নারী-পুরুষের অর্থনৈতিক বৈষম্যের অন্যতম কারণ। এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই একটি দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন বা জিডিপি হিসাব করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই তত্ত্ব খণ্ডিত এবং ভ্রান্ত। এ কারণেই জিডিপিতে নারীর অবদান খুব কম দেখানো হয়।

বর্তমানে, আমাদের দেশে যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া চলছে তাতে নারীরা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। প্রথমত, বিদ্যমান অর্থনীতি নারীর জন্য কাজের এবং আয়ের পর্যাপ্ত সুযোগ করে দিতে পারে না। তবে সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়াটাই যথেষ্ট নয়। সুযোগ কোন কাজেই লাগবে না যদি না তার ব্যবহার করা যায়। তাই দ্বিতীয় প্রয়োজনটি হল সক্ষমতার, যেটির অভাব রয়েছে নারীর। অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন এই দু'টি বিষয়কে তার "কমোডিটিজ অ্যান্ড কেপেবিলিটিজ" প্রবন্ধে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তার মতে, কাউকে কোন পণ্য দিলেই তার জীবনযাত্রার মান বদলে যায় না। বদলানোটা নির্ভর করে ওই পণ্যটির ব্যবহার করার সক্ষমতা ওই ব্যক্তির রয়েছে কি না তার ওপর। আমাদের সমাজে যে সুযোগগুলো অর্থনীতিতে রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করার জন্য নারীর উপায় বা ক্ষমতা থাকে না। যেমন – শিক্ষা ও দক্ষতার অভাবে নারীরা অনেক কাজ করতে পারে না। কিংবা শুধু স্বল্প আয়ের এবং নিচু পর্যায়ের কাজগুলোতে অংশ নিতে পারে। আর এ কারণেই দেখা দেয় আয় বৈষম্য।

অর্থনীতিবিদ এবং সমাজ বিজ্ঞানীরা, যেমন জন স্টুয়ার্ট মিল, অ্যাডাম স্মিথ এবং কার্ল মার্কস যুক্তি দিয়েছিলেন মানুষের সহজাত ক্ষমতা নয়, বরং শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যায়। সমাজের আয় বৈষম্য শিক্ষার অভাবেই হয়। তাই গ্যারি বেকার, থিওডোর শুলজ এবং অ্যাডাম স্মিথের মত অর্থনীতিবিদরা তাদের বিখ্যাত 'মানব মূলধন' তত্ত্বের মাধ্যমে মানব মূলধনের ওপর বিনিয়োগ করতে বলেছেন। মানব মূলধনের আরেকটি অংশ হচ্ছে স্বাস্থ্য, সেখানেও নারীরা পিছিয়ে রয়েছে। তবে শুধু শিক্ষা ও স্বাস্থ্য থাকলেই সমাজে নারীর অবস্থান পাল্টে যাবে তা নয়। সম্পদের মালিকানা কার হাতে রয়েছে তার মাধ্যমেই নির্ধারিত হয় ক্ষমতার ভারসাম্য। কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডরিক এঙ্গেলস নারীর অধস্তন অবস্থানকে সম্পদের মালিকানার প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের মতে, অর্থনৈতিক অবস্থানই সমাজে ক্ষমতার

ভারসাম্য নির্ধারণ করে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণের ফলেই সমাজে এবং পরিবারে নারীর অবস্থান পরিবর্তিত হয়েছে। আর তাই বর্তমানে এই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে যেসব নারী নিজেরা সাফল্য অর্জন করছে, অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করছে তারাও মুক্তি পাচ্ছে না পুরুষতন্ত্রের অন্যায় থেকে। সাংস্কৃতিক মুক্তি না হলে এখানে কোন পরিবর্তন হবে না।

নারীর প্রতি বৈষম্য হ্রাসের প্রাথমিক ধাপ হচ্ছে তার উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ। নারী বাজেট হচ্ছে বাজেটের জেন্ডারভিত্তিক মূল্যায়ন, বাজেটের সকল পর্যায়ে জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্ভুক্তি এবং রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের পুনর্বিন্যাসে জেন্ডার সমতা রক্ষা করা। জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটের অর্থ এই নয় যে, নারীর জন্য আলাদাভাবে বাজেট তৈরি করতে হবে। বরং বিদ্যমান জাতীয় বাজেটে জেন্ডার সমতা রক্ষার জন্য নীতিমালা ও বরাদ্দ করাই হচ্ছে জেন্ডার বাজেটিং এর উদ্দেশ্য। এ ক্ষেত্রে, সরকারি অর্থায়নের লক্ষ্য হওয়া উচিত খানা বা পরিবার নয় বরং নারী এবং পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদার ভিত্তিতেই রাজস্ব আহরণ এবং সরকারি ব্যয় নির্ধারণ করতে হবে। কেননা একই পরিবারের মধ্যেও সদস্য ভেদে দারিদ্র্যের মাত্রা ভিন্ন হয়। দেখা যায়, নারী সদস্যটিই উচ্ছিষ্ট খাদ্য গ্রহণ করে অপুষ্টিতে ভুগছে কিংবা স্কুলে যাওয়ার সুযোগ না পেয়ে আয় করতে পারছে না।

আমরা দেখছি যে, শিক্ষা ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নারীরা উল্লেখযোগ্য হারে অগ্রগতি লাভ করেনি। উচ্চতর শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থীর হার প্রাথমিক পর্যায়ের চেয়ে অনেক কম। নারী শিক্ষার্থীর পেছনে একটি পরিবার ব্যয় করে পুরুষ শিক্ষার্থীর চেয়ে কম। শিক্ষার এই হারের মধ্য দিয়ে, ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে, প্রাথমিক পর্যায়ে নারী কতটা পিছিয়ে আছে আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি। বাংলাদেশে নারীর শিক্ষার শুরুটাই হয়েছে কিছুটা দেরি করে। সেই সময়টুকু আমাদের পুষিয়ে নিতে হবে। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অগ্রগতি হবে নারীর। একজন নারী অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে আত্মবিশ্বাসী হবেন। দৃঢ়চিত্তে নিজের কাজ করবেন। নারী নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তুলবেন। এবং নিজেকে যোগ্যতর করে তোলার সেই সিঁড়ির ধাপে ধাপে রাষ্ট্রের ইতিবাচক পদক্ষেপগুলো থাকতে হবে।

সমকাল
৮ মার্চ ২০১৭

কর্মজীবী নারীদের নিজেদের ওপর আস্থা বাড়াতে হবে

ফাহমিদা খাতুন

বাবা-মা চাইতেন, মেয়ে ডাক্তার হবে। অতএব পড়াশোনা চলল সেই ধাঁচে। উচ্চ মাধ্যমিকের পর মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা হল, সুযোগও মিলে গেল। তবে ঘটনা ভিন্ন। মেয়েটি চিকিৎসাশাস্ত্র বাদ দিয়ে টুপ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে গেল অর্থনীতি পড়তে। তাঁর ইচ্ছা বড় হয়ে শিক্ষক হওয়ার। ছোটবেলা থেকে সে স্বপ্নটা বুনেছে।

এই মেয়ে আজকের ফাহমিদা খাতুন। তবে তিনি শিক্ষক নন, হয়েছেন গবেষক। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে (বিআইডিএস) ১৯৮৯ সালে নিজের গবেষণা ক্যারিয়ার শুরু করেন। ১৪ বছর ধরে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগে (সিপিডি) গবেষক হিসেবে কাজ করছেন। গত ১ মার্চ সিপিডির নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি। সামষ্টিক অর্থনীতি, বিভিন্ন খাতের গতিপ্রকৃতি, আর্থিক নীতি, মূল্যস্ফীতিসহ দেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে গবেষণা করে প্রতিষ্ঠানটি।

বাবার চাকরির সুবাদে ছোটবেলা থেকেই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বড় হয়েছেন ফাহমিদা খাতুন। এখানেই অর্থনীতিতে অনার্স-মাস্টার্স করেন। বিআইডিএস-এ কাজ করার সময় উচ্চশিক্ষার জন্য ছুটি নিয়ে ১৯৯১ সালে যুক্তরাজ্যে পাড়ি দেন। ইউনির্ভাসিটি কলেজ লন্ডনে মাস্টার্স ও পিএইচডি করেন। ১৯৯৬ সালে দেশে ফিরে আগের প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। পরে আবার ছুটি নিয়ে ইউএনডিপি ও ইউএসএআইডিতে কিছুদিন কাজ করেন। তবে ঘুরেফিরে তিনি পাকাপাকিভাবে গবেষণাতেই ফিরে আসেন।

অল্প কথায় কিন্তু ফাহমিদা খাতুনের কর্মজীবনের সবটা বলা হল না। ২০১৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থ ইনস্টিটিউটে পোস্ট-ডক্টরাল গবেষণা করেন তিনি। সেখানে অর্থনীতিবিদ ও জাতিসংঘের নীতি-পরামর্শক অধ্যাপক জেফ্রি স্যাক্সের সঙ্গে টেকসই উন্নয়ন ও আইসিটি নিয়ে কাজ করেন। তিনি রাষ্ট্রমালিকানাধীন জনতা ব্যাংক ও এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক ছিলেন। তিনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সেবা খাতবিষয়ক উপদেষ্টা কমিটি, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের পরিবেশবান্ধব পণ্য চিহ্নিতকরণ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কমিটি ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের বৈদেশিক সাহায্যের কার্যকারিতা বিষয়ক জাতীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। সরকারের প্রতিনিধিদলের হয়ে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন সভায় যোগ দিয়েছেন তিনি।

আচ্ছা, ফাহমিদা খাতুন, শিক্ষক না হয়ে গবেষক হওয়ার গল্পটা কী? শুনুন তাঁর মুখেই, "পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি কাজ করে। শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার ক্ষেত্রেও সেটি হয়। সে জন্য প্রথম হওয়ার পরও আমাকে নেওয়া হয়নি। একপর্যায়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। তখন অর্থনীতিবিদ আখলাকুর রহমানের পরামর্শে গবেষণায় চলে আসি।"

আগ্রহ হারানোর বিষয়টি আরেকবার প্রকটভাবে এসেছিল ফাহমিদা খাতুনের জীবনে। সন্তান জন্মের পর। বললেন, "বাচ্চা হওয়ার পর কিছুটা পিছুটান তৈরি হয়। তখন দুই বছর কোনরকমে চাকরি করেছি। বারবার মনে হত, চাকরি-টাকরি বৃথা। মূল হচ্ছে সন্তান। বাচ্চাকে ছেড়ে কাজ করতে আসাটা কষ্টকর।"

নিজের সঙ্গে একটি লম্বা সময় বোঝাপড়া করে আবার চাকরিতে মনোযোগী হন ফাহমিদা খাতুন। এই জায়গায় তিনি মনে করেন, সন্তানকে দিনের পুরোটা সময় দিলেই সব হয়ে যাবে তা নয়; বরং তাকে গুণগত সময় দেওয়ার বিষয়টিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া সন্তানের মধ্যে কী মূল্যবোধ দিচ্ছেন কিংবা জীবনের কী লক্ষ্য ঠিক করে দিচ্ছেন, সেটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবারের সহযোগিতা গবেষক ফাহমিদার কর্মজীবনের কঠিন পথকে সহজ করে দিয়েছে। তিনি বলেন, "বাবা-মা আমাকে সময় কাটানোর জন্য পড়াশোনা করাননি। আমার ভাইয়েরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে পড়াশোনা করেছে, আমিও সেটি করেছি। বিয়ের পরপরই আমি বিদেশে পিএইচডি করতে চলে যাই। তখনো আন্তরিক সহায়তা পেয়েছি।"

দেশের অর্থনীতির অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণার পাশাপাশি নারীদের নিয়ে কাজ করেছেন গবেষক ফাহমিদা। নারীর প্রতি সহিংসতার অর্থনৈতিক মূল্য এবং অর্থনীতিতে

নারীর অবদান শীর্ষক দু'টি গবেষণার কাজ করেছেন তিনি। তাঁর পর্যবেক্ষণ, গত ১০ বছরে কর্মক্ষেত্রে অসংখ্য নারী আসছেন। আগে শুধু শিক্ষকতা ও চিকিৎসার মত পেশায় এলেও এখন নারীরা কর্পোরেট ও ব্যক্তি খাত এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। মেয়েরা ঘর সামলে বাইরে কাজ করতে আসছেন। তাই বলা যায়, তাঁদের দক্ষতা বেড়েছে।

অবশ্য এখনকার কর্মজীবী নারীদের চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি বলে মনে করেন এই গবেষক। কারণ হিসেবে তিনি বললেন, আগে যৌথ পরিবার ছিল। আর বর্তমানে অধিকাংশই একক পরিবার। সে জন্য নারীদের বাড়তি চ্যালেঞ্জ যোগ হয়েছে। সংসার দেখভাল ও সন্তান লালন-পালন করে চাকরি করা বেশ কষ্টের। সে জন্য একটি পর্যায়ের পর নারীরা কর্মক্ষেত্র থেকে ঝরে পড়ছেন। বিশেষ করে, যখন নারীরা সন্তান জন্ম দেন। এ ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। তাহলে কর্মজীবী নারীদের উপকার হয়।

অন্য অনেক পেশায় নারীরা গেলেও গবেষণায় কম আসছেন। তবে অন্যান্য পেশার চেয়ে গবেষণাকর্মটি আলোকিত। জ্ঞানচর্চার জায়গা। আর জ্ঞান তো ভালর জন্যই। এমন মন্তব্য করে ফাহমিদা খাতুন বলেন, গবেষণা পেশায় যাঁরা আছেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি বেশ উদার। নয়টা-পাঁচটা দায়িত্ব পালন করতে হয় না, কিছুটা নমনীয়তা আছে। এ জন্য কাজ করতে গিয়ে পরিবার কিংবা প্রতিষ্ঠানে কোন সমস্যায় পড়তে হয়নি।

নারীদের প্রতি ফাহমিদার পরামর্শ, কাজকে ভালবাসতে হবে। তবেই পেশাগত উৎকর্ষ অর্জন করা যাবে। তা ছাড়া, কর্মজীবী নারীদের নিজেদের ওপর আস্থা (কনফিডেন্স) বাড়াতে হবে। যোগ্যতা সত্ত্বেও কেবল নিজের ওপর আস্থার অভাবে অনেক নারীই কর্মক্ষেত্রে সুদৃঢ় অবস্থান তৈরি করতে পারেন না।

মোহাম্মদপুরে সিপিডির কার্যালয়ে ১ মার্চ প্রথম আলোর সঙ্গে ঘণ্টাখানেক কথা বলেন ফাহমিদা খাতুন। সদা হাস্যোজ্জ্বল এই গবেষক মানুষটিকে যখন প্রশ্ন করলাম, এতটা পথ পাড়ি দেওয়ার পর জীবনের অতৃপ্তি কী? একটু সময় নিয়ে বললেন, "যা পেয়েছি, ভাল পেয়েছি। তবে অনেক সময় মনে হয়, কোন বিষয়ে গবেষণার পর যেটি বলছি, সেটি যদি মাঠে গিয়ে বাস্তবায়ন করতে পারতাম, তাহলে আত্মতৃপ্তি পেতাম।"

প্রথম আলো
৮ মার্চ ২০১৬

অন্যান্য

তারুণ্য বদলে দিচ্ছে দেশ

রেহমান সোবহান

কেমন বাংলাদেশ চেয়েছিলাম – এ প্রশ্ন অনেকেই করেন। এক কথায় এর উত্তরে বলা যায় – ১৯৭১ সালে আমাদের দেশের প্রায় সব মানুষ এমন একটি দেশ চেয়েছিল, যা হবে পাকিস্তানের বিপরীত। তাদের বিশ্বাস ছিল, নতুন দেশে বৈষম্য কম হবে। শুধু দুই অঞ্চলের বৈষম্য নয়; পাকিস্তানে ক্ষমতা জনগণের হাতে ছিল না। মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সীমিত ছিল। এ ইতিহাস আমরা পেছনে ফেলে এসেছি। তবুও আজকে আমরা দেখছি, বাংলাদেশের ভেতরে বৈষম্য বেড়েছে। মুষ্টিমেয় লোকের একটি এলিট গোষ্ঠীর জীবনযাপন ঠিক উন্নত দেশের ধনবানদের মত বিলাসী। বিপুল সাধারণ জনগোষ্ঠী রয়েছে তার বিপরীতে।

তবে এ সময়েও কিন্তু দেশের উন্নতি ঘটেছে। অর্থনীতির ভিত দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আমাদের প্রায় চার কোটি ছাত্র-ছাত্রী এখন স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীতে পড়াশোনা করছে। এ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্র ও ছাত্রীর অনুপাত প্রায় সমান। মাধ্যমিক শ্রেণীগুলোতে ছাত্রীর সংখ্যাই কিছুটা বেশি। স্কুলের সব ছাত্র-ছাত্রী বিনামূল্যে পাঠ্যবই পেয়েছে। দেশে স্বাস্থ্য সুবিধা বেড়েছে। অনেক মানুষ গ্রামে থেকেই সরকারি স্বাস্থ্যসেবা লাভ করছে। সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের সময়ে আমরা যে অবস্থায় ছিলাম, এখন সেখানে নেই। অর্থনীতি, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতেও অনেক উন্নতি ঘটেছে।

শিল্পের মধ্যে তৈরি পোশাকশিল্প যথেষ্ট এগিয়েছে। রফতানি আয়ে এ খাত বিপুল অবদান রাখছে। ৩৫ থেকে ৪০ লাখ শ্রমিক এ শিল্পে কাজ করছে এবং তাদের বেশিরভাগ নারী। বর্তমানে, এ খাত থেকে ২৫ বিলিয়ন ডলারের মত রফতানি আয় হচ্ছে এবং ২০২১

সালে এ আয় ৩৫-৪০ বিলিয়ন ডলার হতে পারে। কেউ কেউ মনে করছেন, আয় ৫০ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত অর্জন করা সম্ভব।

কেবল তৈরি পোশাক নয়, আরও কয়েক ধরনের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের বিকাশ ঘটছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে শিল্প স্থাপিত হচ্ছে এবং এর অনেকটিই ভাল চলছে। বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি শ্রমিক মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজ করছে। আমরা এখন বলতে পারি, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র বাঙালির উপস্থিতি রয়েছে এবং তারা দেশের সুনাম বাড়াতে সহায়তা করছে। সবচেয়ে বড় উন্নতি করছেন, আমাদের মাঠের কৃষক ও ক্ষেতমজুররা। স্বাধীনতার পর তারা কৃষি খাতে উৎপাদন প্রায় চার গুণ বাড়াতে পেরেছেন। ক্ষুদ্রঋণে বিপ্লব ঘটেছে। অন্তত ৩০ লাখ পরিবার এ ঋণ নিয়েছেন। নারীরাই এ ধরনের ঋণের বেশিরভাগ পেয়েছেন। ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে এসব পরিবারের সব সমস্যার সমাধান হয়ত করা যায়নি, তবে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নতি যে ঘটেছে – তা নিয়ে দ্বিমত করা চলে না। এ প্রক্রিয়ায় অনেক নারীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস চলে এসেছে। কেবল ঘরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকা নয়, তারা বাইরের কাজও করতে পারেন এবং তাতে সাফল্যও মেলে। এর সঙ্গে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ করা প্রায় ৪০ লাখ মেয়ের বিষয়টি যুক্ত করে দেখুন – প্রায় বিপ্লব ঘটে গিয়েছে আমাদের চোখের সামনে। যে সমাজে নারী ছিলেন গ্রামের ঘরে বন্দি, তারা এখন শহরে এসেছেন।

প্রকৃতই, আমাদের উন্নতি ঘটেছে। আমাদের সামনে নতুন সুযোগ এসেছে। আরও উন্নতির পক্ষে চলতে একটি পর্যায়ে আমরা উপস্থিত হয়েছি। আমাদের সম্ভাবনা অনেক। কৃষক একটু সাহায্য পেলে কত কিছুই না করতে পারেন। আমরা এখন খাদ্যশস্য রফতানির কথা ভাবতে পারছি। আমাদের নারীসমাজ দেশকে এগিয়ে নিতে অনেক কাজ করছে। আমাদের যেসব নাগরিক বিভিন্ন দেশে কাজ করছেন, তাদের প্রশংসা শুনছি। যেখানেই সুযোগ মিলছে, দেশের মানুষ সেটি কাজে লাগাচ্ছেন। আমাদের ইতিহাসে এন্টারপ্রাইজ, অ্যাডভেঞ্চার ছিল না। নোয়াখালী ও সিলেটের কিছু লোক দেশের বাইরে যেতেন ভাগ্যানুসন্ধানে। অন্যরা গ্রামের গণ্ডিতে থাকতেন। কিন্তু এখন নতুন উদ্যোক্তা সমাজ উঠে আসছে। নতুন পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছেন তারা। গ্লোবাল কানেকটিভিটিতে তারা যুক্ত হচ্ছেন। এর সুফল পাচ্ছে দেশ।

তবে ফের বৈষম্য প্রসঙ্গে বলছি। আমাদের স্বাধীনতার একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল ন্যায়বিচারের সমাজ কায়েম করা। এটি করার জন্য উদ্যোক্তা দরকার, বিনিয়োগ দরকার। দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ প্রমাণ করেছেন যে, সুযোগ পেলে তারা সেটি কাজে লাগান এবং আয় বাড়াতে পারেন। সাধারণ মানুষের এ ক্ষমতা পূর্ণ মাত্রায়

কাজে লাগাতে চাই প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা তৈরি করা। এটি করা গেলে আমাদের সামনে অসম্ভব সম্ভাবনা তৈরি হবে। এভাবে সমাজে বিদ্যমান বৈষম্যও কমানো যাবে। আমাদের দেশে রাজনীতির সঙ্গে যুক্তদের অনেকে ক্ষমতাকে তাদের সম্পদ বাড়ানোর জন্য কাজে লাগান। ধনীরা রাজনৈতিক সুবিধা কাজে লাগিয়ে আরও ধনী হতে চান। ব্যবসায়ীরা রাজনীতিতে আসছেন। বিভিন্ন শীর্ষ ও গুরুত্বপূর্ণ পদে রাজনীতিকরা নিয়োগ পাচ্ছেন। এভাবে অনেকে ধনসম্পদ বাড়িয়ে নিচ্ছেন।

কিন্তু আমাদের ইতিহাস তো এটি বলে না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" আমরা পাঠ করেছি। এ থেকে আমরা জানি যে, একটি সাধারণ পরিবার থেকে তিনি রাজনীতিতে এসেছেন। নিজে কষ্ট করেছেন। স্ত্রী কষ্ট করেছেন। তিনি স্বামীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য সামান্য সঞ্চয় তুলে দিয়েছেন। বাবার কাছ থেকে টাকা পেতে কতভাবে বোঝাতে হয়েছে। তিন বেলা খাবার টাকা সব সময় থাকত না। গাড়ি ছিল না। রিকশা, বাস, লঞ্চ বা নৌকায় পুরো দেশ চষে বেড়িয়েছেন। ১৯৭০ সালে সংসদে নির্বাচিতদের বেশির ভাগের গাড়ি ছিল না। শীর্ষ নেতা এবং দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের জীবনযাপনে তেমন পার্থক্য ছিল না। বঙ্গবন্ধুর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল। আশা-প্রত্যাশা ছিল। ভাবনায় ছিল দেশ ও জনগণ। এখনকার রাজনীতি সমাজ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আমরা যদি বৈষম্য কমাতে পারি, রাজনীতিতে তার প্রভাব পড়বে। যারা মেহনত করেন, তারা অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখছেন। তাদের কারণে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ভাল থাকছে। কিন্তু তাদের দৈনন্দিন জীবনে এর প্রতিফলন তেমন নেই। রাজনীতিতে এবং জাতীয় সংসদে তাদের উপস্থিতিও নেই। দেশের মূল সমস্যা এখানে।

অনেক সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। অনেক নতুন ব্যবসায়ীকে আমরা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত দেখছি। তাদের অভিনন্দন। ব্যবসায়ের ট্র্যাডিশন ছিল না। এখন কতজনে কত কিছু করছেন, দেশের উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু একই সঙ্গে লক্ষ্য করি, জনগণের বড় অংশ যথাযথ সুযোগ পাচ্ছেন না। তারা কাজের উপযুক্ত স্বীকৃতি পাবেন না কেন? আমরা অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে চাই। এটি এখন পর্যন্ত পরিসংখ্যানের বিষয় হয়ে রয়েছে। এ লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে যারা এ ক্ষেত্রে অবদান রাখছেন, দেশের উন্নতি ও প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখছেন – তাদের কাছে তার যা পাওয়া উচিত সেটি পৌঁছে দিতে হবে। আমরা স্বাধীনতার ৫০তম বার্ষিকীতে পৌঁছাব ৭ বছরে। তখন সবাই যেন বোঝেন যে, তারা কাজের স্বীকৃতি পাচ্ছেন। অবদানের সঙ্গে সুবিধাভোগে যে পার্থক্য, সেটি অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। আমাদের দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা রয়েছে। জনগণের বড় অংশের প্রত্যাশা অপূর্ণ থাকলে এর অবসান ঘটানো যাবে না।

স্বাধীনতার ঊষালগ্নে পশ্চিমা বিশ্বের কেউ কেউ বলেছিলেন, বাংলাদেশ টিকে থাকতে পারবে না। তবে এটি কেবল যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের নিরাপত্তা উপদেষ্টা (পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী) হেনরি কিসিঞ্জারই জোর দিয়ে বলেছেন। তিনি বাংলাদেশকে নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করেছেন। এর কারণ ছিল, তৎকালীন পাকিস্তানকে সামনে রেখে রিচার্ড নিক্সন এবং হেনরি কিসিঞ্জার তাদের ভূমণ্ডলীয় কৌশল বাস্তবায়ন করতে চেয়েছেন। কিন্তু বিশ্ব কেবল তাদের কথায় চলে না। বাংলাদেশকে বাস্কেট কেস বলা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের তরুণ প্রজন্ম দেখিয়ে দিয়েছে — এ বক্তব্য ঠিক ছিল না। অর্থনীতিতে দেশ এগিয়ে চলেছে। আমরা শিক্ষায় এগিয়ে গিয়েছি। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে। এখন দু'টি বাস্তব সমস্যা দেখতে পাচ্ছি। দেশের ভেতরে শহর ও গ্রামের সর্বত্র, ছাত্র-ছাত্রী স্কুল-কলেজ বেড়েছে, তবে মান দুর্বল। তরুণ-তরুণীদের মানসম্পন্ন শিক্ষা দিতে হবে। তাদের উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতে পারলে কোরিয়া, চীনের পথে এগিয়ে যেতে সমস্যা হবে না। আমাদের সমাজে এখন উদ্যোক্তা প্রচুর। তাদের সামনে অনেক সম্ভাবনা। এটি কাজে লাগাতে পারলে তারা আকাশে উড়তে পারবে।

দ্বিতীয় সমস্যা, আমি দেখি, উদ্যোক্তাদের ভেতরেই। উদ্যোক্তারা উদ্যমী। কিন্তু কাজ করছেন মূলত নিজের জন্য, পরিবারের জন্য। আত্মকেন্দ্রিকতা কাজ করছে তাদের মধ্যে। সমাজ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন থাকছেন। আরেক দল নিজের স্বার্থে ব্যবহার করছে রাজনীতিকে। নিজে আরও ভাল থাকা, আরও উন্নতি করাই যেন লক্ষ্য। ক্ষমতাকে তারা ব্যবহার করে ব্যক্তিগত লাভের জন্য। দুঃখজনকভাবে, তরুণ সমাজের অনেকের মধ্যেও এ প্রবণতা দেখি। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন দেশ ও সমাজের জন্য সেরা মেধা, প্রতিভা ও উদ্যম কাজে লাগানো। অনেক অনেক নারী-পুরুষ নিজ নিজ স্থানে থেকে কাজ করছেন। এনজিওগুলোর বিপুল সংখ্যক কর্মী সক্রিয় রয়েছেন। সবার জন্য কাজ করা — এটিই এখন মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতেও এটি নিয়ে আসা চাই — আমি কেবল নিজের জন্য নই, সমাজের সবার জন্য। সবাইকে নিয়ে চলতে হবে। একদিনে সবকিছু আমরা পাব না। কিন্তু সুযোগ পেলে দেশের চেহারা আমাদের তরুণ প্রজন্ম বদলে দিতে পারবেই।

সমকাল
১ জানুয়ারি ২০১৫

উন্নতি সত্ত্বেও আমাদের সমাজ অসম

রেহমান সোবহান

অধ্যাপক রেহমান সোবহান (জন্ম ১২ মার্চ ১৯৩৫) বাংলাদেশের অন্যতম খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য, সাউথ এশিয়া সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজের নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা, গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) এর প্রতিষ্ঠাতা, বিআইডিএসের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে সিপিডির সভাপতি। ৪২টি মনোগ্রাফসহ বিভিন্ন জার্নালে দুই শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ২০০৮ সালে পেয়েছেন স্বাধীনতা পদক। গুণী এই অর্থনীতিবিদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন শেখ মেহেদী হাসান।

আপনার জন্ম কলকাতায়। আপনার শৈশব সম্পর্কে কিছু বলুন।

কলকাতায় শৈশব ছিল আনন্দময়। তবে ৭ থেকে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত বছরের নয় মাস কাটিয়েছি দার্জিলিংয়ে বোর্ডিং স্কুল সেন্ট পল'স-এ। আমি পড়তে, ছায়াছবি দেখতে, আর খেলাধুলায় অংশ নিতে খুব পছন্দ করতাম। সেন্ট পল'স-এ আমি দূরপাল্লার দৌড়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। ফুটবল, হকি ও মুষ্টিযুদ্ধেও নাম করেছি।

ক্যামব্রিজে পড়ালেখার সময় আপনার দিনগুলো কীভাবে কেটেছে। সেখানে তো আজকের স্বনামখ্যাতদের অনেকের সঙ্গেই আপনার বন্ধুত্ব হয়েছিল যেমন অমর্ত্য সেন, মনমোহন সিং ...

আমার পরিচিতি গড়ে তোলা, পেশাজীবন বেছে নেওয়া আর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণের ক্ষেত্রে ক্যামব্রিজের দিনগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। এ বিষয়ে আমার

স্মৃতিচারণামূলক বই "আনট্র্যাঙ্কুইল রিকালেকশন্স: দ্য ইয়ার্স অব ফুলফিলমেন্ট"-এ বিশদ লিখেছি। আমার সমসাময়িকদের মধ্যে ছিলেন অমর্ত্য সেন, মনমোহন সিং, জগদীশ ভগবতী ও মাহবুবুল হক। পরবর্তীকালে তারা সুখ্যাত হয়েছেন। অমর্ত্য সেন নোবেল পুরস্কার জয় করেছেন। ১০ বছর ধরে ভারতের প্রধানমন্ত্রিত্ব করেছেন মনমোহন সিং। ক্যামব্রিজে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল অমর্ত্য সেনের সঙ্গে। সেখানে ক্যামব্রিজ মজলিসে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলাম। ওই মজলিসের সভাপতি ছিলাম আমি, কোষাধ্যক্ষ অমর্ত্য সেন। ওই দিনগুলো থেকেই অমর্ত্য তার চমৎকার গুণাবলির পরিচয় দিচ্ছিল; অর্থনীতিবিদ হিসেবেই শুধু নয়, উদার ও অগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যতিক্রমী বুদ্ধিজীবী হিসেবেও।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি যোগ দেন ১৯৫৭ সালে। আপনার শিক্ষকতা জীবনের স্মরণীয় ঘটনাবলির কিছু যদি বলেন...

আমার জীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা তাৎপর্যময়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের বেলায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য যে বেড়েই চলছিল তা ১৯৬০-এর দশকে বাঙালিদের গণতন্ত্রের সংগ্রামের অন্যতম ইস্যু হয়েছিল। এসব বিষয় গভীরভাবে বুঝে যথাযথ উপলব্ধির পূর্ণতা অর্জনে সহায়ক হয়েছিল এ বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক ছিলাম আমি। বাঙালিদের বঞ্চনাকে কেন্দ্র করে ১৯৬০-এর দশকে উদ্ভূত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিতর্ক প্রভাবিতকরণে এ বিভাগ ভূমিকা রাখে এবং মোনায়েম খানের সরকারের রোষানলে পড়ে।

আপনি একসময় পাকিস্তান অবজারভার, ঢাকা টাইমস, ইত্যাদি পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন।

প্রধানত, আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্য সম্পর্কিত বিষয়ের ওপর আমি পাকিস্তান অবজারভার ও ঢাকা টাইমসে নিয়মিত লিখেছি। সামাজিক ও রাজনৈতিক অনাচারের ওপরও লিখেছি। জনপ্রিয় গণমাধ্যমগুলোয় লিখতাম বলেই আমার মতামত ব্যাপক জনগোষ্ঠীর নজর কেড়েছিল। একান্তভাবে পেশাদার পত্রপত্রিকায় লিখলে অমনটি হত না।

১৯৬০ সালে রাওয়ালপিন্ডিতে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার ওপর এক সেমিনারে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদদের যে প্যানেল অংশ নেয় তাতে অধ্যাপক নূরুল ইসলাম আর আপনিও ছিলেন। কেমন অভিজ্ঞতা হয়েছিল?

পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশন ১৯৬১ সালের গোড়ার দিকে অন্য অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে নূরুল ইসলাম ও আমাকে প্রকাশিত দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার ওপর আলোচনার জন্য রাওয়ালপিন্ডিতে আমন্ত্রণ জানায়। আমাদের তখন একেবারে তরুণ বয়স। তবু অর্থমন্ত্রী, সরকারের সিনিয়র সচিব, পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ও পদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিতর্ক করার সুযোগ আমাদের দেওয়া হয়েছিল। পরিকল্পনার সমালোচনা আর পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অন্যায় আচরণের বিষয়গুলো আমরা তুলে ধরেছিলাম। আমাদের যুক্তিতর্কের কারণে কিছু যে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল তা কিন্তু নয়। তবে পাকিস্তানের ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনার সময় আমাদের অসন্তুষ্টিগুলো প্রকাশ করার সুযোগ আমাদের দেওয়া হয়েছিল।

আওয়ামী লীগের ৬ দফা আন্দোলন এবং এ আন্দোলনের সঙ্গে জনসম্পৃক্ততা/ জনসমর্থনকে অনুপ্রাণিত করেছে আপনার লেখা –

অর্থনৈতিক বৈষম্য আর এর প্রতিকার নির্ধারণের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে ড. এ সাদেক, ড. হাবিবুর রহমান, নূরুল ইসলাম, আখলাকুর রহমান, মোশাররফ হোসেন ও আনিসুর রহমানের মত বেশ কয়েকজন অর্থনীতিবিদ লেখালেখি করেছেন। তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমাদের ধারণাগুলো বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা কর্মসূচি প্রণয়নে সহায়ক হয়েছিল। আমাদের কেউই অবশ্য ওই কর্মসূচির খসড়া প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত ছিলাম না।

উইকলি ফোরাম পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন আপনি ১৯৬৯-৭০ সাল পর্যন্ত। এতে বাংলাদেশের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ তুলে ধরে লেখা আপনার নিবন্ধগুলো পড়ে ইয়াহিয়া খানসহ পাকিস্তানি শাসকরা রুষ্ট হয়েছিলেন।

‘ফোরাম’ পত্রিকা ১৯৬৯ সালে চালু করি আমি, কামাল ও হামিদা হোসেন। সামরিক আইনের শাসনের সময় এ পত্রিকায় আমার লেখাগুলোয় দৃঢ়তাপূর্ণ বক্তব্য থাকত। সামরিক সরকার এটি ভালভাবে নেয়নি। আরও সাবধানে লেখার জন্য বেশ কয়েকবার আমাকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। ওসবকে খুব একটি পাত্তা দিইনি। যা যা প্রয়োজন সবই লিখেছি ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ পত্রিকাটির শেষ সংখ্যা অবধি। জেনারেল টিক্কা খানের নির্দেশে ২৫ মার্চ গণহত্যার পর তার হুকুমেই ‘ফোরাম’ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ছিলেন আপনি। সেদিক থেকে নবজাত দেশের আর্থ-সামাজিক বিকাশ পরিকল্পনার রূপরেখা নির্মাণের পথিকৃৎদের অন্যতম আপনি। গত চার দশকে ওই পরিকল্পনার কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে?

বাংলাদেশের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার বেশ কিছু বাস্তবায়ন করা যায়নি। এ পরিকল্পনা প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসে। ওই একই সময়ে জ্বালানি তেলের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে বিশ্বজুড়ে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। এর ফলে আওয়ামী লীগ সরকার অর্থনৈতিক নীতিমালার পরিবর্তন আনতে বাধ্য হয়। পরিকল্পনা কমিশনের তিন সদস্য আনিসুর রহমান, মোশাররফ হোসেন ও আমি ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরে কমিশন ছেড়ে দিয়ে আবার শিক্ষকতা জীবনে ফিরে গেলাম। ’৭৫ সালের গোড়ার দিকে নূরুল ইসলাম চলে যান অক্সফোর্ডে।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজটি সব সময়ই প্রধানমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের হাতেই থাকে। বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করার জন্য আমরা কমিশনে রইলাম না। ’৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা এবং নভেম্বরে তার ঘনিষ্ঠ চার সহচরকে জেলখানায় হত্যার পর নতুন সরকার কর্তৃক প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা কার্যত পরিত্যক্ত হয়। প্রথম পরিকল্পনায় অধিকতর সমতাভিত্তিক সমাজ গড়বার কৌশল অবলম্বনের প্রস্তাব ছিল। পরবর্তী চার দশকে উন্নয়নের আন্তর্জাতিক অংশীদারদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ায় অর্থনৈতিক লক্ষ্যাবলি বাজার-চালিত নীতি এজেন্ডা বাস্তবায়নমুখী হয়ে গিয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল বৈষম্যমুক্ত ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠন। ওই স্বপ্নের সঙ্গে আপনিও নানাভাবে জড়িত...

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল এগালিটেরিয়ান (সব মানুষের সমান অধিকার ও সমান সুযোগ নিশ্চিত) সমাজ গড়া। বর্তমান দুনিয়ায় আধিপত্য করছে বিকাশমুখী সমাজ নির্মাণের দর্শন। এ দর্শনে প্রধানত বাজার অর্থনীতির দ্বারা চালিত বেসরকারি খাত জোরদার করাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এটি তো বঙ্গবন্ধুর দর্শনের পরিপন্থী। স্বীকার্য যে, বাংলাদেশের অর্থনীতি বিকশিত হয়েছে, দারিদ্র্য কমেছে। কিন্তু আমাদের সমাজ আরও অসম হয়েছে এবং অংশীদারিত্বও কমেছে। এখানে সুবিধাভোগী শাসক এলিটদের অভ্যুদয় ঘটেছে। এ অবস্থাটা বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলাদেশের দর্শনের উল্টো।

আমরা দেখছি, রাজনীতিতে ব্যবসায়ী লোকদের আগমন ও উপস্থিতি বেড়েই চলেছে।

এখন আমাদের সংসদে এবং আমাদের স্থানীয় প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোয় ব্যবসায়ীদের যে আধিপত্য তাতে এলিটপন্থি সমাজের রাজনৈতিক পরিণতিই মূর্ত হয়ে ওঠে।

আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলন যথেষ্ট বলে মনে করেন?

বুদ্ধিবৃত্তিক ধারণার গুরুত্ব থাকবেই। তবে সেই ধারণাগুলো এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন বলিষ্ঠ রাজনৈতিক পদক্ষেপ আর ফলপ্রদ শাসনব্যবস্থা।

বাংলাদেশকে নিয়ে আমাদের যে আশা-আকাঙ্ক্ষা তার কতটুকু বাস্তব রূপ নিয়েছে?

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ইতিবাচক অনেক কিছু অর্জিত হয়েছে। অনেকে আমাদের উন্নতি যতটুকু হবে অনুমান করেছিল, আমরা তার চেয়ে অনেক ভাল করেছি। অর্থনীতি আরও বহুমুখী হয়েছে। মানব উন্নয়ন সূচকে আমরা যথেষ্ট এগিয়েছি। আয়-দীনতাও কমেছে। তবে আমরা হয়ে গিয়েছি আরও অসম ও কম ন্যায়ভিত্তিক সমাজ, যেখানে জোরদার হওয়ার চেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে আমাদের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। উন্নয়ন সাফল্যগুলো থেকে পূর্ণ কল্যাণ আহরণ করতে হলে এ অবস্থা পাল্টে ফেলা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
১২ মার্চ ২০১৬

কাজে না লাগলে জ্ঞান কি ভেজে খাব?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

শরণার্থী হয়েছেন জীবনে দু'বার। রাজনীতি করবেন বলে নটর ডেমে ভর্তি না হয়ে ঢাকা কলেজে পড়েছেন। বাম চিন্তা থেকে রাশিয়ায় পড়তে গিয়েছেন। দেশে ফিরে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হয়েছেন। অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের মুখোমুখি হয়েছেন ওমর শাহেদ।

আপনার জন্ম? আদি নিবাস?

১৯৫৬ সালের ২৯ এপ্রিল কলকাতায় জন্ম। আদি নিবাস টাঙ্গাইলের এলেঙ্গায়। মামা বাড়ি নেত্রকোনার পূর্বধলা। মা-বাবা দুই পরিবারেরই জমিদারি ছিল। বাবা [বিচারপতি দেবেশ ভট্টাচার্য] খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে আইনে এলএলবি। তিনটি পরীক্ষার সবগুলোতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছেন। প্রেসিডেন্সিতে জ্যোতি বসু ও তিনি একই ব্যাচে পড়েছেন।

আর মা?

বাবা ওকালতি পাস করে ময়মনসিংহ এসে পেশা জীবন শুরু করেন, মা তখন আনন্দমোহন কলেজে বিএ পড়েন। মায়ের ভাইয়েরা সবাই বামপন্থী রাজনীতি করতেন, সেভাবেই তাঁদের পরিচয়। ১৯৪৭ সালে মা-বাবার বিয়ে হয়। বিয়ের কয়েক মাস পরই তো পাকিস্তান হল। তখন দেখা গেল, বাবার ডাবল দোষ – দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তানে তিনি একদিকে হিন্দু, অন্যদিকে কমিউনিস্ট। ফলে বিয়ের পরপরই

তাঁকে জেলে নিয়ে গেল। বাবার জেলজীবন খুব ঘটনাবহুল। জেলে তাঁরা রাজবন্দির অধিকারের জন্য সে সময়ের সবচেয়ে দীর্ঘ ৬৭ দিনের অনশনটি করেছেন। অনশনের সময় জোর করে খাওয়াতে গিয়ে একজন মারা যান।

মা তখন কী করলেন?

পড়াশোনা স্থগিত রেখে ময়মনসিংহের রাধা সুন্দরী স্কুলে শিক্ষিকা হলেন। জমিদারের সন্তান কমিউনিস্ট হলে বাবা খুব খুশি হন না। ফলে বাবার জেলখরচ এবং নিজের ভরণপোষণ চালাতে মা চাকরি নিলেন। অনেকেই আমার বাবার কথা জানেন, কিন্তু মায়ের ব্যক্তিত্ব ও ভূমিকাটিও আমার পরিষ্কার করে বলা উচিত। এই মা আমার ষাটের দশকের শেষে আবার পড়ালেখা শুরু করলেন। তখন দিদি [দেবলীনা ভট্টাচার্য] বড় হয়েছে, আমিও স্কুল শেষ করব, ছোট ভাই দীপেন [ভট্টাচার্য] সেভেন-এইটে পড়ে। বড় ধরনের ব্রেক অব স্টাডি থাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ড. এ কে নাজমুল করিমের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে ২০-২২ বছর পর মা বিএ পরীক্ষা দিলেন। ১৯৬৯ সালে মাস্টার্সে ভর্তি হলেন। স্বাধীনতার আগে এমএ ফার্স্ট পার্ট পরীক্ষা দিয়ে সেকেন্ড ক্লাস সেকেন্ড হয়েছেন। স্বাধীনতার পর সেকেন্ড পার্ট দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্রছাত্রীর কাছে তিনি সর্বজনীন বৌদি। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও প্রকাশক মফিদুল [হক] ভাইও ছিলেন। মা তাঁদের চেয়ে নিদেনপক্ষে ১৫-২০ বছরের বড়। তাঁরা সমানে বৌদি, বৌদি বলে তাঁর কাছ থেকে চায়নিজ খেতেন। তাঁকে আবার পড়ালেখায় নিয়ে আসা, পরীক্ষার অনুমতি নেওয়া – সব কিছুর পেছনে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদিকা ড. মালেকা বেগমের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি। মালেকা পিসি তাঁর নারী আন্দোলনের পবিত্র ব্রত হিসেবে মাকে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করেন। পরে মালেকা পিসির উৎসাহে মা নারী আন্দোলনে যোগ দেন, সুফিয়া কামালের নেতৃত্বাধীন মহিলা পরিষদের সহসভানেত্রী ছিলেন দীর্ঘ সময়। পরবর্তী সময়ে তিনি ১৯৯৬-২০০১ সালের সংসদে টাঙ্গাইলের নারী আসন থেকে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ছিলেন।

আপনার লেখাপড়ার শুরু?

১৯৬০ সালে লক্ষ্মীবাজারে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স স্কুলে। স্কুলটি মেয়েদের। তবে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ছেলেরাও পড়ত। ১৯৬৪ সালে দাঙ্গার সময় আমাদের পরিবার বাধ্য হয়ে সাময়িকভাবে দেশ ছাড়ে।

তখন থাকতেন?

ওয়ারীর র‍্যাংকিন স্ট্রিটে। তিন ভাইবোনই স্কুলে পড়ি। গুজবে আদমজীর শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গা শুরু হল। পরে তাঁতিবাজার, শাঁখারীবাজার, নারায়ণগঞ্জে ছড়িয়ে গেল। মনে আছে, সেদিন ছিল পৌষসংক্রান্তি। মায়ের তৈরি পিঠা খেতে আশপাশের প্রতিবেশী ও বন্ধুরা বাড়িতে এসেছেন। পরের দিন সারা রাত আমরা প্রতিবেশীর দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছি। দেখছি, পুরান ঢাকায় বাড়িগুলোতে আগুন জ্বলছে। আমাদের বাড়ির সামনে যে মুচিটি বসত, কেউ ছুরি দিয়ে তার পেটে আঘাত করেছে। ড্রেনে পড়ে সে সারা রাত কাতরাচ্ছে। ওর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে প্রশ্ন এল – রবি দাস তো নিম্ন বর্ণের হিন্দু। সাম্প্রদায়িকতা তো উঁচু-নিচুর ভেদ করে না। আমরা উভয়েই তো সমান আক্রান্ত, আতঙ্কগ্রস্ত। পরে সকালে কেউ তাঁকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। দেশে ফিরে দেখি, রাস্তার মোড়ে বসে সে আবার সেলাই করছে, পেটে তার সেলাইয়ের বিরাট দাগ।

’৬৪ দাঙ্গার সময় কি ড. রাজীর বাড়িতে ছিলেন?

১৯৫২ সালে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বাবা ঢাকা এসে ওকালতি শুরু করেছিলেন। তাঁর এক মক্কেল ছিলেন পাবনার বেলকুচির মুসলিম লীগ নেতা আবদুল মতিন [তৎকালীন এমএনএ], ‘মতিন কাকু’। দাঙ্গা শুরু হলে তিনি আমাদের বের করে তাঁর গোপীবাগের বাসায় নিয়ে গেলেন। তিন-চার দিন থাকলাম। সেখানেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ায় বাবার আরেক বন্ধু বিশিষ্ট আইনজীবী ড. আলীম আল-রাজী এসে নিয়ে গেলেন তাঁর আজিমপুরের বাসায়। আসলে ১৯৬৪ ও ১৯৭১ – দু’বারই আমাদের বাঁচাতে আলীম কাকুর ভূমিকা অনন্য। আমাদের টাঙ্গাইলের এই মানুষটি মাদ্রাসা থেকে পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে বিলেতে পড়েছেন। ইতিহাস ও আইনে ডাবল পিএইচডি, পিনস্ট্রাইপ স্যুট পরতেন। বাবাকে ডাকতেন ‘গুরু’। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষের মানুষ ছিলেন অসাম্প্রদায়িক, আধুনিক এই আলীম কাকু।

কীভাবে দেশ ছাড়লেন?

কাকিমা [ড. মালেকা আল-রাজী] তখন ইডেন কলেজের শিক্ষক। আজিমপুর কলোনিতে তাঁদের তিন রুমের সরকারি কোয়ার্টারে আমরা আরেকটি ফ্যামিলি উদ্বাস্তু হয়ে উঠলাম। তাঁরা তিনজন, আমরা পাঁচজন। ২১ দিন ছিলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত না কলকাতার সঙ্গে ঢাকার প্লেন চালু হল। মা ও তিন ভাইবোন কলকাতা গেলাম। সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র

পাকিস্তানে তো কোন হিন্দু পরিবার নিজেদের নিরাপদ মনে করত না। বোন মাসির কাছে থেকে গেল, আমি পিসির বাসায়। কলকাতার সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুলে থ্রি থেকে ফাইভ পর্যন্ত পড়েছি। সেই জীবনও এক অর্থে শরণার্থীর জীবন। আত্মীয় হলেও অন্যের বাসায় কয় দিনই বা থাকা যায়? ১৯৬৫ সালের পাক-ভারতের যুদ্ধের পর মা-বাবা আমাকে দেশে ফিরিয়ে আনলেন। ১৯৬৬ সালে সেন্ট গ্রেগরিজ হাই স্কুলে সিক্সে ভর্তি হলাম। এ স্কুল থেকেই ১৯৭২ সালে ম্যাট্রিক পাস করেছি।

মাঝে তো ১৯৭১ এল?

১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনের সময় মা-বাবা আমাদের দুই ভাইকে দেশের বাড়ি এলেঙ্গায় রেখে এলেন। ১৮ মার্চ তাঁরা আবার ঢাকা চলে এলেন। সেদিন জয়দেবপুরে অস্ত্র কারখানায় বিদ্রোহ হয়। বাবা ভেবেছিলেন, বঙ্গবন্ধু-ইয়াহিয়া খানের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে হয়ত কোর্ট খুলবে। তবে তারপর থেকে আগস্টের শেষ পর্যন্ত তাঁরা বেঁচে আছেন, না মারা গিয়েছেন – জানতেও পারিনি। তবে বাবার এক জুনিয়র আইনজীবী আবদুর রউফের [সাবেক নির্বাচন কমিশনার] শ্বশুরবাড়ি, আলীম কাকুর বাসায় তাঁরা আত্মগোপন করেছিলেন। পরে আলীম কাকুর জুনিয়র, ব্যারিস্টার ইউসুফ নিজ গাড়িতে মা-বাবাকে ১৯৭১ সালের আগস্টের শেষ দিকে টাঙ্গাইলে নিয়ে এলেন। আমরা নৌকা করে তাঁদের নিয়ে এলাম। আমরা তখন এলেঙ্গার বাড়ি ছেড়ে অন্য গ্রামে – মুক্তাঞ্চলে।

টাঙ্গাইলে কীভাবে ছিলেন?

যুদ্ধের কিছুদিনের মধ্যে আমাদের গ্রামের বাড়িতে শান্তি কমিটি অফিস করল, বাড়ির কিছু অংশ আগুনে পুড়িয়ে দিল। আমি, ছোট ভাই, কাকা-কাকিমা, গ্রামের মানুষ যমুনার চরে পালিয়ে গেলাম। দিনে কারো আশ্রয়ে থাকি, সারা রাত নদীর ধারে জেগে বসে থাকি – মিলিটারি বা ডাকাতরা যদি নদীর ধার দিয়ে আসে। মিলিটারি সকালে আসে বলে দুপুরের পর ঘুমাই। সন্ধ্যায় গোল হয়ে বসে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনি। এর মধ্যে অবশ্য একবার ডাকাতরা আমার বুকে বসে গলায় তলোয়ার ধরেছিল।

মা-বাবা আসার পরে?

আমরা আগেই ভারতে যাওয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম। আমরা চলে যাব শুনে এলাকার হিন্দু-মুসলমান সবাই অসহায়বোধ করতে লাগলেন। বললেন, তাঁরাও যাবেন।

৬ সেপ্টেম্বর দুইশ আড়াইশ মানুষ, বিরাট লম্বা তিন গয়নার নৌকায় যাত্রা করলাম। একসময় আসামের মানকেরচরে পৌঁছালাম। সেপ্টেম্বর থেকে পাঁচ মাস আবার আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে থাকতে হল। ১৯৭২ সালের ১৩ বা ১৪ জানুয়ারি ড. কামাল হোসেনের ফোন পেয়ে ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্লেনে বাবা ঢাকা এসে বঙ্গভবনে শপথ নিলেন। ফেব্রুয়ারিতে আমরা ফিরে এলাম। তখন র‍্যাংকিন স্ট্রিটের বাসায় একটি খাট-চেয়ারও নেই। সব লুট হয়ে গিয়েছে।

ছাত্র হিসেবে কেমন ছিলেন?

[হাসি] শরণার্থী থেকে দেশে ফিরে ১৯৭২ সালে তিনটি লেটার নিয়ে সায়েন্স থেকে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছি। মেরিট লিস্টে প্রথম ২০ জনের মধ্যে ছিলাম। আমার স্কুলের সবাই তো নটর ডেমে ভর্তি হত। তবে আমি রাজনীতি করব বলে ঢাকা কলেজে ভর্তি হলাম।

রাজনীতির ঝোঁক কেন হল?

শুরুটি পরিবারের পরিবেশ থেকে। বাবা খুবই আশাবাদী, ইতিবাচক, সামনের দিকে তাকানো মানুষ ছিলেন। এমন সময় বড় হয়েছি, সেই ষাটের দশক; এখনো বলি, এটিই ছিল আর্থ-সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বর্ণযুগ। সৌভাগ্য যে বাড়িতে অজিত গুহ [শহীদ], সত্যেন সেন, রণেশ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক সাইদুর রহমানের মত মানুষরা আসতেন। বাবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন। তখন তো স্কুলে পড়ি, বসে বসে তাঁদের কথা শুনতাম। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা থাকার জায়গা পেতেন না, আমাদের বাসায় থাকতেন। পার্টির অনেক কাজও বাসায় হয়েছে। মণি সিংহ ১৯৬৯ সালে রাজশাহী জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গোপনে আমাদের বাসায় আসতেন। খোকাদা [খোকা রায়], অনিল মুখার্জি আত্মগোপনে ছিলেন। তাঁরাও আসতেন। তখন স্টেডিয়ামে প্রথমবারের মত গোর্কির "মা" মঞ্চস্থ হবে। পুরো নাটকের মহড়া আমাদের বাসায় হয়েছে। সৈয়দ হাসান ইমাম পরিচালনা করেছেন। রওশন জামিল ছিলেন 'মা'।

ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়ে কি রাজনীতি শুরু করে দিলেন?

গিয়ে শুরু করিনি, রাজনীতি নিয়েই ঢুকলাম। রাজনীতি শুরু করেছি ১৯৬৯ সালে। পাকিস্তান সরকার অখণ্ডতা বোঝানোর জন্য একটি নতুন বই বাধ্যতামূলক করেছিল — "পাকিস্তান: দেশ ও কৃষ্টি"। কিন্তু আমরা কিছুতেই তা মেনে নিতে রাজি হইনি। রাজনীতি থেকে অনেক দূরের, সফল-উচ্চবিত্তদের ছেলেদের স্কুল সেন্ট গ্রেগরিজ থেকে

১৯৬৯ সালে প্রথম মিছিল নিয়ে শহীদ মিনারে গিয়েছি। দেশ তখন ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে।

ঢাকা কলেজের জীবন?

স্বাধীনতা-উত্তর খুবই অস্থির সময়ে ঢাকা কলেজে পড়েছি। একদিকে ছাত্রলীগ, অন্যদিকে ছাত্র ইউনিয়ন। জাসদের উদ্ভব হচ্ছে, সর্বহারাও আছে। কলেজে সব কিছুরই প্রতিফলন ছিল। মিটিং-মিছিল থেকে সম্মেলন করা – একদিকে সবই ছিল সহজ, অন্যদিকে কঠিন। বিশেষত, বামপন্থী ছোট দলের সমস্যা বেশি ছিল। একদিন মিছিল নিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ একজন জড়িয়ে ধরল, 'কেমন আছেন? মিছিল করছেন?' তারপর বুকে জড়িয়ে ধরল। বুঝলাম, অস্ত্র আছে, সাবধান করল। ক্যান্টিনে কর্মিসভা করছি, কেউ এসে ফ্যানে গ্লাস ছুড়ল, কাচ ভেঙে চারপাশে ছড়াল, আমাদের দিকে চেয়ার ছুড়ে মারল। সারা দেশ থেকে মেধাবীরা এখানে আসত, মফস্বল থেকে আসা ছেলেরা এমন পরিস্থিতিতে খুব অসহায় বোধ করত। তাদের তো অত সামাজিক শক্তি নেই। ফলে তাদের ছোটানো খুব সহজ ছিল। দেখা গেল, সন্ধ্যায় হোস্টেলে কর্মীসভা করব, অন্যরা এসে দরজায় লাথি মারছে, ঘাড় ধরে রুম থেকে বের করে দিল। তখন খুব যে বিরোধীদলীয় রাজনীতি করছি, তা নয়। তখন তো বাম আওয়ামী লীগের ঐক্যের রাজনীতি চলেছে।

রাজনীতির পাশাপাশি আর কিছু করতেন?

স্বাধীনতার পরের সময়টি ছিল এক অনির্বচনীয় উদ্ভাসিত সময়। ১৯৭২-৭৫ সালে একদিকে বামপন্থী রাজনীতি করছি, অন্যদিকে সংস্কারবাদী পদক্ষেপের অংশ হিসেবে মগবাজার মোড়ে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের অফিসে, এখনো সেটি আছে, রিকশাওয়ালাদের সাক্ষরজ্ঞান দিতে নাইট স্কুল চালাচ্ছি। স্কুলে পড়াত এ রকম অনেককে চিনবেন – সহপাঠী আনু মুহাম্মদ, মণি সিংহের ছেলে ডা. দিবালোক সিংহ, মুক্তিযোদ্ধা শাজাহান মৃধা বেণু। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময় বাড়ি বাড়ি ঘুরে রুটি সংগ্রহ করে কমলাপুর রেলস্টেশনে বিলি করেছি।

পরীক্ষার রেজাল্ট?

এ নিয়ে বড় টেনশন ছিল। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ আমার প্রত্যক্ষ শিক্ষক, আরও অনেক ভাল শিক্ষক ছিলেন। তাঁরা বকাবকি করতেন। চক-ডাস্টার-হাজিরা খাতা নিয়ে তাঁরা ক্লাসে যাচ্ছেন, তাঁদের সামনে দিয়ে স্লোগান দিতে দিতে আমি করিডর পেরোচ্ছি।

আরও চ্যালেঞ্জ ছিল – প্র্যাকটিক্যালের নম্বর পাব কীভাবে? ক্লাস তো বেশি করিনি। তবে খুব কৃতজ্ঞ – স্পেশাল প্র্যাকটিক্যাল করিয়ে শিক্ষকরা সাহায্য করেছেন। সেবার প্রায় দেড় লাখ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছি। সেবারই প্রথম নকল বন্ধ করতে রক্ষীবাহিনী নামানো হয়েছিল। ঢাকা বিভাগে সেবার ১১১ জন ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিল, এর মধ্যে ৫২ কি ৫৩ জন ছিল ঢাকা কলেজের, আমিও তাদের একজন। মুখ রক্ষা হয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নে পড়তে যাওয়ার সিদ্ধান্ত কীভাবে হল?

তখন প্রায় সার্বক্ষণিক ছাত্র-রাজনীতি করি। মা ভাবলেন, আমার পড়ালেখা আর হবে না। একদিন ডেকে বললেন, "তোর সব বন্ধুরা চলে যাচ্ছে, তুইও বিদেশে যা।" আমাদের স্কুলের ব্রাদারদের সার্টিফিকেটে অনেক সহপাঠীই তখন যুক্তরাষ্ট্র যাচ্ছে। ফলে বিদেশে ভর্তি হওয়া কোন সমস্যা নয়, অর্থও সমস্যা নয়। বললাম, যাব কিন্তু আমেরিকা নয়, রাশিয়া যাব। নতুন সমাজ গড়ার জন্য, নতুন মানুষ কীভাবে বানানো যায় তা শিখব। দেশ গড়ার কারিগর হব। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু মারা গেলেন। ফলে ভিন্ন ধরনের পরিস্থিতিতে দেশ ছাড়ার তাগাদা বোধ করলাম। যাই হোক, ১৯৭৫ সালের আগস্টের শেষে মস্কো গেলাম।

রাশিয়া গিয়ে?

রুশ ভাষা শিখতে এক বছর ইউক্রেনের দানিয়াস্ক শহরে থেকেছি। সে শহরের কথা এখনো মনে আছে। ফলে যুদ্ধ আক্রান্ত দানিয়াস্কের বর্তমান পরিস্থিতি দেখে কষ্ট হয়। পরে মস্কো এসে প্লেখানভ ইনস্টিটিউটে [প্লেখানভ রাশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব ইকোনমিকস] অর্থনীতিতে ফার্স্ট ক্লাস নিয়ে অনার্স, মাস্টার্স করেছি। ১৯৯২-৯৩ সালে অক্সফোর্ডে প্রযুক্তিগত সক্ষমতা গড়ে তোলার ওপর 'বাংলাদেশের পরিকল্পনার তুলনামূলক বিচার' বিষয়ে পিএইচডি ও উত্তর-পিইচডি করেছি। স্ত্রী [ইরিনা] একই ইনস্টিটিউটে পড়ত। ভাল ছাত্রী বলে বৃত্তি নিয়ে ভ্লাদিভোস্টক থেকে মস্কোতে পড়তে এসেছিল। সেও অর্থনীতিতে পিএইচডি করেছে। ১৯৮০ সালে আমাদের পরিচয়, দুজনেই তখন পিএইচডি করছি। পিএইচডি শেষে ১৯৮৪ সালে বিয়ে করলাম।

দেশে ফিরে?

বিআইডিএসে [বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ] অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর সঙ্গে পরিচয় ছিল না কিন্তু তিনি মা-বাবাকে

জানতেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কী শিখে এসেছ?' ভাবলাম, অপ্রচলিত কিছু শিখেছি বললে তো চাকরি দেবে না। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে যেসব বিষয় পড়ানো হয় তাই বললাম। তিনি বললেন, 'তাহলে তোমার বিশেষত্ব কী? ভিন্ন কিছু তো শিখে আসনি। প্রচলিত অর্থনীতিই শিখে এলে, তোমাকে দিয়ে আমার উপকার কী? এ যোগ্যতা তো অন্যদেরও আছে।' তখন আস্তে আস্তে বলা শুরু করলাম, স্যার অপ্রচলিত বিষয়ও কিছু কিছু পড়েছি। তিনি উৎসাহিত হলেন, 'বলো, বলো।' বললাম। জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইংরেজিতে কেমন?' বললাম, 'আমি কোন অসুবিধা দেখি না।' তখন বললেন, 'সামনের সোমবার থেকে কাজে এসো।' ১৯৮৪ সালের অক্টোবরে বিআইডিএস পরিচালনাধীন তাঁর একটি প্রকল্পে চাকরি শুরু করলাম।

কী কাজ করতেন?

তখন তো দেশ চরমভাবে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। সেই প্রকল্পে 'বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতার সংকট' নিয়ে কাজ করেছি। একসময় বিআইডিএসে নিয়মিত চাকরি হল। সেই থেকে ৩০ বছর তাঁর সঙ্গেই আছি। তিনি আমার পেশাজীবনের গুরুদেব। একসময় তিনি অবসর নিলেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হলেন। সিপিডি [সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ] প্রতিষ্ঠা করলেন। আমিও এই প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যুক্ত হলাম।

তারপরের গবেষণা?

পরের সব কাজই শিল্প অর্থনীতি নিয়ে। রেশম-মসলিন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, বস্ত্রখাত এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-কারখানার সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে কাজ করেছি। আমরা শিল্পায়নের চেষ্টা করি। কিন্তু কৃষিনির্ভরতা থেকে শিল্প বিকাশে যেতে হলে তো রফতানি বাড়াতে হবে। রফতানি করতে হলে ব্যক্তি খাতে শিল্প-কারখানা গড়ে উঠতে হবে, উৎপাদন বাড়াতে হবে – এসব নীতিনির্ধারণী ক্ষেত্রে কাজ করেছি। ১৯৯৬ সালে বর্তমান সরকারের আগের আমলের শিল্পনীতিটি আমার হাতে তৈরি। ২০০০ সালের পরে আমাদের গ্যাস খাত নিয়ে যে প্রবল বিতর্ক হয়েছে, এমনকি ভারতে গ্যাস রফতানির কথা আলোচনা হয়েছে, তখনকার বিএনপি সরকার প্রকৃতপক্ষে দেশে কতটুকু গ্যাস আছে বা গ্যাস রফতানি করা ঠিক হবে কি না বুঝতে যে কমিটি করেছিল আমি তার সদস্য ছিলাম। গ্যাস রফতানি ঠেকিয়ে কীভাবে তা দেশের কাজে লাগানো যায়, কমিটিতে এই মতামত সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা রেখেছি। একইভাবে ১৯৯৬ সালের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরিতে

কাজ করেছি। যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, জাপান, নেদারল্যান্ডসের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানেও কাজ করার সুযোগ হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য কাজ?

সবচেয়ে বেশি কাজ করেছি ডাব্লিউটিওকেন্দ্রিক [বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা] বৈদেশিক বাণিজ্য খাতে। ১৯৯৬ সালে ডাব্লিউটিও গড়ে ওঠার পর থেকে সেখানে দেশের স্বার্থ কীভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব – সেই দরকষাকষিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছি। দুই দশক এ খাতে কাজের ধারাবাহিকতায় ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দোহা বাণিজ্য আলোচনাকে সম্পূর্ণ করার আকাঙ্ক্ষা থেকে ডাব্লিউটিওর সদর দপ্তর জেনেভায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছি। তবে ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে জাতীয় নির্বাচনের দু'দিন আগে নিজের বিবেচনাবোধ থেকে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছি। যদিও নতুন সরকার পাঁচ মাস পর সেটি গ্রহণ করেছে। এরপর সিপিডিতে ফিরে এলাম। এর আগে তো এখানে আট বছর নির্বাহী পরিচালক ছিলাম।

ছেলেমেয়ে?

আমাদের এক সন্তান। সে আইনজীবী। আলেকজান্দ্রা গ্রিন হেরাল্ড থেকে 'ও' লেভেল করে দুই বছর অক্সফোর্ডে 'এ' লেভেলে পড়েছে। লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস থেকে এলএলবি, ক্যালিফোর্নিয়া ইউনির্ভাসিটি থেকে এলএলএম করেছে। এখন জেনেভায় জাতিসংঘের এজেন্সি ডাব্লিউআইপিওতে [ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি অর্গানাইজেশন] মেধাস্বত্ব আইন নিয়ে কাজ করে।

দেশে ফিরে এসে তো রাজনীতি করেছেন?

১৯৮০-এর দ্বিতীয় ভাগে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন করেছি। 'ঢাকা ঘেরাও'-এ ছিলাম। কারফিউ ভেঙে মিছিল নিয়ে শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধে গিয়েছি। আধা-সরকারি চাকরি করি, রাজপথে মিছিল-সমাবেশও করি। ফেরার পাঁচ-ছয় বছর তো আন্দোলনেই কেটেছে।

রাজনীতি কেন ছাড়লেন?

[দীর্ঘশ্বাস] দলীয় রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছি; মূল্যবোধের রাজনীতি নয়। **১৯৯১** সাল পর্যন্ত সিপিবিতে কোন পদে ছিলাম না, সাধারণ কর্মী হয়েই খেটে খাওয়া মানুষের অধিকারের সংগ্রামে থেকেছি। সমাজ বদলের বিজ্ঞান আত্মস্থ করতে চেয়েছি, একটি সাম্যভিত্তিক সমাজ তৈরি করতে চেয়েছি। জানতে চেয়েছি, সমাজকে সাধারণ মানুষের সার্বিক বিকাশের পক্ষে কীভাবে দাঁড় করানো যায়। একসময় দেখলাম, যে সমাজব্যবস্থাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম, তা বাস্তবে টেকসই হল না। সে পরিপ্রেক্ষিতে মন ভাঙল, দলও ভাগ হয়ে গেল। নানা উপচিন্তা বেরোল। তখন থেকে দলীয় রাজনীতি ছেড়ে নতুন আত্মজিজ্ঞাসায় ব্যাপৃত হয়েছি।

আবার করবেন?

আমরা তো জ্ঞান চর্চার মানুষ। জ্ঞান যদি মানুষের কাজে না লাগে সে জ্ঞান দিয়ে কী করব? জ্ঞান কি ভেজে খাব? জ্ঞানকে প্রয়োগ করে পরিবর্তন আনতে চাই। এভাবেই তো জ্ঞানের সঠিকতা যাচাই হয়। দেখলাম, অধীত জ্ঞান সর্বদা সত্যতা যাচাইয়ে সফল হচ্ছে না। ফলে প্রয়োগ থেকে আবার জ্ঞান অনুশীলনে ফিরতে হল। পরিবর্তনের লক্ষ্যে নতুন প্রয়োজনে অবশ্যই নীতি বিশ্লেষণ থেকে নীতি প্রয়োগে আবার যুক্ত হব।

কালের কণ্ঠ
১০ জুন ২০১৬

সিপিডি তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই গণমাধ্যমের সাথে নিবিড় সম্পর্ক রক্ষা করে আসছে। নীতি গবেষণার ফলাফলকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের যে অগ্রণী ভূমিকা আছে তা স্বীকৃত সত্য। এ কারণে সিপিডি'র গবেষকরা গণমাধ্যমে সমকালীন বিভিন্ন বিষয়ে কলাম লিখেন, সাক্ষাৎকার প্রদান করেন ও মন্তব্য দিয়ে নীতি গবেষণার জটিল বিষয়গুলোকে সহজবোধ্যভাবে সাধারণ জনগণের কাছে উপস্থাপন করে থাকেন। বর্তমান গ্রন্থটি ২০১৫-১৭ সালে বিভিন্ন সময়ে পত্রিকায় প্রকাশিত মতামতের সম্মিলিত একটি সংকলন।

২০১৫ সালে জাতিসংঘে "টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০" গৃহীত হবার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি সিপিডি বিভিন্ন কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধাপের বিশ্লেষণ ও বাংলাদেশের অবস্থান এবং করণীয় নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা আছে এই গ্রন্থটিতে। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে প্রবেশ করেছে। ফলে ২০১৫-১৭ সাল সময়কালে এই দুই বিষয়ে গবেষণাভিত্তিক মতামত সিপিডি'র কাজের মূল অংশ জুড়ে বিদ্যমান ছিল।

এছাড়া বাংলাদেশের নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবার সুফল ও চ্যালেঞ্জ, বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় শিল্প যেমন তৈরি পোশাক ও চামড়া, বিনিয়োগ, আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক এবং নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এ বইটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

অর্থনৈতিক প্রবণতা ও বাজেট বিশ্লেষণ সিপিডি'র কাজের একটি ধারাবাহিক অংশ। বাজেট প্রণয়নের আগে ও পরে বাজেটের বিভিন্ন প্রস্তাব ও তার যথার্থতা নিয়ে সিপিডি'র গবেষকরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লিখেন। এই ধারাবাহিকতা এখনো চলছে।

আধুনিক বিশ্বে বৈদেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বহুমাত্রিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক, আঞ্চলিক দেশসমূহের সাথে সুসম্পর্ক, 'টিকফা' চুক্তিতে বাংলাদেশের লাভবান হবার সম্ভাবনাসহ বিভিন্ন ইস্যুতে প্রকাশিত লেখাসমূহ উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী ও সাধারণ পাঠকের কাছে আবেদন সৃষ্টি করবে।

গণতান্ত্রিক, সহনশীল, অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে সিপিডি'র গবেষকরা প্রতিনিয়তই কাজ করে যাচ্ছেন। তারই প্রতিফলন বইটির বিভিন্ন প্রবন্ধে। নানামুখী বিষয়ের অনন্য সম্মিলন উৎসুক পাঠকদের আগ্রহ পূরণে সহায়ক হবে বলে আশা করছি।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ি - ৬/২ (৭ ও ৮ তলা), ব্লক - এফ
কাজী নজরুল ইসলাম রোড, লালমাটিয়া হাউজিং এস্টেট
ঢাকা - ১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৮১৫২৭৭, ৯১৪১৭০৩, ৯১৪১৭৩৪, ৯১৪৩৩২৬, ৯১২৬৪০২
ফ্যাক্স: (+৮৮ ০২) ৪৮১১০৪১৪ ই-মেইল: info@cpd.org.bd
ওয়েবসাইট: www.cpd.org.bd

9 789843 438850